আল বালাগুল মুবীন

শাহ ওয়ালী উল্লাহ্









প্রকাশক ঃ
হাজী মামুন খান ইউসুফজী
শিরীন পাবলিকেশন্স
৪৪/৪৫, নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৮৩ বাংলা
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৮৬ বাংলা
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৪০৬ বাংলা

হাদিয়া ঃ ৮০.০০ টাকা মাত্র।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
শাপলা কম্পিউটার
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০

মুদ্রণে ঃ
এস, নাহার প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
১১/১২, নবরায় লেন (তাঁতী বাজার)
ঢাকা—১১০০

অনুবাদকের কথা

পবিত্র কালামে মজীদের প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে তাকালে পরিষ্কাররূপে দেখা যাবে যে, তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই মানব সমাজে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার বর্ণনায় ভরপুর। আর আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের পরিপন্থী কাজ যেমন কুফরী, শিরিকী ও নেফাকীর বিস্তারিত বর্ণনার মূল লক্ষ্য হলো নিরঙ্কুশ ও নির্ভেজালরূপে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করা। কেননা কুফরী ও শিরিকীর বিস্তারিত বর্ণনা ব্যতীরেকে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী পূর্ণাংগ হয় না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বিভিন্ন উদাহরণ উল্লেখ এবং বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনার মধ্যে কুফরী, শিরিকী ও নেফাকীর মূল কারণ এবং তার পার্থিব ও পারলৌকিক অভিশপ্ত পরিণতির কথাও উল্লেখ করে মানব সমাজকে সতর্ক করে দিয়ে তাঁর দায়িত্ব শেষ করেছেন। বস্তুতঃ কুফরী, শিরিকী ও নেফাকী যেমন মানুষের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে, তেমনি কর্মজীবনের মধ্যেও এর প্রতিফলন হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে উভয়দিকের এই অনিষ্টতা হতে দূরে থাকার জন্য সাবধান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের অবিশ্বাসের চরম পর্যায়ের রূপ হলো কুফরী বা নাস্তিকতা। আর আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি অবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ হলো শিরিকী। শিরিকী থেকেই জন্ম হয় নেফাকীর দূরারোগ্য রোগ। ইসলামের দৃষ্টিতে কঠোর ও মারাত্মকতম পাপ কাজ হচ্ছে এই তিনটি কাজ। আমাদের মুসলিম সমাজে প্রথমটির অস্তিত্ব না থাকলেও লক্ষ্যে অলক্ষ্যে দ্বিতীয়টি ও তৃতীয়টির অস্তিত্ব বিরাজমান পাওয়া যায় এবং পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। কারণ দ্বীনি এলমের অপ্রতুলতা ও স্বল্পতার কারণেই এ রোগ আমাদের সমাজের মধ্যে দেখা দিয়ে থাকে। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা শিরিকের ভিত্তিমূলের বর্ণনা দিয়ে এরশাদ করেছেন—

آلَا اِنَّ اللّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ ط اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ـ

অর্থাৎ, জেনে রেখো! আসমানের অধিবাসী ও ভূ-পৃষ্ঠের অধিবাসী সকল কিছুর সার্বভৌম মালিকানা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার। আর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যাদেরকে ডাকা হয়, তাদের যারা আনুগত্য করে, তারা নিছক ধারণা, গুমান ও অনুমানের আনুগত্য ছাড়া কিছুই করে না। তারা শুধু উল্টো বিপথেই দৌড়াচ্ছে। (সূরা ইউনুস— ৬৫)

এখানে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনি এলেমের অন্ধত্বতা ও ধারণা অনুমানকেই শিরিকের মূলকারণ ও ভিত্তি নিরূপণ করা হয়েছে। আর অন্য এক আয়াতে তিনি শিরিক যে অনুকরণের পরিণতি ফল তা ঘোষণা দিয়ে এরশাদ করেছেন—

فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ـ

'আপনি এ কারণে কখনোই সন্দেহ পোষণ করেন না যে এরা বাতিল ও মিথ্যা মা'বুদদের পূজা অর্চনা করে যাচ্ছে। এরা তাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণে তাদের পূজা পার্বণ করতেছে।' (সূরা হুদ–১০৯)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শিরিকের মূল কারণ হচ্ছে নিছক ধারণা ও অনুমান এবং অন্ধ অনুকরণের পরিণতি ফল। আর আমাদের সমাজের মধ্যে বর্তমানে আকীদা বিশ্বাস ও কর্মজীবনের যে শিরিকীর ছাপ পরিলক্ষিত হয়, তার মূল কারণ এটাই।

শিরিক ছাড়া আমাদের মুসলিম সমাজে আর যে মারাত্মক পাপ কাজটি দেখা যায় তা হচ্ছে বিদ্‌য়াতী কাজ। বিদয়াত শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নতুনত্ব। আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে দ্বীন ইসলাম ও শরীয়তের মধ্যে এমন নতুনত্বের সৃষ্টি করা যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লামের যমানা হতে আরম্ভ করে সাহাবাদের ও তাবেঈনদের যমানা পর্যন্ত পাওয়া যায় না এবং কুরআন হাদীস ও ইজমা কিয়াসে যার কোন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুমোদন নেই। বিদয়াতী কাজকেও মূলতঃ শিরিকী আকীদা বিশ্বাসেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ফল বলা যেতে পারে। আর এ বিদয়াতী কাজই প্রকাশ্য শিরিকের প্রাথমিক মুখপাত্র রূপে কাজ করে থাকে।

সুতরাং প্রকাশ্যের অপ্রকাশ্যের ; লক্ষ্যের অলক্ষ্যের শিরিক থেকে আমাদের মুক্ত থাকা একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা আল কুরআন শিরিকীর অপরাধকে অমার্জনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ـ

'আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে কাউকে অংশীদার করার অপরাধকে কখনোই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না। এ অপরাধ ব্যতীত যত প্রকার অপরাধই হোক না কেন তা আল্লাহ তা'আলা যখন বেলায় ইচ্ছে ক্ষমা করে দিতে পারেন। (সুতরাং) যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার করে, তারা আল্লাহর নামের বাতিল মিথ্যা ও বিরাট (অমার্জনীয়) পাপ কাজ করতেছে।' (সূরা আন নিসায়া– ৪৮)

অতএব শিরিক আমাদের জন্য যেমন অবশ্য পরিত্যাজ্য বিষয় তেমনি পরিত্যাজ্য বিষয় বিদয়াতও। কেননা বিদ্‌য়াতীয় কাজই ক্রমান্বয় মানুষকে শির্‌কের ভিতর নিয়ে যায় এবং এর মুখপাত্র রূপে কাজ করে। বেপর্দেগী অবৈধ যৌন ক্রিয়াকলাপের মুখপাত্র হবার কারণে যেমন তা হারাম তেমনি বিদ্‌য়াত শিরিকের মুখপাত্র হবার দরুণ তাও হারাম। সুতরাং উভয়টাকেই আমাদের একই সাথে বর্জন করে চলতে হবে। আর এ ছাড়া অন্ধ অনুকরণের পথকে পরিহার করে আমাদের দ্বীনি এলম ও ইসলামের জ্ঞানের আশ্রয় নিতে হবে। কেননা অন্ধ অনুকরণের ফলেও আমাদের সামাজে বহুতর কাজ এমন আছে যা সম্পূর্ণরূপে শিরিক ও বিদ্‌য়াতী কাজ ও প্রথা প্রচলিত আছে সেগুলি এক এক করে শরীয়তের মানদণ্ডে ফেলে

(বি.এন.আর)-এর ডাইরেক্টর ডঃ হাসান জামান সাহেবের ইঙ্গিতে বাংলা তরজমা করে উক্ত সংস্থায় প্রকাশের জন্য দিয়েছিলাম। বইখানার নাম রেখেছিলাম 'শির্‌ক ও বিদয়াত।' কিন্তু আল্লাহর কি ইচ্ছে আমার সে প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বহু খোঁজাখুঁজি করে আমার পাণ্ডুলিপি না পেয়ে দ্বিতীয়বার আমি তার বাংলা তরজমা করে শিরীন পাবলিকেশন্স-এর কাছে অর্পণ করি, যার বাস্তব ফল আজ পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত। বাংলা তরজমা কতখানি স্বার্থক হয়েছে জানি না, তবে আমার এ প্রচেষ্টা বাংলার মুসলিম সমাজ যদি কিছুটা উপকৃত হয় তবে তাহাই হবে আমার পরকালীন মূল্যবান সম্পদ। আসুন আমরা সকলে আল্লাহ তাআলার দরবারে মোনাজাত করে কিতাব অধ্যয়নের মধ্যে মনোনিবেশ করি! আয় আল্লাহ! আপনি এই কিতাবের লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠকের সকলের শ্রম কবুল করে আমাদের সমাজকে খাঁটি আল্লাহ-ওয়ালা সমাজে পরিণত করুন। আমিন ইয়া রাব্বুল আলামীন।

বিনীত—
মোঃ কারামত আলী নিজামী
সাং নেসারাবাদ
পোঃ বাসণ্ডা
তাং ১৬ই জমাদিউল আউয়াল ১৩৯৬ হিঃ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কবর পূজার ধ্বংসাত্মক ফেৎনা	১৩
আয়াতের ব্যাখ্যা	১৪
'মাকানেন সহীক' এর ব্যাখ্যা	১৭
কাবীলের হাতে হাবীল নিহত হওয়ার ঘটনা	১৭
হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমের শিরিকের মূলভিত্তি	১৯
কবর পূজার বিশেষত্ব কারণ ও প্রতিকার	২০
বুযুর্গানে দ্বীনকে সিজদা করা ইয়াহুদী-নাসারাদের তরীকা	২২
কবরের উপর সমজিদ নির্মাণ ইয়াহুদী নাসারাদের তরীকা	২৩
কবরের সম্মুখে যে ধরনের কথা বলায় কবরকে প্রতিমায় পরিণত করিয়া থাকে	২৫
হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করার ঘটনা	২৬
হোদাইবিয়ার বৃক্ষকে মূলোৎপাটিত করার ঘটনা	২৬
পদচিহ্ন ও হস্তাঙ্কিত চিহ্নের হুকুম	২৭
পূজা পার্বন হইবার সম্ভাবনাময় কবরসমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলা ওয়াজিব	২৯
হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক শিরিক ও বিদয়াত নির্মূল করণের অন্যান্য কার্যাবলী	৩০
বর্তমান যুগের অবস্থা খুবই দুঃখজনক	৩২
বুযুর্গানে-দ্বীনের পরিত্যক্ত বস্তুগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক্রমান্বয়ে শিরিকীতে পরিণত হয়	৩৪
'মাকামে ইবরাহীম'-এর মহত্ত্ব	৩৫
শয়তানের চক্রান্ত	৩৬
মিথ্যা হাদীসের প্রোপাগাণ্ডা	৩৭
কবর পূজারকদের মিথ্যা কাহিনী	৩৮
কবর ধ্বংস করা সম্পর্কে হযরত আলীর (রাঃ) ফরমান	[illegible]

বিষয়	পৃষ্ঠা
এমাম ইবনে তাইমিয়ার ফরমান	৪০
মাজলেসুল আবরার কিতাবের ভাষ্য	৪১
কবর পূজারকদের সীমা লংঘন	৪৩
কবর পূজার বিরুদ্ধে সহী হাদীস	৪৬
কবর পূজারক ও মুশ্‌রিকগণের যুক্তি খণ্ডন	৪৮
যে কাজ আওলিয়াগণের ইবাদতকে অপরিহার্য করিয়া দেয়	৫১
কবর যিয়ারতের ফায়দা	৫২
মহানবী স্বীয় মাতার জন্য মাগফেরাত কামনা	৫২
অভিশপ্ত হওয়ার আশঙ্কা	৫৩
কবর যিয়ারতের সুন্নাৎ তরীকা	৫৪
বে-শরিয়তী পন্থায় কবর যিয়ারত দ্বারা নেক্‌কারগণের রূহ অখুশি হওয়ার বিবরণ	৫৫
সুন্নত তরীকা বর্জন ও শরীয়ত বিরোধী তরীকার অনুসরণের পরিত্যাগ করা একান্ত অপরিহার্য	৫৬
পীরের জন্য সুন্নাৎকে তরক করা মূর্তির ইবাদতের সামিল	৫৮
পথভ্রষ্টকারী নেতা ও ইমাম	৫৯
আমল মকবুল ও মরদুদ হওয়ার আলামত	৫৯
ঈসলামী আকীদা বিশ্বাস ও দ্বীনের স্তম্ভের বেলায় সুন্নাতের পায়রুবী ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ	৬০
কবর পূজা ও পীর পূজার প্রতিবিধান	৬১
আম্বিয়াগণের হাজত পেশ করার তরীকা	৬৩
পরকালের বন্দীগণের দু'টো গ্রুপ	৬৬
মহানবী আম্বিয়াগণের কবরের নিকট সাহায্য প্রার্থী না হওয়ার বিবরণ	৬৭
সাহাবায়ে কেরামগণের নবী করীম (সাঃ)-এর কবরের নিকট সাহায্য প্রার্থী না হওয়ার বিবরণ	৭০
নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের ঘটনা	৭০
পীর পূজার মূলোচ্ছেদে সাহাবাগণের কর্মপন্থা	৭২
উবাই মুনাফিকের জানাযার ঘটনা	৭৪
সুন্নাৎই একমাত্র মাপকাঠি	৭৬
সুফিগণের মতে পীরের কথা ও কাজ ইসলামের দলিল নয়	৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
অজ্ঞতাই মূল ব্যাধি	৭৯
ইয়াহুদিগণ অভিশপ্ত হইবার কারণ	৮২
নতুন পুরাতন মোশরেকগণের তরীকা	৮৪
কতিপয় শীর্ষস্থানীয় সুফিগণের মাযহাব	৮৫
দুষ্টলোকেরা ভাল লোকের বদনাম করে	৮৫
মূর্তি পূজারকদের সাথে কবর পূজারকদের সামঞ্জস্যতা	৮৭
কবরের ওরস ও মেলা	৮৯
শায়খুল ইসলাম ইমাম এবনে তাইমিয়ার আলোচনা	৯০
মূর্তি পূজারকদের সাথে সাদৃশ্যতার অবশিষ্ট আলোচনা	৯৩
শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) কর্তৃক শয়তানের চক্রান্ত ব্যর্থ করার ঘটনা	৯৬
শয়তানের প্রতারণা ও ধোকাবাজী ভয় করা উচিত	৯৭
খবীস শয়তানের ক্রিয়াকাণ্ড	৯৯
শয়তানী প্রবঞ্চনা ও অলৌকিকত্ব	১০০
স্বপ্নে মহানবীর যিয়ারত	১০২
পীর পূজারকদের ভ্রান্তি	১০৬
শয়তান ও জ্বীন ইন্‌সানের প্রবঞ্চনা হইতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত	১০৮
তাছাব্বুর ও তাছাররুফে শায়খ	১১০
পীর মাশায়েখগণের প্রতি খোদায়ীত্বের গুণাবলীর বিশ্বাস পোষণ করার বিবরণ	১১২
পীর বুজর্গানদের হালতের পায়রুবী করা উচিত নয়	১১৪
বুজর্গানে-দ্বীনের অসাধারণ অবস্থার অনুকরণ বিরাট ফেৎনা-ফাসাদের কারণ	১১৫
সতর্কবাণী	১১৬
আহলে সুন্নাৎ আল জামায়াতের তরীকা	১১৮
শিরিকী অজিফা	১১৯
অভিনব কথা ও উহার জবাব	১২১
সুফিগণের বাণী	১২৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
মনসুর হাল্লাজ সম্পর্কে শায়খ নিজামুদ্দিন আওলিয়ার ফতওয়া	১২৭
বিস্ময়কর নির্বুদ্ধিতা	১২৮
ঈমান আকীদার ক্ষেত্রে সুন্নাৎ অনুসরণের তাকীদ	১২৮
সতর্কবাণী	১৩২
শরীয়তের খেলাফকারীদের সাথে নরম পন্থা অবলম্বন হারাম	১৩৩
রহস্যের ঘটনা	১৩৫
কবর হইতে ফায়েজ গ্রহণ করা বিদয়াত	১৩৬
মিথ্যা হাদীস	১৪৪
সুন্নাতের পায়রুবীই ফেৎনা-ফাসাদের প্রতিবিধান	১৪৫
বুজর্গানদের আত্মাকে মনোনিবেশের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করার ফেৎনা	১৪৬
একটি হাদীসের আলোচনা	১৪৮
কবর হইতে ফায়েজ গ্রহণের ক্রিয়াকলাপ বিদয়াতী ফকীরদের আবিষ্কৃত মনগড়া কাজ	১৫৩
আসল ফকীরীর হাকিকত	১৫৩
একটি আয়াতের ব্যাখ্যা	১৫৪
অসীলার আয়াতের ব্যাখ্যা	১৫৮
তাজীমী সিজদার বিবরণ	১৬০
শরীয়তের বিরোধীতা করা কুফরীর নামান্তর	১৬২
পরিশিষ্ট	১৬৪
অন্ধ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসের আলোচনা	১৬৪



আল-বালাগুল মুবীন

কবর পূজার ধ্বংসাত্মক ফেৎনা

সামাজিক জীবনে এহেন পথভ্রষ্টকারী ফেৎনাটি এমন একটি অন্ধকারময় ফেৎনা যে, উহা মানুষের নূরানী কলবকে অন্ধ বানাইয়া দিয়াছে এবং উম্মতে মুহাম্মদী আল্লাহ তা'আলার বাতেনী নূর লাভ করিতে সমর্থ না হওয়ায় উহাদিগকে জাহেলীয়াতের ঘনঘোর অন্ধকারময় কুয়ার ভিতর নিক্ষেপ করিয়াছে। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমাইয়াছেন—

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاۤءِ فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ مِنْ مَّكَانٍ سَحِيْقٍ ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে কাহাকেও অংশীদার করে, উহার উদাহরণ হইল এই যে, উহা যেন আসমান হইতে ভূতলে ফেলিয়া দেওয়া হইল, অথবা উহাকে পথি–মধ্যে কোন জীবজন্তু কিংবা পশুপক্ষী ছোবল মারিয়া নিয়া গেল, অথবা দমকা বায়ু উহাকে উড়াইয়া নিয়া কোন অন্ধকারময় কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

অর্থাৎ এহেন ব্যক্তির কর্ণকুহরে সত্যের আহ্বান গিয়া পৌছে না। সে সত্য হইতে বহু দূর-দূরান্তে গিয়া সরিয়া পড়ে। আমাদেরকে ইহা খুব ভাল করিয়াই বুঝিতে হইবে যে, সবচেয়ে আল্লাহ্‌র পথ হইতে মানুষকে গোমরাহ করিবার মারাত্মক ফেৎনা হইল কবর পূজার ফেৎনা। কবর পূজারকগণকে পীর পোরস্ত নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। ইহারা এই কুসংস্কারটিকে ফরজ এবাদতের চাইতে অধিক দায়িত্বপূর্ণ ও মর্যদাশীল কাজ মনে করে। এমনকি উহারা কবর পূজাকে সুন্নাতও ভাবিয়া থাকে। সুতরাং উহাদের মতে কবর পূজা শরীয়তের প্রত্যেকটি এবাদতের বিনিময় এবং উহারা স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অন্য কোন ইবাদত এই কুকার্যটির পরিবর্তে যে করা যাইতে পারে তাহা কখনোই তাহারা মনে করে না। যেমন— কোন পীর-বুযর্গ লোকের জন্ম ও মৃত্যু তারিখে যখন উরশ ও মেলা হয়, সেখানে গিয়া উহারা ভিড় জমায়

এবং ঐ তারিখে সেখানে উপস্থিত হওয়াকে ফরজ ইবাদত ও দ্বীনি ইল্‌ম অর্জনের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করে। এখানে সব চাইতে যে কুকর্মটি হইয়া থাকে তাহা হইল, উহারা সকল পার্থিব সমস্যার সমাধান এবং বিপদ-আপদ হইতে মুক্তি লাভের জন্যই ঐ স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়। আর কবরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এমনভাবে বিনয় ও নম্রতার সাথে কাকুতি-মিনতি করিতে থাকে যে, এমনিভাবে কাকুতি-মিনতি মসজিদে গিয়া রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াইয়া কখনো করে না। আর কবরবাসীদিগকে তাহাদের নাম নিয়া ডাকিতে থাকে এবং তাহাদের নিকট বিভিন্ন বস্তু পাওয়ার জন্য দোয়াও করিয়া থাকে। তাহাদের নিকট নিজেদের রিযিক ও সন্তান-সন্ততিও চাহিয়া থাকে। আর নিতান্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে সম্মান ও সম্ভ্রমের মন নিয়া পূজারীরূপে কবরের সামনে বসিয়া যায়। আর খুব মূল্যবান গিলাফ দ্বারাও কবরকে সুসজ্জিত করিয়া সুগন্ধি লাগাইয়া দেয় এবং উহার চতুর্দিকে লোবান ও আগরবাতি প্রজ্জ্বলিত করিয়া স্থানটিকে সুগন্ধময় ও মোহনীয় করিয়া তোলে। উহারা খুব ছওয়াবের কাজ মনে করিয়া কবরের উপর ঝাড়বাতিও জ্বালায়। (বর্তমান যুগে বিভিন্ন রং-এর ইলেকট্রিক বাতি জ্বালান হয়) তাহারা এহেন অনর্থক অপব্যয় দ্বারা কবরবাসীদের আত্মার খুশি কামনা করিয়া তাহাদের নৈকট্য লাভের আশাও পোষণ করিয়া থাকে। হিন্দু ও মুশ্‌রিকগণ যেরূপ নিজেদের প্রতিমা ও মূর্তির সাথে ব্যবহার করিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের মুসলিম সমাজের কতিপয় লোক বুযুর্গানদের কবর নিয়া এমনি বহুত ধরনের অকর্ম-কুকর্ম করে, যাহার সমর্থন শরীয়তের কোথাও বিন্দুমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আয়াতের ব্যাখ্যা

এই মারাত্মক ফেৎনাটির মূল হাকিকত অবগত হওয়ার পর আমাদের আল্ কুরআনের উল্লেখিত আয়াতটির বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। উল্লেখিত আয়াতটির ভিতর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে চারিটি কথা বলিয়াছেন—

১. আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করা;
২. আসমান হইতে নিক্ষেপ করা;
৩. পশু-পক্ষীরা ছোবল মারিয়া নিয়া যাওয়া;
৪. আর ঘূর্ণিবায়ু বা দমকা বায়ু কর্তৃক দূর-দূরান্তে নিয়া ফেলিয়া দেওয়া।

পহেলা বিষয়টির অর্থ হইল, যেসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী আল্লাহ তা'আলার নিজ সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট, সেই সকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলীকে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ব্যতীত অপর কোন সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট না করা। যেমন কাহাকেও জীবিত করা, মৃত্যুদান করা, সন্তান-সন্ততি দান করা, রিযিক দেওয়া, অদৃষ্ট ও গোপনীয় বিষয়ের জ্ঞান থাকা ইত্যাদি। এই সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথেই সংশ্লিষ্ট। এই কাজ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাহারো দ্বারা হইতে পারে না— হওয়া সম্ভব নয়। এই কাজ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কাহারো দ্বারা হইতে পারে এমন ধারণা ও বিশ্বাস থাকাটা শির্‌ক বৈ আর কি হইতে পারে? নতুবা আল্লাহ তা'আলার সাথে দ্বিতীয় কোন মা'বুদ বা অংশীদার আছে এ কথা কোন মানুষই কখনো স্বীকার করে না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন সত্তার সাথে হেন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর সংযোজন ও সংশ্লিষ্টকরণ প্রকাশ্য শির্‌ক ছাড়া কিছুই নয়। দ্বিতীয় বিষয় আসমান হইতে নিক্ষেপ করার অর্থ হইল, দ্বীন ও তাওহীদ আসমানের ন্যায় একটি সীমাহীন ও মহাসম্মানিত বস্তু এবং উহার ধারক বাহকগণও হয় মহৎ ও সম্মানের দিক দিয়া আসমানের ন্যায় সমুন্নত। তাই রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সাল্লামের সুন্নাতের নূরের আলোকবর্তিকা দ্বারা মুসলমানের অন্তঃকরণ এমনভাবে নূরানীও আলোকিত হইয়া যায়। যেমন— সূর্যের উজ্জ্বল কিরণমালা দ্বারা সমগ্র দুনিয়া আলোকিত হইয়া উঠে। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লামের সাহাবীগণের কার্যকলাপ ও বাক্যাবলী উজ্জ্বল তারকার ন্যায় মুসলমানগণকে হেদায়াতের পথের নির্দেশ দিতে থাকে। যেমন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন—

'আমার সাহাবীগণ উজ্জ্বল তারকা সদৃশ। এদের ভিতর যাহারই অনুকরণ করিবে, তুমি হেদায়েত প্রাপ্ত হইবে।' ইমাম হাম্বল, ইবনে হাযম, আব্দুল বার্ মওযু বলেছেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি দ্বীন ও তাওহীদ পরিত্যাগ করিয়াছে সে জীবনের সম্মান ও মহত্ত্ব সবকিছু চুলায় জ্বালাইয়া দিয়াছে। এই কথাটিই আল কুরআনের ভাষায় আসমান হইতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার অর্থ বুঝাইয়াছে। এখানে সাদৃশ্যমূলক শব্দ ছোবল শব্দের সাথে ব্যবহার করার বিষয়টির গুরুত্ব ও স্পষ্টতা অধিক মাত্রায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। এখন আসুন তৃতীয় নম্বরের পালায়। এখানে আল কুরআন পক্ষী কর্তৃক ছোবল মারিয়া নিয়া যাওয়ার কথা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে

যে, শয়তান মুশ্‌রিকগণকে ছোবল মারিয়া নেওয়ার জন্য আসমানের শূন্যমণ্ডলে উড়িয়া বেড়াইতে থাকে। যেমন— চিল, কাকশিকার ধরার জন্য উড়িয়া বেড়ায় তেমনি শয়তানও মুশ্‌রিকগণকে ছোবল মারিয়া নেওয়ার জন্য সুযোগের অন্বেষণে আসমানে ঘুরাফেরা করিয়া উড়িতে থাকে। তবে এখানে ইহা সম্যক অবগত হওয়া উচিত যে, মুশ্‌রিক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর লোক প্রকাশ্যে শির্‌ক করিয়া থাকে। ফলে শরীয়তও প্রকাশ্যে তাহাদের প্রতি তার হুকুমনামা জারি করিয়া দেয়। অর্থাৎ পার্থিব জগতেই তাহারা মুশ্‌রিক নামে অভিহিত হয়। আর দ্বিতীয় ধরনের মুশ্‌রিক হইল ঐ সকল লোক যাহারা প্রকাশ্যে শির্‌ক করে না; বরং নিজেদের আকীদা, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে শির্‌ক করিয়া থাকে। ফলে শরীয়তও এই পার্থিব জগতে তাহাদের প্রতি শির্‌কের হুকুমনামা জারি করে না। কিন্তু পরকালে তাহাদের প্রতি শির্‌কের হুকুমনামা অবশ্যই জারি করা হইবে এবং সেখানে তাহারা মুশ্‌রিকদেরই দলভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রথম শ্রেণীর মুশ্‌রিকগণকে পক্ষী কর্তৃক ছোবল মারিয়া নেওয়ার সাথে তুলনা করিয়াছে। অর্থাৎ পক্ষী যেমন শিকারকে নিজ আয়ত্তাধীনে নিয়া যায়, তেমনি শয়তানও পূর্ণরূপে তাহাদিগকে নিজ আয়ত্তাধীনে নিয়া ফেলিয়াছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মুশ্‌রিকগণকে তুলনা করিয়াছে দমকা বায়ু বা ঘূর্ণিবায়ু কর্তৃক দূর-দূরান্তে নিয়া ফেলিয়া দেওয়ার সাথে। সুতরাং এই দমকা হাওয়া বা ঘূর্ণি হাওয়াটি কি বস্তু তাহাও আমাদের অবহিত হওয়া আবশ্যক। এ বস্তুটি হইল মানুষের নফসের খাহেশ বা প্রবৃত্তির অনুগত হওয়া। প্রবৃত্তির অনুকরণের ফলেই অগণিত মুনাফিক ধ্বংস ও বরবাদ হইয়া গিয়াছে। তাহারা প্রকাশ্যে শিরক না করিলেও অন্তরের গোপন কোঠায় শির্‌ক পোষণ করিয়াছে। তাই আল্ কুরআনও সোচ্চার গলায় তাহাদের মর্মান্তিক পরিণতির কথা ঘোষণা দিয়া বলিয়াছে—

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ, মুনাফিকগণ অবশ্যই দোযখের সর্বনিম্ন তলায় অবস্থান করিবে। (সূরা নেসা— ৪ ঃ ১৪৫)

সুতরাং আল-কুরআন উপরোক্ত আয়াতে দমকা হাওয়া বা ঘূর্ণিবায়ুর দ্বারা নফসের খাহেশের এত্তেবা বা প্রবৃত্তির চাহিদার অনুকরণের কথাই বুঝাইয়াছে। প্রবৃত্তির অনুকরণ করাই হইল ইহার সঠিক ব্যাখ্যা।

'মাকানেন সহীক'-এর ব্যাখ্যা

ইতিপূর্বে আল্ কুরআনে উল্লেখকৃত আয়াতে মাকানেন সহীক অর্থাৎ দূর-দূরান্তে নিয়া নিক্ষেপ করিয়া ফেলা। যেখানে এই ঘূর্ণিবায়ু এবং প্রবৃত্তির খাহেশ মানুষকে নিয়া ফেলিয়া দেয় এবং যেখান হইতে মানুষের ফিরিয়া আসা খুবই মুস্কিল হইয়া দাঁড়ায় সেই দূর-দূরান্তের স্থান কোন্‌টি? এই স্থানটি হইল পূর্বপুরুষগণের অন্ধ অনুকরণের স্থান। এই স্থানে পৌছিয়া তাহারা যে বিবৃতি প্রকাশ করে বা মুখে উচ্চারণ করে তাহা আল কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ।

اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ.

অর্থাৎ, আমরা আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষগণকে বিশেষ একটি তরীকার উপর চলিতে দেখিয়াছি। আর আমরাও তাহাদের অনুসৃত মত, পথ ও তরীকার উপর চলিতে থাকিব।

শির্‌ক মানুষের জন্য এমন একটি ভয়ানক বিপদ যাহার পরিণতি ধ্বংস ছাড়া কিছুই নয়— এই কথা যখন আমরা ভালরূপে অবগত হইলাম, তখন আমাদের শির্‌কের মুখপাত্র কুসংস্কার ও বিদয়াত হইতে দূরে থাকার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত। কেননা পূর্বকালে জাহেলীয়াত ও অকর্ম-কুকর্ম বর্তমানের তুলনায় খুবই কম ছিল। পরবর্তীকালে তাহা কম হওয়া তো দূরের কথা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়াই চলিয়াছে।

কাবীলের হাতে হাবীল নিহত হওয়ার ঘটনা

হযরত আদম আলাইহিস সাল্লামের যত ঔরসজাত আওলাদ ছিলেন তাহারা সকলেই আল্লাহ তা'আলার বিধান এবং হযরত আদম (আঃ)-এর কথা মানিয়া চলিতেন। এই পার্থিব জগতে সর্বপ্রথম শরীয়ত বিরোধী যে কুকর্মটি সংঘটিত হয় তাহা হইল যৌন কাজের প্রতি প্রবল বাসনা এবং উহার প্রতি অনুরাগী হওয়া। হযরত আদম (আঃ)-এর ছেলে কাবীল তাহার সহোদরা ও একই জোড়াভুক্ত ভগ্নিকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। যাহার কারণে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানির কাল দাগ তাহার ললাট ভূমিতে পড়িয়া গেল। তাহার অন্তরে যখন এই হারাম কাজের প্রবল স্পৃহা দেখা দিল, তখন মনের এই প্রবল বাসনাই আপন সহোদর ভাই হাবীলকে হত্যা করার কারণে পরিণত হইয়াছিল। হাবীলের হত্যা ঘটনার

পর ফেরেস্তাগণের উপর আল্লাহ তা'আলার এই হুকুম জারি হইল যে, এই জগতে অন্যায়ভাবে যত হত্যাজনিত ঘটনা ঘটিবে উহার হত্যাকারীর গুনাহর পরিমাণ গুনাহ কাবীলের আমলনামায় লিখিতে থাকিবে। কাবীল নিজ ভাইকে হত্যা কর্‌বার পর হযরত আদম (আঃ)-এর দরবার হইতে পালাইয়া গিয়া পাহাড়ে স্থান লইল এবং সেখানে জ্বিনদের সাথে বসবাস করিতে লাগিল। তাহার থেকে যত সন্তান জন্ম হইয়াছিল তাহারা সকলেই আল্লাহ্‌র নাফরমান হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম এবং তাহারা গোপনে বসবাস করিত। হযরত আদম (আঃ)-এর অন্যান্য সন্তানগণ তাঁহার প্রবর্তিত শরীয়তকে এই জগতের বুকে প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। হযরত আদম (আঃ)-এর ইন্তিকালের পর তাহার ছেলে হযরত শীশ (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুম এবং পিতার অসিয়ত মাফিক পয়গম্বর হইলেন। হযরত শীশ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর হইতেই কতিপয় উলামাদের মতে মূর্তি পূজার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল। আর কতিপয় উলামায়ে কেরাম বলিয়া থাকেন, হযরত শীশ (আঃ)-এর ইন্তিকালের পরেও তাহার আওলাদগণের মধ্যে দ্বীন ইসলামের হেদায়েত প্রচলিত ছিল। তাহার পৌত্র হযরর ইদ্রীস (আঃ)-এর নবুয়তীর মসনদে সমাসীন হইয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বিভিন্ন প্রকার ইল্‌ম ও জ্ঞানের অধিকারী বানাইয়াছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যা এই দুনিয়ার সর্বপ্রথম তাহার দ্বারাই প্রকাশ পাইয়াছিল। হযরত ইদ্রীস (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা আসমানের পথে নিয়া বেহেস্তে দাখিল করিলে তাহার উম্মতের মনে তাহার দর্শন ও মোলাকাত লাভের প্রবল আকাঙ্খা জন্মিল। এমনকি তাহার উম্মতের কতিপয় লোক তাহার বিয়োগ ব্যথায় পাগল হইয়া গেল। মানুষের পরম ও চরম শত্রু শয়তান এই সময়টিকে তাহার সুযোগ মনে করিয়া হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর আওলাদ এবং তাহার বন্ধু-বান্ধব ও গুণগ্রাহীদের কাছে মানুষের আকৃতিতে আসিয়া বলিল— আমি হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর নূরানী চেহারা মুবারকটি দর্শন করিয়াছি। আর আমি মূর্তি তৈয়ার করিতেও বেশ পারদর্শী। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, তবে আমি হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর আকৃতির ন্যায় অবিকল আকৃতিসম্পন্ন একটি মূর্তি তৈয়ার করিয়া দিতে পারি। তোমরা ঐ মূর্তিটিকে শীশার ধাতুর আবরণ দ্বারা জড়াইয়া হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর শয়ন কক্ষের দরজার সম্মুখে খুব সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠা করিবে এবং মানুষের মধ্যে এই কথা প্রচার করিয়া দিবে যে, তোমাদের হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর চেহারা মুবারক দেখিতে বাসনা হইলে এখানে আসিলেই দেখিতে পাইবে। সুতরাং

ইবলীসের পরামর্শ মতই কাজ হইল এবং মানুষ দলে দলে সেখানে আসিয়া মূর্তিটিকে নজর নিয়াজ দিয়া যাইত এবং মূর্তিটির উজ্জ্বল ও মোহনীয় সৌন্দর্য অবলোকন করিয়া বিমোহিত হইয়া পড়িত। তবে হযরতইদ্রীস (আঃ)-এর উম্মতের কতিপয় লোক এই মূর্তি পূজা হইতে দূরে থাকিয়া অন্যান্যদেরকে উহা হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিল বটে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার এই পার্থিব জগতে ন্যায়-অন্যায় সু ও কু উভয়বিধ কাজকে প্রচলিত রাখার ইচ্ছা ছিল বলিয়া এই নেকভক্ত লোকদের প্রচেষ্টার কোনই ফলোদয় হইল না এবং তাহাদের অন্তরেও কোন প্রভাব পড়িল না। ক্রমান্বয়ে তাহারা মূর্তি পূজার কাজে লিপ্ত হইয়া গেল।

হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমের শির্‌কের মূল ভিত্তি

হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর ইন্তেকালের পরবর্তীকাল হইতে মূর্তি পূজার প্রচলন ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হইয়া হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমের মধ্যে ইহার প্রচলন হইয়া গেল। এই কওমের মধ্যে প্রতিমা পূজা ও কবর পূজার বেশ ধুমধাম লাগিয়া গেল। সুতরাং নেকভক্ত ও বুযর্গলোকগণের ইন্তেকাল হইলেই তাহাদের কায়া মূর্তির পূজা-পার্বন আরম্ভ হইয়া যাইত। আর তাহারা এই সকল মূর্তি ও প্রতিমাগুলির নাম ঐ সকল বুযর্গানের নামানুসারে রাখিত এবং উহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনকে মৃত বুযর্গানে দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয় বলিয়া মনে করিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস সহ অন্যান্য বুযর্গানেদ্বীন থেকে আল কুরআনের আয়াত—

وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۔

এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের উল্লেখিত নামগুলি হইল হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমের নেক্‌কার ও বুযর্গ লোকগণের নাম।

সুতরাং এই সকল বুযর্গলোকের কোন একজনের ইন্তেকাল হইলে পর তাহার অনুসারী ভক্তগণ তাহার কবরের নিকট গিয়া দিনের পর দিন মাসের পর মাস চেল্লায় কাটাইয়া দিত এবং তাহাদের নিকট নিজেদের মনোবাঞ্ছা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করিত। মোটকথা এমনিভাবে ভক্তির আতিশয্যে আরোহণ করিয়া তাহারা উহাদের কায়া মূর্তি বানাইয়া পূজা-পার্বন আরম্ভ করিয়া দিত। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা এই সকল প্রতিমা পূজারকদের কথা আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

قَالَ نُوحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِىْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗ اِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا . وَقَالُوْا لَاتَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَاسُوَاعًا وَّلَايَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَلَاتَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلاً .

অর্থাৎ, হযরত নূহ (আঃ) বলিলেন— হে আমার পরওয়ারদিগার! এই লোকেরা আমার কথা শুনিতেছে না। তাহারা এমন লোকেরই অনুকরণ ও পায়রবী করিতেছে, যাহার ধন-সম্পদ ও আওলাদ তাহাদিগকে ক্ষতি ও ধ্বংস ছাড়া আর কোনই উপকার করিতে পারিতেছে না। এ সকল নেতৃবৃন্দ এমন লোক যাহারা হক্ককে দুনিয়ার বুক হইতে চিরতরে মিটাইয়া দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার চক্রান্ত করিতেছে। আর উহারা নিজেদের অনুসারীগণকে এই পরামর্শ দিয়া থাকে যে, তোমরা তোমাদের মাবুদগণকে কখনো পরিত্যাগ করিবে না। বিশেষ করিয়া অদ্দা, সুয়্যা, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নছরকে মনের ভুলেও ছাড়িবে না। এমনিভাবে এই সকল নেতৃবৃন্দ অগণিত মানুষকে আল্লাহ্র পথ হইতে দূরে সরাইয়া নিয়া গোমরাহ করিয়া ফেলিয়াছে। এখন আপনি এই জাহেলদের গোমরাহী আরো বাড়াইয়া দিন। (সূরা নূহ)

কবর পূজার বিশেষত্ব কারণ ও প্রতিকার

শয়তানের সেনাবাহিনী শিরক মিশ্রিত কবর পূজা, মূর্তি পূজা এবং ইহার প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের গোমরাহী ও বিদয়াতকে প্রচলিত করিয়া বহু পূর্বকাল হইতেই সমাজকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং এই গোমরাহী ও বিদয়াতের মধ্যে যে হেদায়েতের লেশমাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, সে বিষয় আমাদের সজাগ থাকা উচিত এবং উহা হইতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের কবর পূজারকগণ নিজেদের খেয়াল-খুশি ও মনগড়া কথা দ্বারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের বিরোধিতা করার জন্য কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে এবং অজ্ঞানতার মধ্যে নিমজ্জিত সরল প্রাণ জনসাধারণ এই দিকে আদৌ লক্ষ্যই দিতেছে না। ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনিটি বিষয়কে নীতিরূপে নির্ধারণ করা হইয়াছে। প্রথমটি হইল আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত পবিত্র কালামের মুহকাম আয়াতসমূহ। আর

দ্বিতীয়টি হইল নবী করীম (সঃ)-এর হদীসসমূহ। তৃতীয়টি হইল রাসূলে করীম (সঃ)-এর সাহাবাগণের ইজমা বা সম্মিলিত অভিমত। যে সকল বিষয়কে এই নীতিত্রয়ের বিরোধী বলিয়া মনে হইবে তাহা প্রত্যাখ্যান ও অভিশপ্ত মনে করিয়া অবশ্যই পরিত্যাগ করিয়া চলিতে হইবে। উহা মুসলমানদের জন্য গ্রহণ করা কখনোই বৈধ নয়। সুতরাং যে সকল বিষয় এই নীতি তিনিটির পরিপন্থী তাহা সবই মরদুদ, প্রত্যাখ্যাত ও অভিশপ্ত— ইহা যখন আমরা জানিতে পারিলাম, তখন কবর পূজার মূল কারণটিও আমাদের এই নীতি তিনটির ভিতর অনুসন্ধান করিতে হইবে। যদি ইহার ভিতর ইহার পক্ষে আদৌ কোন সমর্থন না পাওয়া যায় বরং নিষেধাজ্ঞা পরিলক্ষিত হয়, তবে যখন তখনই উহা আমাদের পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেননা যে বিষয়টি বিদয়াত সেই বিষয়টিকে বিদয়াত ও গোমরাহী জানার পর, আবার বিদয়াদ ও গোমরাহীকে গ্রহণ করার চাইতে বড় গোমরাহী ও খারাপ কাজ কিছুই থাকিতে পারে না। বরং তাহা সব চাইতে ভৎর্সনা ও অভিশপ্ত হওয়ার কারণে পরিণত হইয়া থাকে। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشَاوَةً فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ .

অর্থাৎ, আপনি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, যিনি নিজের নফসের খাহেস বা প্রবৃত্তির আকাঙ্খাকে নিজের মা'বুদ বানাইয়া নিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাহার জ্ঞান বুদ্ধি ও বুঝ শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আর তাহার কর্ণে ও অন্তরে মোহর অঙ্কিত করিয়া চক্ষু যুগলের উপর পর্দা ঝুলাইয়া দিয়াছেন। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহ করিয়া দেওয়ার পর হেদায়েত করিতে পারে এমন লোক কে আছে? তোমরা কি এখনো উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না? (সূরা আল-জাছিয়া)

কুরআনে করীমের এই আয়াতটির ব্যাখ্যা ও মর্ম কি, সে সম্পর্কে তাফসীর ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করা উচিত। ইস্রাইল বংশের নবীগণ ইন্তেকাল করিয়া যাওয়ার পর তাহাদিগের প্রতি সীমাতিরিক্ত মহব্বত ও ভালবাসা প্রদর্শন করার ফেৎনাটিই উহাদিগকে পথভ্রষ্ট করার সব চাইতে বড় কারণ ছিল এবং এই কারণেই নিজেদেব জীবনে উহারা ধ্বংস টানিয়া আনিয়াছিল। ইয়াহুদীগণ তাহাদের আহ্বান অর্থাৎ আলেম উলামা ও পীর

দরবেশগণকে হেদায়েত দানকারী ও হাজত পূর্ণকারী মনোনীত করিয়া নিয়াছিল। নাছারাগণের রাহেবগণ যাহারা বৈরাগী বা দুনিয়াত্যাগী ছিল উহারা তাহাদিগকে এবং হযরত ইসা বিন মরিয়ম আলাইহিস সালামকে أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন সত্তাকে মা'বুদ বা পরওয়ারদিগার মনোনীত করা) বানাইয়া নিয়াছিল। সুতরাং উহারা আপদে-বিপদে বালা-মুসিবতে সকল সময় ও কাজের জন্য তাহাদের নিকট দৌড়াইয়া যাইত। আর তাহারা যাহা কিছু করিতে হুকুম করিত, উহারা তাহাই করিয়া যাইত। তাহাদের নির্দেশ ও হুকুম আল্লাহ তা'আলার হুকুমের অনুগামী না বিরোধী, সেদিকে উহারা আদৌ ভ্রুক্ষেপ করিত না এবং তাহা নিয়া চিন্তা-ভাবনা করাকেও সমীচীন মনে করিত না। অথচ উহাদের পয়গম্বরগণ আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে উহাদিগকে এই কথাই শুনাইয়াছেন যে, 'তোমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর। আল্লাহ তায়ালই তোমাদের জীবনের আসল নিয়ন্ত্রক।'

বুযূর্গানে দ্বীনকে সিজদা করা ইয়াহুদী-নাসারাদের তরীকা

ইয়াহুদী নাসারাদের শির্ক অভ্যাসের মধ্যে একটি বদ অভ্যাস হইল নিজ ধর্মের বুযর্গ লোকদেরকে সিজদা করা। তাই পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই কাজকে শির্ক নামে অভিহিত করিয়া এরশাদ করিয়াছেন—

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

অর্থাৎ, তাহারা আসল প্রভুকে ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের আলেম উলামা ও পীর দরবেশগণকে (শক্তির দিক দিয়া) রব্ বানাইয়া নিয়াছে। আর হযরত মরিয়ম আলাইহিস্ সালামের ছেলে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে প্রভু মনোনীত করিয়া নিয়াছে। অথচ তাহাদিগকে একমাত্র সেই চিরন্তন সত্য ও অবিনশ্বর মা'বুদের ইবাদত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যিনি ব্যতীত অন্য কেহ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়। তিনি ইহাদের শির্ক হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। (সূরা তাওবা- ৩১)

বস্তুতঃ উল্লেখিত আয়াতে শির্ককে যখন উহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে, তখন উল্লেখিত কাজ যাহার দ্বারাই সংঘটিত হইবে তাহাকেই মুশ্রিক উপাধিতে ভূষিত করিতে হইবে এবং সে যে শির্কী কাজ করিতেছে তাহা বলাও যথোচিত ও সঠিক হইবে। সুতরাং বর্তমান যমানায় কতিপয় কাণ্ডজ্ঞানহীন জাহেল লোক বলিয়া থাকে যে, পীর ফকিরগণ যে হুকুমই করিয়া থাকেন, তাহা মানিয়া চলা ওয়াজিব। তাহা যদি শরীয়তের খেলাফও হয় এবং শরীয়ত যদি প্রত্যাখ্যান করে, তবু তাহা আমল করা একান্ত জরুরী। ইহারা নিজেদের এই বক্তব্যের সমর্থনে হাফেজ শিরাজীর নিম্নলিখিত রূপক কবিতাংশটিকে আসল কথা মনে করিয়া দলিলস্বরূপ পেশ করে। হাফিজ বলেন—

به می سجاده گین کن گرت پیر مغان گوید
که سالك بے خبر نبو زراه رمم منزلها.

অর্থাৎ, পীরে কামেল যদি জায়নামাযকে শরাবের দ্বারা রঙ্গিন করারও হুকুম দেয়, তবে তাহা আমল করা উচিত। কেননা পথ প্রদর্শকগণ পথের চিহ্ন সম্পর্কে অনবাহত থাকেন না।

সুতরাং ইহারাও أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন সত্তাকে মা'বুদ মনোনীত করা)-এর প্রবক্তাদের ন্যায় শির্কী ও গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা উহাদিগকে তাওবা করার তাওফীক দান করুন। আর আমাদিগকেও তাওবা করার এবং দ্বীনের উপর দৃঢ় সংকল্প হইয়া দাণ্ডায়মান থাকার ক্ষমতা দান করুন। আমিন, বেরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহেমীন।

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ ইয়াহুদী-নাসারাদের তরীকা

ইয়াহুদী নাসারাগণের শির্কী অভ্যাসসমূহের মধ্যে ইহাও একটি অভ্যাস ছিল যে, উহারা আম্বীয়াগণের এবং পীর ফকির ও বুযূর্গানে দ্বীনের কবরকে মসজিদের ন্যায় মনে করিত। শুধু মনে করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত ছিল না বরং আম্বীয়ায়ে কেরাম ও বুযর্গানে দ্বীনের কবরের উপর অন্যান্য স্থানের তুলনায় মসজিদ নির্মাণ করাকে উত্তম ও ফজিলতপূর্ণ কাজ মনে করিত। তাহারা কবরস্থানকে আলোকিত করিয়া সেই কবরসমূহকে তাওয়াফ ও সিজদা করিত।

আর ঐ কবরসমূহকে নানা প্রকার রংয়ে সজ্জিতকরণের কাজে সীমাতিরিক্ত অনর্থক অর্থ-সম্পদও ব্যয় করিত। ঐস্থানে লোবান ও সুগন্ধীদ্রব্য জ্বালাইয়া স্থানটিকে মোহনীয় করিয়া তুলিত। যে সকল স্থানে আম্বীয়ায়ে কেরাম ও বুযূর্গানে দ্বীন সমাহিত হইতেন, সেইসব স্থানে তাহারা নামায পড়াকে অপরিহার্য ও জরুরী মনে করিত। তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদের এহেন অপকর্মের পরিণতির কথা উল্লেখ করিয়া এরশাদ করিয়াছেন—

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদ ও নাসারাগণের উপর তাহার লানত ও অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন। কারণ তাহারা নিজেদের নবীগণের কবরসূহকে মসজিদ বানাইয়া নিয়াছে।

এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তা এবং মিশ্কাতুল মাছাবীহ কিতাবসমূহে উল্লেখ রহিয়াছে। মাজালেসুল আবরার কিতাবের লেখক এই হাদীসটিকে ঐ সকল লোকের কুকর্মের প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, নবী করীম (সঃ) ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি লানত বর্ষণের বদ-দোয়া এই জন্য করিয়াছেন যে, তাহারা নবী-রাসূলগণের কবরে গিয়া নামায পড়িত এবং মনে করিত যে, কবরের উপর অথবা কবরের দিকে ফিরিয়া জিসদা করার দ্বারা কবরবাসীর প্রতি সম্মান প্রর্দশন করা হয়। আর ইহা করাই হইল প্রকাশ্য শির্কী! কবরের উপর নামায পড়া এবং কবরকে সিজদা করার দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য যদি এই হইয়া থাকে যে, ইহা দ্বারা বুযুর্গদের তাজীম, তাকরীম ও নৈকট্য লাভ করিবে এবং আল্লাহ তা'আলারও ইবাদত হইবে, তবে ইহাকে শিরকে খফী বা অপ্রকাশ্য শির্ক বলা হয়। এই সম্মান প্রদর্শক সিজদার কারণেই হযরত নূহ (আঃ)-এর কওম-এর মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন হইয়াছিল। ইতিপূর্বে হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আদ্দা, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসর নামীয় প্রতিমাসমূহের আলোচনায় বর্ণিত হাদীসটি যাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে এই ধরনের বহু হাদীস বর্ণিত হইয়া সিয়াহ সেত্তার কিতাবসমূহে উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি এরশাদ করিয়াছেন—

لَا تَتَّخِذُوْا قَبْرِىْ وَثَنًا.

অর্থাৎ, আমার কবরকে তোমরা প্রতিমা বানাইও না।

ইহা ছাড়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলিয়া প্রার্থনাও করিয়াছেন—

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُّعْبَدُ.

অর্থাৎ, হে রাব্বুল আলামীন! আপনি আমার কবরকে প্রতিমায় পরিণত করিবেন না যে উহার পূজা-পার্বন হইতে থাকে।

কবরের সম্মুখে যে ধরনের কথা বলায় কবরকে প্রতিমায় পরিণত করিয়া থাকে

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, صَنَمٌ (সানাম) শব্দের তুলনায় وَثَنٌ (ওয়াছ্ন) শব্দ অতি সাধারণ অর্থবোধক। ইহা আকৃতি অনাকৃতি উভয়ের উপর প্রযোজ্য হয়। সুতরাং ইহার দ্বারা বুঝা গেল যে কবরও পূজাপার্বন হইলে অছন শব্দের অর্থের মধ্যে অর্থাৎ মূর্তি পূজার মধ্যে শামিল হইয়া যায়। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন—

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ.

অর্থাৎ, প্রতিমার নাপাকী ও পলিদী হইতে বাঁচিয়া থাকা।

প্রাচীন মুহাদ্দীস ইমাম আবু বকর বিন্ শাইবা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এক ব্যক্তি কিছু আবেদন-নিবেদন করিলে ইমাম জয়নুল আবেদীন ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) তাহাকে এই ধরনের কথাবার্তা বলিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার কবর মুবারককে প্রতিমায় পরিণত করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

এই হাদীস দ্বারা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায়, মূর্তিপূজারকগণ নিজেদের প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে কথাবার্তা বলিয়া থাকে, অনুরূপ কোন কথাই কবরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলা উচিত নয়। কেননা কবরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই ধরনের কথাবার্তা বলা নিঃসন্দেহে কবরকে প্রতিমার মধ্যে শামিল করিয়া দেয়। সুতরাং ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শুধু অপরিহার্য নয় বরং ওয়াজিব। হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী (রঃ) যাহারা উদ্ভাবিত নক্শাবন্দীয়া তরীকা সম্পূর্ণরূপে সুন্নাতের অনুসরণের ভিত্তির উপর রচিত। তিনি বলিয়াছেন— তুমি আর কত দিন বুযূর্গানে দ্বীনের কবরকে পূজা করিতে থাকিবে? আল্লাহ-ওয়ালাদেরকে অনুকরণ করিয়া নিজেদের পরকালের পথ পরিষ্কার করা। সাহাবায় কেরামগণ যে জিনিসের মধ্যে শিরকে খফী অর্থাৎ অপ্রকাশ্যে শির্ক হওয়া অনুভব করিতেন, তাহারা সেই বস্তুকে পূর্ণ চেষ্টা-চরিত্র চালাইয়া পরিত্যাগ

করিয়া চলিতেন। সুতরাং কবর পূজারকদের ন্যায় বাতিল ও বিদয়াতী কথা বলা এবং তাহাদের কাজ-কর্ম দ্বারা ইহা প্রকাশ হওয়ার দ্বারা পরিষ্কাররূপে এই সকল গোমরাহী ও বিদয়াতের প্রতি কঠোর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে বলিয়া প্রামণিত হয়।

হযরত উমর (রাঃ) কর্তৃক বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করার ঘটনা

হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে কোন এক সময় অনাবৃষ্টির কারণে সমগ্র দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। তখন হযরত উমর (রাঃ) সাহাবায়ে কেরামগণের বিরাট এক দলসহ মদীনা শহরের বাহিরে গিয়া হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর উসিলা দিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন— হে পরওয়ারদিগারে আলম! আমরা ইহার পূর্বে আপনার প্রিয় মাহবুব হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-কে অসিলা বানাইয়া আপনার নিকট দো'য়া করিতাম। এখন আপনার প্রিয় নবীর চাচাকে উসিলা বানাইয়া আপনার নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিতেছি। এই ঘটনার দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হয়, অদৃশ্য এবং মৃত্যু ব্যক্তিগণকে অসিলা বানান আদৌ জায়েয নাই। যদি জায়েযই হইত, তবে হযরত উমর (রাঃ), নবী করীম (সঃ)-এর উসিলা দিয়াই দো'য়া করিতেন। কেননা হযরত আব্বাস (রাঃ) নবী করীম (সঃ)-এর তুলানায় অধিক বুযর্গ লোক নয়। হযরত উমর (রাঃ) তো এই কথা বলিলেন না যে, আমরা প্রথমতঃ আপনার নবী করীম (সঃ)-কে অসিলা বানাইয়া দো'য়া করিতাম। এখন আপনার নবীর রূহ মুবারককে উসিলা বানাইয়া প্রার্থনা করিতেছি। সুতরাং বুঝা গেল, অদৃশ্য ও মৃতলোকের উসিলা দেওয়া আদৌ জায়েয নাই।

হুদায়বিয়ার বৃক্ষকে মূলোৎপাটিত করার ঘটনা

মদীনা শরীফ হইতে মক্কা শরীফ যাওয়ার পথে একটি গাছ ছিল, যেই গাছটির তলায় বসিয়া হুযুর (সঃ) মক্কার কুফ্ ফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামদের নিকট হইতে বয়েত নিয়াছিলেন। যেই বয়েতকে আল্ কুরআন 'বয়েত রেজওয়ান' নামে অভিহিত করিয়াছে। হযরত উমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফত কালে দেখিতে পাইলেন, লোকেরা ঐ গাছটি খুব বরকতময় গাছ মনে করিয়া উহার নিকট খুব বেশী যাতায়াত করিয়া থাকে এবং সেখানে যাইয়া নফল নামায ইত্যাদি পড়িয়া থাকে। ভবিষ্যতে মানুষের দ্বারা ঐ গাছটির পূজা-পার্বন হইবার এবং মানুষ শির্কের মধ্যে নিপতিত হইবার আশঙ্কায় তিনি গাছটির মূলোৎপাটন করিয়া দিলেন, যাহাতে শির্কের ফেৎনা উদ্ভাবিত হইতে না পারে।

ইহা ছাড়া হুযুর (সঃ) মক্কা-মদীনার মধ্যপথে কোন একস্থানে নামায পড়িয়াছিলেন, হযরত উমর (রাঃ) সেই স্থানে কিছু লোককে ফজরের নামাযের পর নামায পড়িতে দেখিয়া তাহাদিগকে ঐ স্থানে নামায পড়িতে নিষেধ করিয়া বলিলেন—

فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمِثْلِ ذٰلِكَ كَانُوْا يَتَّبِعُوْنَ آثَارَ الْأَنْبِيَاءِ.

অর্থাৎ, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকগণ এই কারণেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা নবী রাসূলগণের স্মরণিকা বস্তুগুলি এবং তাহাদের পদচিহ্ন অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিত।

অর্থাৎ, যে স্থানে নবী রাসূলগণের পদচিহ্নাবলী দেখিতে পাইত তাহারা উহাকে খুব বরকতময় ভাবিত এবং শ্রদ্ধনীয় ও সম্মানিত বস্তু বলিয়া মনে করিত।

পদচিহ্ন ও হস্ত অংকিত চিহ্নের হুকুম

উপরোক্ত কথা দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হইয়া গিয়াছে যে, বর্তমান যমানায় মানুষ যে নকশাকৃত পাদুকা এবং হস্তযুগলের চিহ্ন সম্বলিত পাথর কোন একটি স্থানে পুঁতিয়া বলিয়া থাকে যে, ইহা অমুক বুযর্গের হস্তের নকশা এবং ইহা অমুক বুযর্গের পাদুকা চিহ্ন। আর ইহাকে মানুষের জন্য একটি যিয়ারতের স্থান এবং নজর-নিয়াজ গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া নেয়, নিঃসন্দেহে এইসব কার্যাবলী নবী-রাসূলগণের সুন্নৎ এবং বুযর্গানে দ্বীনের তরীকার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এখন এই বস্তুগুলির যিয়ারত করা এবং উহার প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন করা সুন্নতের খেলাফ, তখন উহার নিকট দো'য়া করা, উহার সম্মুখে কাকুতি-মিনতি করিয়া রোদন করা এবং হাজত পূরণের জন্য প্রার্থনা করা ইহা এমন নাপাকী হারাম কাজ, যাহা পরকালীন নাজাত ও মুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহা ভাল করিয়া জানিয়া রাখ যে, শরাব পান করা হারাম, জুয়া খেলা হারাম, মূর্তি এবং বাতিল খোদাদের চিহ্নাবলী

সবকিছু নাপাক ও শয়তানের কাজ। সুতরাং ইহাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া চলো এবং অপবিত্রিতা হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাক। আশা করা যায় তোমরা সত্য পথের পথিক হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। (৬ ঃ ৯০)

তাফসীরকারকগণ লিখিয়াছেন, نَصَبَ - نَصَبَ - اَنْصَابُ শব্দের অথবা নَصَبَ শব্দের বহুবচন। نَصَبَ (নুসুব বা নাসব) এ সকল প্রত্যেকটি বস্তুকে বলা হইয়া থাকে, যাহা কোন স্থানে গাড়িয়া বা পুঁতিয়া রাখা হয় এবং আল্লাহ তা'আলাকে ব্যতীত উহার পূজা-পার্বন করা হয়— চাই উহা গাছ হউক বা পাথর হউক অথবা কবর হউক। এই আয়াতে আনসাব শব্দের এই ব্যাখ্যার সাথে মাজালেসুল আবরার কিতাবের লিখক তাহার কিতাবে 'কবরের নিকট নামাজ পড়া, উহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এবং চেরাগ প্রদীপ ও বাতি জ্বালান নিষেধ'— এই অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, উল্লেখিত বস্তুগুলি এবং উহা ব্যতীত সর্বপ্রথম বাতিল ইবাদতী কার্যাবলী ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলা ও মূলোৎপাটিত করিয়া উহার নাম-নিশানা মুছিয়া ফেলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অনস্বীকার্য কর্তব্য ও ফরজ। কেননা হযরত উমর (রাঃ) যখন এই খবর পাইলেন, যে বৃক্ষটির তলায় বসিয়া সাহাবায়ে কেরামগণের নিকট হইতে 'বয়েতে রেজওয়ান' নেওয়া হইয়াছে, মানুষ মাঝে মাঝে সেই গাছটির নিকট যাতায়াত করিয়া থাকে, তখন তিনি ঐ গাছটিকে কাটিয়া ফেলার জন্য লোক পাঠাইলেন। প্রেরিত লোকটি হযরত উমর (রাঃ)-এর নির্দেশ মত গাছটি কাটিয়া ফেলিয়াছিল। কোন এক বর্ণনা মতে পাওয়া যায় যে, ঐ বৃক্ষটিকে মূলোৎপাটিত করিয়া ফেলা হইয়াছিল। ইহা এইসব অবৈধ ও অনৈসলামী কার্যাবলীর উচ্ছেদকল্পেই করা হইয়াছিল। 'মাজালিসুল আব্‌রার' কিতাবের লেখক আরবী শব্দ قطعها -এর তরজমা করার পর লিখিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বৃক্ষটির তলায় বসিয়া সাহাবাগণ থেকে বয়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বয়েতের কথা আল্ কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ....الخ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমীনগণের প্রতি খুশি হইয়াছেন, যখন বৃক্ষতলায় বসিয়া আপনি তাহাদের নিকট হইতে বয়েত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেই গাছটি হযরত উমর (রাঃ) ভবিষ্যতে শির্কের পথ চিরতরে রুদ্ধ-করণের উদ্দেশ্যেই কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং এই বৃক্ষটি ব্যতীত যে সকল বস্তু মূর্তি ও প্রতিমার শ্রেণীভুক্ত যাহার কারণে বিরাট রকমের ফেৎনা ও বিদয়াত সৃষ্টি হইয়া রাহিয়াছে, এবং কঠিনতম বিপদ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার বেলায় শরিয়তের হুকুম কি হইতে পারে চিন্তা করুন। হযরত ওরম (রাঃ)-এর তুলনায় বিরাটকায় কীর্তিপূর্ণ কাজ হইল নবী করীম (সঃ) কর্তৃক 'মসজিদে দারার' ধ্বংস করিয়া ফেলার ঘটনাটি। তিনি শির্ক ও বিদ্য়াতের পথ রুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যেই ইহা করিয়াছিলেন।

পূজা-পার্বন হওয়ার সম্ভাবনায় কবরসমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলা ওয়াজিব

যে সকল মসজিদ ও সৌধ-এমারত ও শহীদ মন্দিরসমূহ কবরের উপর বা মৃতলোকের নামে নির্মাণ করা হইয়াছে, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া শির্ক ও বিদয়াতের ঢল প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে, উহার অনিষ্টতা মসজিদে দারারের তুলনায় কোন অংশে বেশি ছাড়া কম নয়। সুতরাং ধুলিস্যাৎ করিয়া ফেলা যে মুসলমানদের উপর ওয়াজিব তাহার শক্তিশালী জ্বলন্ত প্রমাণ নবী করীম (সঃ) কর্তৃক 'মসজিদে দারারকে' ধুলিস্যাৎ করিয়া দেওয়ার ঘটনাটি। ইসলাম উহাকে যমীনের সাথে মিশাইয়া দেওয়ারই নির্দেশ দিয়াছে। এমনিভাবে সেই সকল মিনার ও গম্বুজসমূহ আমাদের ধ্বংস করিয়া ফেলা উচিত, যাহা কবরের উপর বা শহীদ কিংবা মৃতলোকের স্মরণিকারূপে নির্মিত হইয়াছে। কেননা উহার ভিত্তিই রাখা হইয়াছে নবী করীম (সঃ)-এর নাফরমানী ও বিরোধিতার উপর। আর যে সকল বস্তুর ভিত্তি আল্লাহ্‌র রাসূলের অবাধ্যতা ও বিরোধিতার উপর রাখা হইয়াছে সেই সকল সৌধ-ইমারত, মিনার, গম্বুজ ও স্মরণিকাসমূহ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মিস্‌মার করিয়া ফেলা মসজিদে দারারের তুলনায় বহুলাংশে অপরিহার্য কর্তব্য। এই সকল ভিত্তিসমূহ মিটাইয়া ফেলিবার অপরিহার্যতার প্রমাণিক দলিল হইল, নবী করীম (সঃ)-এর কবরের উপর দালান-কোঠা ও মিনার গম্বুজ নির্মাণ করিতে কঠোর-ভাবে নিষেধ করিয়াছেন এবং যাহারা কবরের উপর এই ধরনের দালান-কোঠা ও মসজিদ নির্মাণ করিয়া থাকে, তাহাদের উপর তিনি অভিশাপ (লানত) দিয়াছেন। সুতরাং যেসব বস্তুর জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর নিষেধাজ্ঞার অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন এবং যাহার নির্মাণ-কর্তাদের উপর অভিশাপ

দিয়াছেন, তাহা ধূলিস্যাৎকরণ ও নাম-নিশানা মুছিয়া ফেলার কাজ ত্বরান্বিত করা ও প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া মুসলমানদের জন্য সামরিক কর্তব্য। এমনিভাবে সেইসব চেরাগ, প্রদীপ, ঝাড়বাতি ও ইলেক্ট্রিক বাতিসমূহ নস্যাৎ করিয়া উহার প্রচলন চিরতরে বন্ধ করিয়া দেওয়া জরুরী, যাহা কবরের উপর প্রজ্জ্বলিত করা হইয়া থাকে। কেননা, যাহারা কবরের উপর বাতি ও প্রদীপ জ্বালায় এবং কবরস্থানকে নানাবিধ আলোকসজ্জা দ্বারা আলোকিত করিয়া রাখে, তাহাদের উপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লানত দিয়াছেন। সুতরাং যে কাজের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লানত করিয়াছেন, সেই কাজ করা কবীরা গুনাহ। ইহার উপর নির্ভর করিয়াই উলামায়ে ইসলাম বলিয়াছেন, কবরের জন্য প্রদীপের তৈল ও মোমবাতি দেওয়ার মান্নত করা নাজায়েয ও হারাম। কেননা, এমনি মান্নত করার অর্থ হইল গুনাহ্র কাজের মান্নত করা, যাহা পূর্ণ করা আদৌ জায়েয নাই। বরং এই ধরনের মান্নত করা হইলে কসমের কাফ্ফারার ন্যায় কাফ্ফারা দেওয়া ওয়াজিব হইয়া যায়। আর এই ধরনের বস্তু কবরের জন্য ওয়াক্ফ করাও জায়েয নাই। কারণ, এই ধরনের ওয়াক্ফ শরীয়তসম্মত ও সহীহ্ হয় না। আর এই বস্তুগুলির স্থিতিশীলকরণ ও প্রচলন জারি রাখাও বৈধ নয়; আর হুযূর (সঃ)-এর এই বাণীটিও আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনি বলিয়াছেন— আমার পর যদি কাহারো নবী হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত, তবে সেই নবী হইতেন, হযরত উমর (রাঃ) পূর্ববর্তী উম্মতগণ এবং হযরত নবী করীম (সঃ)-এর পর উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে প্রচলিত শিরক ও বিদয়াতের ভিত্তি ও রুসুম-রেওয়াজসমূহ হযরত উমর (রাঃ)-এর কথা ও কাজের দ্বারা এমনিভাবে পয়মাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাওহীদবাদী মুসলমানদের অন্তরে এখন আর এই ফেৎনা-ফাসাদ ও শিরক বিদয়াতের বিন্দু-বিসর্গ পরিমাণ তত্ত্ব গোপন নাই। ইতিপূর্বে উল্লেখকৃত হযরত উমর (রাঃ)-এর কার্যাবলী দ্বারা আমরা এই পরিচয় পাইয়া থাকি।

হযরত উমর (রাঃ) কর্তৃক শিরক ও বিদয়াত নির্মূলকরণের অন্যান্য কার্যাবলী

সুতীক্ষ্ণ তরবারীর চাইতে যে বস্তুটি আরো অধিক তেজশক্তি নিয়া কবর পূজার ফেৎনাকে কাটিয়া খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলে, তাহা হইল হযরত উমর (রাঃ)-এর সেই কর্মময় ইতিহাসটি, যাহা এই দুনিয়ায় আল-কুরআনের পর বিশুদ্ধতার আসনে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল-বুখারীতে এবং ইমাম মুসলিম নিশাপুরীর মুসলিম শরীফে আস বিন রবীয়ার উদ্ধৃতি উল্লেখ রহিয়াছে। আস বিন রবিয়াকে কতিপয় মোহাদ্দিস সাহাবিগণের মধ্যে গণ্য করেন। সেই রবিয়াহ বিন আস (রাঃ) বলেন— আমি হযরত উমর (রাঃ)-কে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার সময় এই বলিতে শুনিয়াছি যে— 'হে হাজরে আসওয়াদ! আমি নিশ্চিতরূপে জানি যে, তুমি মানুষের কল্যাণও করিতে পার না এবং ক্ষতি করার ক্ষমতাও তোমার নাই। আমি যদি তোমাকে নবী করীম (সঃ) কর্তৃক চুম্বিত হইতে না দেখিতাম, তবে আমি তোমাকে কখনোই চুম্বন করিতাম না।' জান্নাত হইতে অবতীর্ণ এবং আল্লাহ্র ঘরের প্রাচীরের মধ্যে প্রোথিত 'হাজরে আসওয়াদের' (কালো পাথরখানার) অবস্থা যখন এই, তখন গাছপালা, বৃক্ষলতা, পাথর, কবর, মাজার, রওজা ইত্যাদির যে কি মর্যাদা থাকিতে পারে, তাহাই আমরা বুঝিয়া কুলাইতে পারিতেছি না। হযরত উমর (রাঃ)-এর অগ্নিঝরা হেদায়াতী কালাম দ্বারা পরিষ্কাররূপে ইহা প্রতিভাত হয় যে, হাজরে আসওয়াদের চুম্বনকে কবর, মাজার ও রওজাকে চুম্বন ও স্পর্শ করার দলিলরূপে গ্রহণ করা কিয়াসের পরিপন্থী ও অযৌক্তিক বৈ কিছুই নয়। কেননা, শুধু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুকরণ কল্পে পাথরের মধ্যে একমাত্র 'হাজরে আসওয়াদ'কেই স্পর্শ করার বৈধতা বজায় রাখা হইয়াছে। হযরত উমর (রাঃ) এর উল্লেখিত কথার মধ্যে আর যে নিগূঢ় তত্ত্বটি খুঁজিয়া পাওয়া যায় তাহা হইল এই যে, যদি কোন লোক 'হাজরে আসওয়াদকেই' কল্যাণকারক ও ক্ষতিকারক ভাবিয়া ভয়ভীতি ও আশা নিয়া চুম্বন করে এবং উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তবে এখানে শিরক হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে। কেননা আল্লাহ তা'আলার হুকুম, ইচ্ছা ও মর্জি ব্যতীত কোন বস্তুই কল্যাণকারক ও ক্ষতিকারক হইতে পারে না। জলীল কদর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়া বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে যে, তিনি বলেন— আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুইটি রুকন অর্থাৎ রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদ ব্যতীত বাইতুল্লাহ শরীফের হক মোহাদ্দিসে দেহলবী (রঃ) শরহে মিশকাত শরীফ কিতাবে লিখিয়াছেন যে, 'হাজরে আস্ওয়াদকে' চুম্বন করা উচিত কিন্তু রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করার প্রমাণই বর্তমান রহিয়াছে। জমহুর উলামায়ে কেরামগণেরও এই অভিমত। অবশ্য রুকনে শামীর চুম্বন সম্পর্কে উলামায়ে কেরামগণের মধ্যে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী স্বীয় কিতাবে যহর বিন আরবী তাবেয়ীর থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-এর নিকট হাজরে আস্ওয়াদকে চুম্বন ও স্পর্শকরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাব দিলেন— আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক হাজরে আস্ওয়াদকে চুম্বন ও স্পর্শ হইতে দেখিয়াছি। এই হাদীস দ্বারা পরিষ্কাররূপে ইহাই বুঝা যায়, তৌহীদবাদী মুসলমানগণ সাহাবা ও তাবেয়ীনদের যমানায় তৌহিদের আকীদায় এমনি পাকাপোক্ত ছিলেন যে, তাহারা শিরকে খফী অর্থাৎ আগোচরে ও অপ্রকাশ্যের শির্ক হইতে এমনিভাবে দূরে থাকিতেন যে, হাজরে আস্ওয়াদের ন্যায় অন্যান্য বস্তুর বেলায় সাহাবায় কেরামও সমসাময়িককালের আলেমগণের নিকট উহাকে চুম্বন করিবে, না স্পর্শ করিবে তাহা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া নিতেন। যখন সাহাবাগণ এই কাজকে নবী করীম (সঃ)-এর সুন্নাত বলিয়া অভিহিত করিতেন, তখনই তাহাদের নিকট এই কাজ গ্রহণীয় হইত। সুবাহানাল্লাহ! কোথায় তাহারা কোথায় আমরা।

বর্তমান যুগের অবস্থা খুবই দুঃখজনক

বর্তমান যুগের মুসলমানাদের অবস্থার কথা চিন্তা করিলে বাস্তবিকই অন্তরে করুণার উদ্রেক না হইয়া পারে না। তাহারা ইসলামের সরল-সহজ পথ ছাড়িয়া দিয়া গোমরাহীর বাঁকা পথে চলিতেছে। যে সকল স্থান ও পাথরসমূহ বুযুর্গ লোকদের সাথে সংশ্লিষ্ট উহার প্রতি তাহারা শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাকরীম করিতে লাগিয়া যায়। শির্কীর মধ্যে নিপতিত হইতে তাহাদের মনে আদৌ কোনরূপ ভয়-ভীতির সঞ্চার হয় না। ঐ সকল স্থান ও পাথরসমূহকে নিজদের কিবলা এবং মাকসুদ ও মনের বাসনা পূর্ণ হইবার মূল উৎস মনে করিয়া দূর-দূরান্ত হইতে বহু দুঃখ বরণ করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। আর শিরনী, মিষ্টান্ন এবং ফুল ও সুগন্ধি ছড়াইয়া বুযুর্গানদের আত্মার নৈকট্য লাভ করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। এমনিভাবে পীর বুযুর্গানদের তাসবীহ ও লাঠিকেও তাহারা পীরের স্থলাভিষিক্ত ভাবিয়া থাকে।

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের লাঠি খুব মশহুর ছিল। তিনি এই লাঠিখানা হযরত শোয়াইব আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে পাইয়াছিলেন। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) কখনো তাহার এই লাঠি সম্পর্কে যাহা কিছু জানা যায়, তাহা হযরত মূসা (আঃ)-এর জবানীতে আল-কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ—

هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন— হে মূসা! তোমার হাতে উহা কি? হযরত মূসা (আঃ) জাবাব দিলেন— আমার হাতে একখানা লাঠি। আমি ইহার উপর ভর করিয়া দাঁড়াই এবং ইহা দ্বারা আমার কবরীর জন্য গাছ হইতে পাতা পাড়িয়া থাকি। ইহা ব্যতীত আরো বহু কাজ ইহা দ্বারা করিয়া থাকি। (২০ ঃ ১৮)

বর্তমান যমানায় যদি পীরের লাঠি, জুতা, টুপি, জুব্বা, পাগড়ি, তাস্বীহ ইত্যাদি কোন মুরীদ পাইয়া যায়, তবে উহা কোন উঁচু স্থানে রাখিয়া দিয়া সেই স্থানকে যিয়ারতের স্থানে পরিণত করিয়া ফেলে, এই স্থানটির নাম রাখে দরগাহ শরীফ। সুতরাং লোকেরা বলিয়া থাকে যে, আমি অমুক বুযুর্গের কবল হইতে এমন ফায়েজ লাভ করিয়াছি যাহা বর্তমান যুগের জীবিত লোকদের থেকে পাওয়া যায় না। আবার কোন কোন লোক বলিয়া থাকে যে, আমি যখন অমুক বুযুর্গের কোর্তা পরিধান করি, তখন আমার মধ্যে একটি ভিন্ন ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হইয়া যায়, যাহা সাধারণতঃ সৃষ্টি হয় না। আবার কতিপয় লোক এই সকল বস্তুগুলির প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতে গিয়া, উহা আদৌ ব্যবহারই করে না। বরং অধিকাংশ লোক ঐ সকল বস্তুতে আতর ও সুগন্ধি লাগাইয়া খুব হেফাজতের সাথে রাখিয়া দেয় এবং বৎসরের মধ্যে একটি দিন নির্দিষ্ট করিয়া উহা জনসাধারণের প্রদর্শনকল্পে বাহির করে। আর এইসব জিনিসের প্রতি অশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া এবং উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া বুযুর্গদের রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি লাভ করার আশা পোষণ করিয়া খুব আদব এহতেরাম ও একাগ্রতার সাথে ইহার সম্মুখে বসিয়া থাকে।

বুযুর্গানে দ্বীনের পরিত্যক্ত বস্তুগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক্রমান্বয়ে শির্‌কীতে পরিণত হয়

বুযুর্গানে দ্বীনের পরিত্যক্ত এবং তাহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুগুলির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রথমবারে বা একই সময় কুফর ও শিরকের কারণে পরিণত হয় না। বরং এই আরোগ্যহীন রোগটি ক্রমান্বয়ে নিজ সীমা লঙ্ঘন করিয়া মানুষের মধ্যে নিফাকের রোগ জন্ম দিয়া থাকে। আর এই নিফাক এমন পর্যায়ে গিয়া পৌছে যে, উলামায় কেরাম যখন এই ধরনের ভক্তি জ্ঞাপনকারীদিগকে এই কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলে, তখন তাহারা বিভিন্ন প্রকার ওজর-আপত্তি টাল-বাহানা ও বুযূর্গদের প্রতি মহব্বত পোষণের সূত্র তালাস করিয়া বলিতে থাকে যে, আমাদের থেকে এই ধরনের কথা মহব্বতের জোসে বাহির হয়। আর যখন এই রোগ সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়, তখন এই লোকেরা প্রকাশ্যরূপে শির্‌কের জালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। আর যাহারা এই কাজে বাধা প্রদান করে তাহাদের সম্পর্কে উহারা প্রকাশ্যে এই কথা বলিয়া বেড়ায় যে, ইহারা আওলিয়াগণের বিখ্যাত মত, পথ এবং তাহাদের কেরামতিকে অস্বীকার করে, যেমন— ইয়াহূদীগণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে হযরত ওযায়ের (আঃ)-এর অস্বীকারকারী ও বিরোধী এবং মুসলমানগণকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরোধী ও শত্রু বলিয়া থাকে। এই পথভ্রষ্ট লোকদের নিকট হযরত ঈসা (আঃ) হযরত ওযায়ের (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলিয়া মানিত না। আর মুসলমানগণও হযরত ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়া স্বীকার করে না। মুদ্দাকথা হইল, প্রত্যেকটি পথভ্রষ্ট গোমরাহ জামায়াত হেদায়েত প্রাপ্ত জামায়াতকে অসম্মানিত ও অপমানিত করিতে ইচ্ছুক। আর এই অপমান করার জন্যই মানুষের মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই কথা জনসমাজে বলিয়া বেড়াইতে থাকে যে, এই জামায়তটি অমুক বুযুর্গের বিরোধী ও শত্রু। তাহার কথা ও মত পথকে ইহারা স্বীকার করে না। যেমন মক্কার মুশ্‌রিকগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণকে সাবী অর্থাৎ বে-দ্বীন এবং মিল্লাতে ইব্রাহীমের বিরোধী ও শত্রু বলিয়া আখ্যায়িত করিত। সুতরাং এমন ফেৎনা-ফাসাদের যমানায় জ্ঞানী লোকদের জন্য যে পথ নিরাপদ ও সরল সোজা সেই পথ গ্রহণ করা কর্তব্য। আর যে পথে শির্‌ক ও নিফাকের আশঙ্কা থাকে সেই পথকে অবশ্যই পরিহার করিয়া চলা উচিত, যেমন

আম্বীয়ায়ে কেরাম এবং তাহাদের সঙ্গী-সাথীগণের কর্ম চরিত্র ছিল। আল-কুরআন তাহাদের জীবনের কর্ম চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

فَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَاتَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, (হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম বলেন) যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার করিয়া থাক তাহাদিগকে আমি কিরূপে ভয় করিব? অথচ তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করিয়া থাক যাহার বৈধতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট কোন সনদ-দলিল নাযিল করেন নাই। এই জামায়াতদ্বয়ের মধ্যে নিরাপদের দিক দিয়া কাহারা বেশী হক্ক ও সত্যাশ্রয়ী তাহা তোমরা বলিতে পার কি? যদি তোমরা অবগত থাক তবে বলিয়া দাও তো? (সূরা আল্ আনয়া'ম-১৫)

মাকামে ইবরাহীমের মহত্ব

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে পাথরের উপর দাণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই পাথরের বুযূর্গী হইল এই যে, দালান গাঁথিয়া যতই উপরের দিকে উঠিতেন ঐ পাথরখানাও দালানের উচ্চতার সাথে সাথে উপরের দিকে ফুলিয়া বড় হইয়া যাইত। এমনকি বাইতুল্লাহ্‌র কাজ সমাধা হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় আর কোন পাথরের উপর দণ্ডয়মান হওয়ার প্রয়োজন তাঁহার পড়ে নাই। ঐ সময় পাথরের উপর হযরত ইবরাহীম গিয়াছিল। যাহা হাদীছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, রুকন এবং মাকামে ইবরাহীমের পাথরদ্বয় জান্নাতের ইয়াকুত পাথরের দুইটি পাথরখণ্ড। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নূরকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। যদি ইহা না করা হইত, তবে মাশরেক হইতে মাগরিবের মধ্যবর্তী স্থান নূরের আলোক আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। আল্লাহ তা'আলা কালামে মজীদে এই পাথরের নাম রাখিয়াছেন মাকামে ইবরাহীম এবং এই স্থানে নামায পড়িবার জন্য তিনি হুকুমও দিয়াছেন। এরশাদ হইতেছে—

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى.

অর্থাৎ, মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাইয়া নাও।

সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই স্থানে নামায আদায় করিতেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণ হইতে এই স্থানকে অর্থাৎ ঐ পাথরকে চুম্বন করা এবং স্পর্শ করার কোনই প্রমাণ উল্লেখ নাই। বরং সাহাবায়ে কেরামগণ হইতে এই ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ ও অস্বীকারোক্তিই বর্তমান পাওয়া যায়। যেমন ইবনে আবু শায়বা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করিয়াছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) একদল লোককে মাকামে ইবরাহীমকে স্পর্শ করিতে দেখিয়া বলিলেন— আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে এই স্থান স্পর্শ করিতে নির্দেশ দেন নাই। বরং এই স্থানে তিনি নামায পড়ার জন্য হুকুম দিয়াছেন। 'মাজালিসুল আব্‌রার' কিতাবের লেখকও তাহার কিতাবে এই কথা বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যে স্থানে নামায পড়ার হুকুম দিয়াছেন, সেই স্থানকে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ চুম্বন বা স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং আল-কুরআনের উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আযরকী (রঃ) কাতাদাহ (রাঃ)-এর এই মত উল্লেখ করিয়াছেন, যে স্থানে মানুষকে নামায পড়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থানকে চুম্বন করা বা স্পর্শ করার অনুমতি তাহাদের জন্য দেওয়া হয় নাই বরং এ ব্যাপারে সমগ্র ইমামগণ ও উলামায়ে কেরাম একমত যে, হাজরে আস্‌ওয়াদ ব্যতীত বর্তমানে কোন বস্তুকে চুম্বন বা স্পর্শ করা জায়েয নাই। অবশ্য রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করার বৈধতা বর্তমান রহিয়াছে কিন্তু চুম্বন করার বৈধতা আদৌ কোথায়ও নাই।

শয়তানের চক্রান্ত

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, শয়তান প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক স্থানে প্রতমতঃ কোন বুযুর্গের কবরকে ভক্তিশ্রদ্ধা ও তাজীম তাকরীমের জন্য নির্বাচন করিয়া নেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়া পূজা-পার্বনের নিমিত্ত ঐ কবরকে একটি মূর্তি বা প্রতিমা-রূপে রূপান্তরিত করিয়া ফেলে। ইহার পর সে নিজ বন্ধু-বান্ধব ও দোস্ত ইয়ারগণের মধ্যে এই কথা প্রপাগাণ্ডা করিয়া বেড়াইতে থাকে যে, যাহারা এই কবরের পূজা-পার্বন এবং উহার কাছে মেলা ও ওরস মিলাইতে নিষেধ করে, তাহারা আসলে এই বুযুর্গকে অসম্মান করিয়া থাকে এবং তাহার প্রাপ্য হক্ককে নস্যাৎ করিয়া দেয়। সুতরাং শয়তানের এহেন প্রপাগাণ্ডা ও প্ররোচনায় উদ্ধুদ্ধ হইয়া সেই যমানার অজ্ঞান ও দ্বীনী ইল্‌মহীন লোকেরা এই

ধরনের খারাপ ও গোনাহর কাজে বাঁধা প্রদানকারীগণকে হত্যা করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়। আর তাহাদের উপর কুফরীর ফত্ওয়া জারি করিয়া দেয় এবং নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট ও জ্বালা-নির্যাতন দেওয়ার জন্য কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করে না। এখানে বাঁধা প্রদানকারী বেচারাদের অপরাধ হইল এই যে, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূল যে কাজ করিতে হুকুম দিয়াছেন, তাহারা মানুষদিগকে সেই কাজ করার জন্য উদ্ধুদ্ধ করেন। আর যে কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই কাজ হইতে মানুষকে বিরত রাখার জন্য নানাবিধ চেষ্টা তদবির চালান। আর তাহারা মানুষকে এই কথা লিখিয়া জানাইয়া দেয় যে, কবর পূজারকগণ যে কারণে ফেৎনা ও গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে কারণ হইল নবী করীম (সঃ)-এর আগমন আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে উহাদের অনবহিত হইয়া থাকা। আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সঃ)-কে তাওহীদের প্রসার এবং শির্‌কের মূলোৎপাটন কল্পেই এই দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং শয়তান যখন মানুষকে কবর পূজর জন্য আহ্বান জানায়, তখন কম ইল্‌মসম্পন্ন লোকগণ নিজেদের ইল্‌মের স্বল্পতা ও বুঝশক্তির দীনতা হীনতার কারণে তাহার আহ্বানকে বাতিল ও প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। বরং তাহারা এই আহ্বানে সাড়া দিয়া বসে। আর দ্বীনি ইল্‌মের পরিধি যাহাদের বিস্তৃত, তাহারা এই গোমরাহীর আহ্বান থেকে নিজদিগকে নিরাপদ রাখিয়া সমাজ ও জাতিকে উহা হইতে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা তদবীর চালাইয়া যায়।

মিথ্যা হাদীসের প্রপাগাণ্ডা

কবর পূজারকগণ পথভ্রষ্ট হইবার আর একটি কারণ হইল যে, তাহারা মূর্তি পূজার চরিত্র গ্রহণ করিয়া নিজেদের এই কুকর্মের সমর্থনে বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা হাদীস বানাইয়া নেয় এবং অবুঝ সরলপ্রাণ জনসাধারণকে ইহা দ্বারা ধোকা দিয়া আল্লাহ্‌র পথ হইতে দূরে সরাইয়া ফেলে। তাহাদের মিথ্যা হাদীসসমূহের মধ্যে কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করিতেছি—

إِذْ تَحَيَّرْتُمْ فِى الْأُمُوْرِ فَاسْتَعِيْنُوْا بِأَهْلِ الْقُبُوْرِ.

অর্থাৎ, তোমরা যখন কোন ব্যাপারে পেরেশান ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়, তখন কবরবাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর।

إِذَا أَعْيَتْكُمُ الْأُمُوْرُ فَعَلَيْكُمْ بِأَصْحَابِ الْقُبُوْرِ.

অর্থাৎ, যখন তোমরা কোন বিপদের মধ্যে নিপতিত হইয়া পড়, তখন কবরবাসিগণকে ধরা তোমাদের কর্তব্য।

আর একটি মিথ্যা হাদীস হইল এই—

لَوْ حَسَّنَ اَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ.

অর্থাৎ, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ পাথরের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করে, তবে পাথরও তাহাকে উপকার ও লাভবান করিতে পারে।

এই ধরনের দ্বীন ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী মনগড়া হাদীস কবর পূজারীরা নিজেদের তরফ হইতে বানাইয়া জনসাধরণের মধ্যে প্রচার করিয়া বেড়াইতে থাকে।

এই ধরনের বহু হাদীসই জনসাধারণের মধ্যে মশহুর হইয়া আছে। অথচ এই হতভাগারা এত বড় মোটা কথাটা উপলব্ধি করে না যে, আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সঃ)-কে পাথর ও গাছ-পালার উপর কু-ধারণা ঘোষণাকারীদেরকে উৎখাত ও মূলোৎপাটন করার জন্যই প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং নবী করীম (সঃ) সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া নিজ উম্মতগণকে কবর পূজার ফেৎনা হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। (আর এই জায়গায় হতভাগারা ইহা নিয়াই আসর জমাইবার জন্য প্রচেষ্টা চালাইতেছে)

কবর পূজারকদের মিথ্যা কাহিনী

কবর পূজারকগণ নিজেদের সমর্থনে যে সকল মিথ্যা কেচ্ছা কাহিনী ও রূপকথা বলিয়া মানুষকে গোমরাহ করে উহার ভিতর একটি হইল এই যে, তাহারা বলে— অমুক, ব্যক্তি কঠিন বিপদ ও হয়রানী-পেরেশানীর মধ্যে নিপতিত ছিল। সে যখন অমুক বুযুর্গের কবরের নিকট গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন তাহার বিপদ-আপদ ও হয়রানী-পেরেশানী দূর হইয়া সে মুক্তি পাইয়া গেল। আর অমুক ব্যক্তির উপর আসমানী বালা নাযিল ইহলে সে ঐ কবরবাসীকে ডাকিলে পর কবরবাসী তাহার বালা দূর করিয়া দিল। আর অমুক ব্যক্তি নিজের কোন কাজ ও হাজত সম্পর্কে কবরের নিকট গিয়া দো'য়া করিলে পর তাহার হাজত পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। যেমন বিগত বৎসর টেনডরওয়ালা ইয়ারের নিকটে একটি কবর আবিষ্কৃত হইলে পর সেখানে বিকলাঙ্গ, আতুর, খোড়া লোকেরা আরোগ্য লাভ করার জন্য যাইত। আল্লাহ তা'আলা ইহা হইতে আমাদিগকে দূরে রাখুন।

এই হতভাগাদের বুদ্ধি-জ্ঞানের উপর আবার পড়িয়া গিয়াছে এবং শয়তান উহাদিগকে তাহার জালে এমনিভাবে জড়াইয়া বন্দী করিয়া নিয়াছে যে, মসজিদে আসিয়া আল্লাহ তা'য়ালার নিকট চাওয়ার ক্ষমতা উহাদের কাহারো হয় না। ঘরের দরওয়াজার নিকট মসজিদ থাকা সত্ত্বেও সেখানে গিয়া দো'য়া করার কষ্টটুকু স্বীকার করিতে পারে না; কিন্তু মাইলের পর মাইল হাটিয়া কবরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইতে কুণ্ঠাবোধ করে না। উহাদের প্রভু হইল কবরে সমাহিত ব্যক্তি এবং হাদী ও পথ প্রদর্শক হইল কবরের খাদেম ও পূজারকগণ। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের সাথে উহাদের কি সম্পর্ক বলিতে পার? কবরের এই সকল খাদেম ও চেলা-চামুণ্ডাগণের নিকট এই ধরনের বহু আশ্চর্য কাহিনী ও ঘটনা শুনা যায়, যাহা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। মোটকথা আল্লাহ তা'আলার মাখলুকগণের মধ্যে এই কবর পূজারকগণ হইল মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ ও প্রতারণার দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ। উহার জীবিত মৃত সকলের বেলায় মিথ্যার বেসাতী করিয়া থাকে। যেহেতু মানুষের স্বভাব তাহার হাজত পূরণ এবং ক্ষতি দূর হওয়ার দিকে ঝোঁক প্রবণ হয়। বিশেষ করিয়া যে সকল লোক বিপদ-আপদ ও মসিবতের মধ্যে গ্রেফতার হইয়া দিশাহারা হইয়া পড়ে তাহারা ইহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য কোন না কোন অছিলা ও হেতুর অনুসন্ধান অবশ্যই করে। এমনি উহা যদি খারাপ ও দুষ্ট প্রবণও হয় তুবুও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠবোধ করে না। সুতরাং যখন শুনিতে পায় যে, অমুক কবরটি (বা দরগাহ ও মাজারটি) হাজত পূরণ হবার বেলায় খুবই ফলদায়ক ও পরীক্ষিত, তখন তাহারা ঐ দিকেই দৌড়াইতে থাকে এবং উহার নিকট গিয়া ভাঙ্গা মন নিয়া খুব কাকুতি-মিনতি ও বিনয় নম্রতার সাথে দোয়া করিতে থাকে। তখন তাহাদের দো'য়াও খুব মর্মস্পর্শী হয়। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের কাকুতি-মিনতি ও মর্মস্পর্শী প্রার্থনা শুনিয়া রহমতের দৃষ্টি ফেলিয়া তাহাদের দো'য়া কবুল করিয়া নেন এবং অভাব-অভিযোগ ও হাজত পূরণ করিয়া দেন। এই লোকের যদি এমনি বিনয়ীভাবে কাকুতি-মিনতি করিয়া একাগ্রচিত্তে হাটে-বাজারে যেখানে-সেখানে ও হাম্মামখানায় বসিয়াও প্রার্থনা করিত; তবে আল্লাহ তা'আলা সেখানেও তাহাদের দো'য়া কবুল করিয়া দিতেন। সুতরাং এক্ষেত্রে কবরের প্রভাব ও কেরামতী মনে করা নাদানী ও জাহেলীপনা বৈ কিছুই নয়। এই অজ্ঞানীরা ইহা উপলব্ধি করে না যে, আল্লাহ তা'আলা বিপদে দিশেহারা ব্যক্তির দো'য়া সর্বাবস্থায়ই কবুল করিয়া থাকেন। সে যদি কাফেরও হয়, তবু তাহার দোয়া তিনি কবুল করিয়া নেন। কাহারো দো'য়া

কবুল হইবার জন্য আল্লাহ তা'আলার খুশি ও মহব্বত অর্জন করা অপরিহার্য শক্তি নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা মুমিন, কাফের ও ফাসেক সকলের দো'য়াই কবুল করেন। সুতরাং এমতাবস্থায় ইহা কবরের প্রভাবে ও কেরামতী মনে করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রহমে-করমে আমাদের জন্য সেই দো'য়া ও কাজ সহজ করিয়া দিন যাহা তাঁহার খুশি ও রেজামন্দী মাফিক হয়, আমীন।

কবর ধ্বংস করা সম্পর্কে হজরত আলী (রাঃ)-এর ফরমান

ইমাম মুসলিম নিশাপুরী স্বীয় বিশ্ববিখ্যাত কিতাব আবুল হাইয়্যাজ আসাদী হইতে একটি হাদীস নকল করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে আবুল হাইয়্যাজ আসাদী (রাঃ) বলেন, আমাকে হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন— এখন কি তোমাকে সেই কাজের জন্য প্রেরণ করিব না, যে কাজের জন্য রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন? তিনি আমাকে কোন জীব-জন্তুর ছবি ও আকৃতিকে যেখানেই দেখি না কেন, উহা নস্যাৎ করিয়া ফেলার নিমিত্ত এবং যেখানেই উঁচু কবর পরিলক্ষিত হয়, উহা মাটির সাথে মিশাইয়া দেওয়ার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।' আর আবুল হাইয়্যাজ আসাদী (রাঃ) হযরত জাবের (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলিয়াছেন যে— নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরকে পাকা বানাইতে, উহার উপর দালান-কোঠা (গম্বুজ, মিনার) তৈয়ার করিতে এবং কবরের উপর বসিতে নিষেধ করিয়াছেন। শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দীসে দেহলবী (রঃ) মিশকাত শরীফের অনুবাদ কিতাবে ان يقعد عليه -এর তরজমা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কবরের উপর বসিতে এই জন্য নিষেধ করিয়াছেন, ইহা মুমিনগণের ইজ্জত-সম্মান ও আদব-এহতেরামের পরিপন্থী। আর কতিপয় ব্যাখ্যাকারক বলেন যে, এই নিষেধাজ্ঞা কাজ্বায়ে হাজতের জন্য অর্থাৎ পায়খানা-প্রস্রাবের জন্য বসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইমাম ইব্নে তাইমিয়ার ফরমান

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার প্রিয় শিষ্য হাফেজ ইবনে কাইয়্যুম (রঃ) 'আগাছাহ' কিতাবে কবর পূজার ফেৎনা সম্পর্কে তাহার ওস্তাদের যে উক্তিটি উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই— 'তিনি বলেন, যেই কারণ ও রোগের জন্য শরীয়ত

কবরকে সিজদার স্থান মনোনীত করিতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছে তাহা এমন খারাপ ও মারাত্মক রোগ যাহার দরুন বহু লোক প্রকাশ্যে শির্কী এবং তাহার চাইতে কিছুটা নিম্নতম গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত রহিয়াছে। কেননা কোন বুযুর্গের কবরের তাজীম ও সম্মানের আকীদা দৃঢ়ভাবে অন্তরে পোষণ করা ইহা মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি ও সকলের উপর দুষ্ট প্রভাব বিস্তারকরণের ক্ষেত্রে বৃক্ষ ও পাথরকে শির্ক করার এবং উহার পূজাপার্বনের তুলনায় অধিক বিষক্রিয়াশীল ও মারাত্মক। এই জন্যই তোমরা বহু লোককে দেখিতে পাইবে যে, তাহারা কবরের সম্মুখে যাইয়া এমনভাবে আহাজারী, কাকুতি-মিনতি এবং আন্তরিক অনুরাগ নিয়া বিনয় ও নম্রতার সাথে ইবাদত করে যে, আল্লাহ্‌র ঘর এবং তাহাজ্জুদ নামাযের সময়ও এমনিভাবে তাহারা করে না। আর কবরের নিকট নামায পড়া, সেখানে গিয়া দো'য়া প্রার্থনা করাকে বরকতময় এবং এমন আশা পোষণ করিয়া থাকে যে, মসজিদের বেলায় এমন বরকত ও আশা পোষণ করে না। সুতরাং এই মহাফাসাদের মূলোচ্ছেদকরণের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের কবরস্থানে নামায পড়িতে কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়াছেন। এমনকি নামাযের মধ্যে এই কবর ও গম্বুজের বরকতের কথা নামাযীর মনে বিন্দু-বিসর্গ পরিমাণও যদি জাগরিত না হয়, তবুও নয়। যেমন— রাসূলে করীম (সঃ) সূর্যোদয়ের সময়, ঠিক দুপুরের সময় এবং সূর্য অস্তমিত হইবার সময় নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা এই সময়গুলি হইতেছে মুশরিকগণের সূর্যকে পূজা করার সময়। সুতরাং কোন ব্যক্তি বরকত লাভ করার আশায় অথবা অধিক বরকত লাভের নিয়তে কবরের নিকট গিয়া নামায পড়িলে তাহার এই নামায নিঃসন্দেহে কবর পূজার মধ্যে সামিল হইবে, যাহা নিঃসন্দেহে বে-দ্বীন, কুফরী ও আল্লাহ্‌র রাসূলের নীতির প্রকাশ্য পরিপন্থী কাজ। মূলকথা হইল, আল্লাহ তা'আলা কস্মিনকালেও ইহার অনুমতি প্রদান করেন নাই।

'মাজালেসুল আব্‌রার' কিতাবের ভাষ্য

'মাজালেসুল আবরার' কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কবর পূজার এই বিদয়াতকে বন্ধ করার জন্য কাফেরদের স্থানে উপস্থিত হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিলেন, তখন সেই সব ফেৎনা-ফাসাদের অবস্থা কি হইবে যাহা শির্কীর উপকরণ ও কারণে পরিণত হয়। অনেক লোক এই কবর পূজার বিদয়াতের আশ্রয় গ্রহণের ফলে বরবাদ

হইয়া গিয়াছে। তাহারা গায়রুল্লাহকে ইয়া মাওলা বলিয়া ডাকিয়া থাকে এবং কবরবাসীর নিকট নিজেদের মনস্কামনা ও হাজত পূরণের জন্য আবেদন জানাইয়া থাকে। আর তাহারা মসজিদের চেয়ে আম্বীয়ায়ে কেরাম ও আওলিয়ায়ে কেরামগণের কবর ও মাজারের নিকট নামায পড়া, ইবাদত করাকে উত্তম বলিয়া আকীদা পোষণ করে। হাফেজ ইবনে কাইয়্যুম (রঃ) স্বীয় 'আগাছাহ' কিতাবে লিখিয়াছেন, বর্তমান যুগের মুসলমানদের কথা ও কাজকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত এবং সাহাবা ও তাবে'য়ীগণের কথা ও কাজের (আছার) সাথে যদি কেহ তুলনা করিতে চায়, তবে কোন ক্ষেত্রেই সমতা ও অনুগামিতা পরিলক্ষিত হইবে না। কেন না উভয়ের মধ্যে বিরোধিতা ও বৈশাদৃশ্য প্রকাশ্যরূপে দেদীপ্যমান। যেমন— নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্বিয়ায়ে কেরাম আওলীয়াগণের কবরের নিকট নামায পড়িতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুগের মুসলমানগণ খুব জওক-শওক ও আন্তরিক অনুরাগের সাথে কবর ও মাজারের নিকট গিয়া নামায পড়ে। অবশ্য বৎসরে একবার মসজিদে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য তাহাদের হয় না। এমনিভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর ও মাজারের উপর মসজিদ বানাইতেও নিষেধ করিয়াছেন। আর ইহারা কবরের উপর সমজিদ নির্মাণ করিয়া কবরবাসীদের নাম অনুযায়ী উহার নামকরণ করিয়া দরগাহ শরীফ নাম দিয়া থাকে। ইহা ছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর ও মাজারে চেরাগ ও বাতি জ্বালাইতেও নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু এই লোকেরা কবরের উপর মোমবাতি, প্রদীপ ঝাড়বাতী ও ইলেকট্রিক বাতি জ্বালাইয়া কবরস্থানকে আকর্ষণীয় করিয়া তোলে। এমন কি কবরস্থান ও মাজার শরীফের খরচ ও ব্যয় বহনের নিমিত্ত নিজেদের বিষয়-সম্পত্তিও ওয়াক্‌ফ করিয়া দেয়। ইহা ছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরকে পাকাপোক্ত করিয়া বানাইতেও নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহারা কবরের উপর গম্বুজ, মিনার, স্মরণিকা ও কোব্বা বানাইয়া থাকে। আর নবী করীম (সঃ) কবর ও রওজার উপর সাধারণভাবে দালান-কোঠা নির্মাণ করিতে এবং উহার উপর কিছু লিখিতে বা ফলক লাগাইতেও নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের লোকেরা কবরের উপর বড় বড় দালান-কোঠা নির্মাণ করিয়া উহার উপায় আল-কুরআনের আয়াত লিখিয়া দেয়। আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উপর উহা হইতে বাহিরকৃত মাটি ব্যতীত অন্য কোন অধিক মাটি দিতেও নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু

এই লোকেরা অধিক মাটি তো দূরের কথা ইট, পাথর, চুনা ও কাঠ ইত্যাদি দ্বারা কবরকে অধিক পাকাপোক্ত করিয়া দেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিন্দুদের মেলার ন্যায় কবরস্থানে জমায়েত হইতে এবং সেখানে উরুস করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু এই লোকেরা বৎসরে একটি দিন নির্দিষ্ট করিয়া নিয়া। ঈদের দিনের ন্যায় সেইদিনে দূরদূরান্ত হইতে আসিয়া জমায়েত হয়। মোদ্দাকথা হইল, এইসব লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমান এবং তাঁহার আদেশের বিরোধিতা করিতেছে। ইহারা দ্বীন ইসলামের পাক্কা দুশমন। (কিন্তু বিস্ময়ের কথা যে, এতবড় বিরোধিতা করিয়াও তাহারা আবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রগাঢ় মহব্বত ও ভালবাসার দাবী করিয়া থাকে।) ইহাদের যদি এক-আধটুও হুঁশ-জ্ঞান থাকিত তবে লজ্জায় মাথা উত্তোলন করার শক্তি উহাদের হইত না। ইহাদের মূল কর্ম চরিত্রই হইল আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করিয়া যাওয়া।

কবর পূজারীদের সীমা লংঘন

এই আলোচনার পর 'মাজালেসুল আব্‌রার' কিতাবের লেখক আবার লিখিতেছেন যে, এই গোমরাহ সম্প্রদায়টির অবস্থা এতদূর পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে যে, এই দুষ্ট সম্প্রদায় কতিপয় সীমা অতিক্রম করিয়া বায়তুল্লাহ শরীফের ন্যায় কবরের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য একখানা কিতাবও লিখিয়াছে, যাহার নাম হইল, 'মানাসিক-ই-হুব্বুল মুশাহিদ'। ইহা করা যে দ্বীন ইসলামের সাথে বিরোধিতা করা এবং ইসলামের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া মূর্তি পূজারকদের দলে সামিল হইয়া যাওয়া হয়, তাহা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের কর্ম চরিত ও সুন্নৎ তরীকা এবং কবর সম্পর্কে উহাদের আবিষ্কৃত তরীকার মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে সে বিষয় উহাদের একটু চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। আর এই পথভ্রষ্টকারী শিরক ও বিদ্‌য়াতের প্রাদুর্ভাব-দুষ্টতা যে সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। আরেকটি বিরাট জাহেলীপনা হইল, উহার কবরকে মসজিদের তুলনায় অধিক মর্যাদাশালী ও ফজিলতপূর্ণ মনে করে। অথচ দুনিয়ার সমগ্র যমীনের মধ্যে মসজিদই হইল আল্লাহ কবরের নিকট যাইয়া উহার প্রতি এতখানি তাজীম-তাকরীম, বিনয়তা, নম্রতা ও আনুগত্যতা প্রদর্শন করে, যাহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অতি প্রিয় স্থান। সুতরাং উহারা এমনি ভাবিয়া ঘর

অর্থাৎ মসজিদে গিয়াও কখনো এমনি তাজীম-তাকরীম বিনয়তা ও আনুগত্যতা প্রদর্শন করে না। এমনিভাবে এই কবর পূজারকদের নিকট কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করা, উহার উপর চেরাগ ও প্রদীপ জ্বালান, আর কবরের উপর ইবাদতকারীর ন্যায় বসিয়া থাকা এবং উহার সম্মুখে পর্দা টানাইয়া দেওয়া, উহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য আগরবাতি জ্বালাইবার নিমিত্ত, আর কবর পূজার জন্য মানুষকে ভুলাইয়া আনার জন্য খাদেম ও দালাল নিয়োগ করাকে সওয়াবের কাজ মনে করিয়া থাকে। এমনকি কবর পূজারকগণ কবরের সেবাইত ও উহার খেদমতকে বায়তুল্লাহ শরীফের খেদমত ও সেবাইতের তুলনায় অধিক ফজিলতপূর্ণ ও উত্তম কাজ ভাবিয়া থাকে। উহারা মসজিদের খেদমতের চাইতে কবরের খেদমতকে অধিক ফজিলতপূর্ণ কাজ বলিয়া আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে। (হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রঃ) বলেন, 'মাজালিসুল আব্‌রার' কিতাবের লেখক যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন উহা সবই বাস্তবানুগ সত্য কথা। আমি স্বচক্ষে এইসব অপকর্ম দেখিয়াছি এবং স্বকর্ণে এইরূপ প্রগালভ মিথ্যা অলিক কথা শুনিয়াছি। এমনিভাবে কবর ও উহার খাদেমগণের নামে মান্নত করা এবং কবরের নিকট নামায উদ্দেশ্যে দূর-দুরান্ত দেশ হইতে আসা এবং কবরকে তাওয়াফ করা, স্পর্শ করা, চুম্বন করা, উহার উপর হস্তযুগল ও গণ্ডদেশকে ঘর্ষণ করা, উহার মাটিকে বরকত মনে করিয়া নিয়া যাওয়া, কবরবাসীদের নিকট দো'য়া চাওয়া এবং উহাদের নিকট ফরিয়াদ করা, সাহায্য চাওয়া, রুযী-রিযিক ও সন্তান চাওয়া অথবা কোন রোগমুক্তির জন্য, স্বাস্থ্যলাভের জন্য, ঋণ পরিশোধ করার জন্য, বিপদ-আপদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য দরখাস্ত ও আরজী পেশ করাও ইহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। ইহা ছাড়া কবর পূজারকগণ মূর্তি পূজারকদের ন্যায় অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসও কবরে সমাহিত ব্যক্তিদের নিকট আবদার করিয়া থাকে। ইহার পর 'মাজালিসুল আব্‌রার' কিতাবের লেখক লিখিতেছেন যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবে'য়ীগণ যখন এই ধরনের কোন কাজই করেন নাই, তখন এইগুলি কিরূপে বৈধ হইতে পারে? বরং ইমামগণের সম্মিলিত মতে এই কাজগুলি সম্পূর্ণরূপে হারাম ও অবৈধ। ইহার পর আবার তিনি লিখিতেছেন যে; এই সকল কার্যাবলী জায়েয বা নেক কাজ হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ, কুরুনে ছালাছাহ অর্থাৎ সাহাবা, তাবে'য়ীন ও তাবে-তাবে'য়ীগণের যমানায় ঐ সকল কার্যাবলীর মধ্যে কোন একটি কাজও তাহাদের দ্বারা হইয়াছে বলিয়া কেহ প্রমাণ দিতে

পারিবে না। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই সাহাবা, তাবে'য়ীন ও তাবে-তাবে'য়ীগণের যমানাকে উত্তম যমানা বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও ঐ যমানাত্রয়ের লোকেরা এই ধরনের অপকর্ম ও অলীকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। সুতরাং যাহারা এই সকল শরীয়ত বিরোধী অপকর্ম করিয়া বাহাদুরী দেখাইয়া থাকে, আল্লাহ্‌র রাসূল তাহাদিগকে ফাসেক কাফের বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। আমাদের এই কথার উপর যদি কাহারো কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে সে চিন্তা-ভাবনা করিয়া দেখুক যে, কোন প্রকার সহী অসহী হাদীস বা কোন রেওয়ায়েত দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'য়ীন ও তাবে-তাবে'য়ীগণের মধ্যে কেহ কঠিন বিপদ-আপদ ও হয়রানীর সময় কোন স্থান হইতে সফর করিয়া কোন কবরের নিকট এই ধরনের অশ্লীল আজে-বাজে প্রগাল্ভ করার জন্য উপস্থিত হইয়াছে কিনা? এবং কবরবাসীদের দ্বারা দো'য়া করাইয়াছে কিনা? কবরকে স্পর্শ ও চুম্বন করিয়াছে কিনা এবং উহার নিকটে নামায পড়িয়াছে কিনা? কবরবাসীদের নিকট সাহায্য চাওয়া দূরের কথা তাহাদের দ্বারা ইহা হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। এই সব অর্থহীন আজে-বাজে কথা এই বুযুর্গানের থেকে কস্মিনকালেও প্রকাশ পায় নাই। অবশ্য এই সকল বুযুর্গানে দ্বীনের পরবর্তীকালে দুষ্ট গদীনাশীনগণ নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে এই ধরনের এমন আজে-বাজে কর্মপন্থা বানাইয়া নিত, যে সম্পর্কে আল-কুরআন নিম্নরূপ বক্তব্য প্রদান করিয়াছে। এরশাদ হইতেছে—

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

অর্থাৎ, এই সকল সৎলোকদের পর এমন এমন খারাপ ও অনুপযুক্ত লোক সৃষ্টি হইয়াছে, যাহারা নামাযকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে অর্থাৎ ছাড়িয়া দিয়াছে এবং খাহেশাতে নফসানী অর্থাৎ প্রবৃত্তির কামনার গোলামে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহারা অতি শীঘ্রই জাহান্নামের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবে। (১৯-৫৭)

যমানা যতই ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়া গিয়াছে এবং নবুয়তীর যুগের সাথে বিরাট সময়ের ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে, ততই কবর পূজার ফেৎনা সম্প্রসারিত হইয়া রোসম-রেওয়াজে পরিণত হইয়া চলিয়াছে। অবস্থা এতদূর পর্যন্ত গিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে যে, কবর পূজার সত্যতা প্রমাণের জন্য বহু লিখিত কিতাব আমি খোদ স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছি– যাহার প্রমাণিকতা সম্পর্কে নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামসহ খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবে'য়ীন (রাঃ) প্রমুখদের হইতে একটি শব্দও বর্ণিত নাই।

কবর পূজার বিরুদ্ধে সহীহ হাদীস

অথচ এই সকল কবর পূজারকদের বিরুদ্ধে বহু সহীহ হাদীস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে পরম্পরা সনদরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ রহিয়াছে। যেমন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّزُوْرَ فَلْيَزُرْ فَلَاتَقُوْلُوْا هُجْرًا ـ

অর্থাৎ, আমি তোমাদিগকে কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়া ছিলাম। কিন্তু এখন যদি কেহ যিয়ারত করিতে চায় তবে যিয়ারত করিতে পারে। কিন্তু কোন অনর্থক আজে-বাজে কথা বলিবে না।

'মাজালিসুল আব্‌রার' কিতাবের লেখক 'হুজরা' শব্দের ব্যাখ্যায় অশ্লীল ও অর্থহীন আজে-বাজে কথা লিখিয়া বলিয়াছেন, কবর পূজারকদের কবরের সামনে এহেন শির্‌কী কথাবার্তা ও কাজ-কর্মের চাইতে অধিক খারাপ ও আজে-বাজে কথা আর কি থাকিতে পারে? ইহা ব্যতীত এই শির্‌কী কু-কর্মের প্রতিবাদে সাহবায়ে কেরামগণ থেকেও এত অসংখ্য হাদীস-কালাম উল্লেখ রহিয়াছে, যাহার শুমার করা সম্ভব নয়। বুখারী শরীফে একটি ফরমান উল্লেখ রহিয়াছে যে, হযরত উমর ফারুক (রাঃ) হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ)-কে একটি কবরের নিকট নামায পড়িতে দেখিয়া বলিলেন— হে আনাস! আল-কবর আল-কবর। অর্থাৎ কবর হইতে দূরে থাক, দূরে থাক। যে বস্তুর ভীতি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে, সেই বস্তুর নাম বার বার উল্লেখকরণ দ্বারা কঠিন বিপদ ও ভীতির কথা বুঝান হয়। কেননা আরবী ভাষায় প্রচলিত নিয়ম হইল, যখন কোন বস্তুর ভীতি প্রদর্শন করা হয় তখন সেই বস্তুর নাম বার বার উল্লেখ করা হয়, যেন সবাধান হইতে পারে এবং উহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিজেকে রক্ষা করিতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে যখন বাঘের বা সাপের নিকটে দেখ যায়, তখন তাহাকে সর্প ও বাঘের খপ্পর হইতে রক্ষা করার নিমিত্ত এবং সেইখান হইতে পালাইয়া যাইবার নিমিত্ত বার বার সাপ সাপ ও বাঘ বাঘ করিয়া চীৎকার দিয়া ভীতি পদর্শন করা

হয়। হযরত উমর (রাঃ) এমনিভাবে কবরের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শনের নিমিত্ত বার বার আল-কবর আল-কবর বলিয়া চীৎকার দিয়াছিলেন। এই হাদীসটির ব্যাপারে মুহাদ্দিস হাফেজ ইবনে কাইয়্যুম (রাঃ) বলেন, হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ)- এর কবরের নিকট নামায পড়ার দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, তিনি কবরের নিকট নামায পড়াকে জায়েয ও মুবাহ মনে করিতেন। কেননা হযরত আনাস (রাঃ)-এর এখানে কবর আছে কিনা, সেকথা অজানা থাকার দরুন এবং এইস্থানে কখনো কোন কবর না দেখার সম্ভাবনা প্রকটভাবে বিদ্যমান। কবরের নিকটে যে নামায পড়া নিষেধ, সেই বিষয় সাহাবায়ে কেরাম খুব ভালরূপেই ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং হযরত উমর (রাঃ) হযরত আনাস (রাঃ)-কে এইজন্য ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং সাবধান করিয়াছিলেন, যেন এই জায়গার কবর সম্পর্কে সে অবহিত হইতে পারে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

لَاتَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا فَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ ـ

অর্থাৎ, তোমরা আমার কবরকে ঈদগাহে ও মেলার স্থানে পরিণত করিও না। তোমরা দূরে থাক নিকটে থাক আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিতে থাক। কারণ তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌছান হয়।

সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারক দুনিয়ার সমগ্র কবরের সর্দার এবং দুনিয়ার সমগ্র দলিল হইতে তাঁহার রওজা মুবারকের দলিল অতি উত্তম ও বরকতময় স্থান। সেই স্থানকে যখন তিনি ঈদগাহ ও মেলার স্থানে পরিণত করিতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন, তখন অন্যান্য রওজা ও কবরকে ঈদগাহ ও মেলার স্থানে পরিণত করার প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা আরো বেশি কঠোরভাবে প্রযোজ্য হয়। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বলিয়াছেন— তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌছান হয়। এই বাণী দ্বারা পরিষ্কাররূপে এই দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, দরূদ পাঠ চাই কবরের নিকটে থাকুক বা দূরে থাকুক উভয়কেই সমানভাবে ছওয়াব প্রদান করা হইবে। বস্তুতঃ এই ব্যবস্থার ফলে এখন আর রওজা-মোবারককে ঈদগাহ ও মেলার স্থানে পরিণত করার আদৌ কোন প্রয়োজনই থাকে না। কবরকে ঈদগাহ ও মেলার স্থানে পরিণত করায় যে ক্ষতি

হয় তাহার বিস্তারিত জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার বেশ ভালভাবেই রহিয়াছে। (ইবনে কাইয়্যমের উদ্ধৃতি শেষ)

উল্লেখিত হাদীসে, কালাম ও ইমামগণের মতবাদের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিদান করিলে ইহা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, সবচাইতে সরল সহজ পথ ও সিরাতুল মুস্তাকীম হইল ইহাই যে, সমগ্র আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আওলীয়ায়ে কেরাম আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দা। আল্লাহ তা'আলা রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি জগতের মধ্যে কোন সৃষ্টিই তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর কোনরূপ তাসাররূপ অর্থাৎ কোনরূপ ভালমন্দ করার শক্তি, ক্ষমতা ও প্রভাব রাখে না। তবে এই সকল আম্বীয়ায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের থেকে যে মোজেযা ও কেরামত প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল আহলে একীন ও ঈমানদারগণের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বিজয়ের জন্য তাহাদের কোনরূপ ইচ্ছা ব্যতীরেকে আল্লাহ তা'আলা শুধু তাঁহার কুদরত ও ইচ্ছা শক্তি দ্বারা তাহাদের থেকে এমন সব অলৌকিক ঘটনা ও অসাধারণ কাজ প্রকাশ করেন, যাহা মানুষ অবলোকন করিয়া তাহাদের কথা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়া নিতে পারে এবং তাহাদেরকে দানকৃত মত-পথের পায়রবী করিয়া মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য তথা আল্লাহ তা'আলার খুশি ও রেজামন্দী অর্জন করিতে সক্ষম হয়।

কবর পূজারক ও মুশ্‌রিকগণের যুক্তি খণ্ডন

সুতরাং যে সব লোক রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত এবং তাঁহার সাহাবাগণের অনুকরণ ও পায়রবী ছাড়িয়া দিয়া অমুক হোম্‌রা-চোমরাদের কথা ও কাজে মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছে এবং কবর পূজার বৈধতা প্রমাণের জন্য অনেক অর্থহীন ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া জনসাধারণকে যে কথা বলিয়া ধোকা দেয়, আল-কুরআনের ভাষায় তাহা নিম্নরূপ—

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى.

অর্থাৎ, আমরা তাহাদের পূজা অর্চনা এইজন্য করিতেছি যে, তাহারা আমাদিগকে আল্লাহ তা'আলার নিকটে পৌছাইয়া দিবে। (৩ ঃ ১৫)

অতএব এই লোকেরা পূর্ববর্তী গোমরাহ লোকদের ও বাতেল পূজারকদের গোমরাহীর রং-এ রংগীন হইয়া গিয়াছে। তাই—

اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْمَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ.

অর্থাৎ, ইহারা যাহাদের বিষয় মতবিরোধিতা করিয়া আসিতেছে তাহাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিবেন। (সূরা আয-যুমার ঃ ২৩-১৫)

উলামায়ে কেরাম শির্‌কের বিভিন্ন শ্রেণী অনুযায়ী মুশ্‌রিকগণের বিভিন্ন শ্রেণীর বিশদ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। মুশ্‌রিকগণের একটি দলের নাম হইল ছানবীয়া। তাহারা জগতের জন্য দুইজন খোদা মানিয়া থাকে। একজনের নাম হইল ইয়াজদান আর দ্বিতীয় জনের নাম হইল হামান। তাহাদের দ্বিতীয় দলের নাম হইল তারকা পূজার দল। উহাদিগকে আরবী ভাষায় সায়েবীন উপাধি দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের তৃতীয় দলটি হইল হিন্দুদের দল, যাহাদের আক্বীদা হইল যে, সৃষ্টি জগতের পরিচালক সেই অদৃশ্য আত্মা, তাহার বিভিন্ন রূপ-চেহারা রহিয়াছে। সুতরাং এই বিশ্ব পরিচালককে খুশি করিবার নিমিত্ত তাহার রূপাকৃতি ও মূর্তিকে আমাদের পূজা করা উচিত। আর মুশ্‌রিকদের চতুর্থ দলটি হইল পীর পূজারক-দের দল। বক্তব্য হইল যে, যখন আল্লাহ তা'আলার কোন নেক বান্দা ইবাদত-বন্দেগী, সাধনা ও মোজাহাদা দ্বারা আল্লাহ্‌র দরবারে মোস্তাজাবুদ্ দাওয়াত (অর্থাৎ যাহার প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হয়)-এর মর্যাদালাভ করিয়া আল্লাহ তা'আলার মকবুল বান্দা হইয়া যায় এবং তাহার দরবারে শাফায়াত করা মর্যাদা লাভ করে, তখন সেই বান্দার ইন্তেকালের পর তাহার আত্মা বিরাট শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী। সুতরাং যে ব্যক্তি তাহাদের রূপ চেহারার ধ্যান করিবে অথবা তাহাদের থাকার জায়গা এবং কবরকে খুব বিনয়াবনতার সাথে সিজ্‌দা করিবে, তাহার যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে এই বুযুর্গের আত্মা অবহিত হইয়া থাকে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া দিয়া তাহার জন্য শাফায়াতকারী হইয়া যায়। উল্লেখিত শির্‌কী মাযহাবসমূহের রদ্ ও বাতিল ঘোষণার বেলায় আল-কুরআনে অগণিত আয়াত এবং বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এখানে কতিপয় কুরআন-হাদীস উদ্ধৃত করা হইতেছে—

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ.

অর্থাৎ, তাহারা কি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যান্য সত্তাকে নিজেদের সুপারিশকারী মনোনীত করিয়াছে? হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, যদিও এই মূর্তি

কোন বস্তুর মালিক ন্যায় এবং কোন বিষয় কিছু বোঝেও না। তথাপি তোমরা কেন ইহাদেরকে মা'বুদ মনোনীত করিতেছ? (সূরা আয-যুমুর ঃ ৫)

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ.

অর্থাৎ, এই ব্যক্তির চাইতে বড় গোমরাহ লোক আর কে হইতে পারে, যে আল্লাহ তা'আলাকে পরিত্যাগ করিয়া এমন বস্তুর ইবাদত করিতেছে ও ডাকিতেছে, যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের কথার কোন জবাব দিবে না। আর উহারা তাহাদের আরাধনা ও ডাক সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। (সূরা আল-আহকাফ ঃ ৫)

সুতরাং গাইরুল্লাহকে যাহারা ডাকিয়া থাকে এবং ইবাদত-বন্দেগী করে তাহাদের চাইতে এই দুনিয়ায় বড় গোমরাহ আর কেহই নাই। ইহা আমাদের ভালরূপে উপলব্ধি করা উচিত, আল-কুরআনের উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয় যে, অদৃশ্য আত্মা ও দেহসমূহের যে ইবাদত এই পার্থিব জগতে করা হয় এবং তাহাদের নিকট যে বিভিন্ন বস্তু চাহিয়া প্রার্থনা করা হয়, ঐ সব আত্মা ও দেহসমূহ প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। হাশরের ময়দানে যখন ইহারা আল্লাহ তা'আলার হুকুমে প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা সম্পর্কে অবহিত এবং নিজেদের ইবাদতকারীদের কথা শুনিবে, তখন তাহারা ইহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাহাদের জন্য সুপারিশ করা তো দূরের কথা তাহাদের কাজকে আদৌ স্বীকৃতিই দেওয়া হইবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ.

অর্থাৎ, সমগ্র মানুষকে যখন কিয়ামতের দিন জমায়েত করা হইবে, তখন এই লোকেরা তাহাদের দুশমন এবং তাহাদের ইবাদতী কার্যের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে। (সূরা আহ্‌কাফ)

এই আয়াত দ্বারা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়, এই লোকদের দো'য়া প্রার্থনা এবং তাহাদের ডাকই ইবাদত। প্রথম আয়াতে দো'য়া শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এই আয়াতে দো'য়া ও প্রার্থনাকে ইবাদত বলিয়া ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আর নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারাও এই একই অর্থ প্রমাণিত হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ.

অর্থাৎ, আমার নিকট তোমরা প্রার্থনা কর। আমি তোমাদের প্রার্থনার জবাব দিব। যাহারা আমার ইবাদত হইতে বিদ্রোহী হয়, তাহারা অতি সত্বর অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে দাখিল হইবে। (সূরা আল-মুমিন)

আর হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ.

অর্থাৎ, দোয়া ও প্রার্থনাই ইবাদত।

অন্যত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ.

অর্থাৎ, দো'য়াই ইবাদতের মগজ ও আসল বস্তু।

যে কাজ আওলিয়াগণের ইবাদতকে অপরিহার্য করিয়া দেয়

আওলিয়ায়ে কেরামগণের নিকট মনোবাঞ্ছা ও হাজত পূর্ণ করিয়া দিবার প্রার্থনা করা, তাহাদিগকে ডাকা, তাহাদের কবরের নিকট ফরিয়াদ করার জন্য যাওয়া ইত্যাদি সব রকমের কাজ দ্বারা যে তাহাদের ইবাদত করা হয়, তাহা আমাদের ইতিপূর্বের আলোচনা দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। যাহারা কবরের নিকট দিয়া এই ধরনের কার্য করিয়া থাকে এবং তাহারা যদি মনে করে যে, আমরা কবরের যিয়ারত করিয়া থাকি তাহাদের ইবাদত করি না, তবুও এই কাজ তাহাদের ইবাদতের মধ্যে গণ্য হইবে। তাই এই গুণাহর অর্থহীন ওযর দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিষেধাজ্ঞা জারি করার কারণ এই জানা যায় যে, তিনি প্রথমতঃ এইসব অপকর্ম ও শিরকী কার্য হওয়ার দরুনই কবর যিয়ারতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিলেন। যেমন, তিনি এরশাদ করিয়াছে—

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُهَا فَاِنَّهَا تَذْكِرَةُ الْاٰخِرَةِ.

অর্থাৎ, আমি প্রথমতঃ তোমাদিগকে কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কারণ, ইহার দ্বারা বহু শির্ক বিদ্‌য়াত ও গুনাহ্‌র কাজ হইত। তাই এইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই নিষেধ করিয়াছি। কিন্তু কবর যিয়ারতে মানুষের জন্য কিছু ফায়দাও রহিয়াছে। আর সেই ফায়দা হইল মানুষের অন্তরে পরকালের কথা জাগরিত হওয়া। এই জন্য আমি এখন তোমাদিগকে কবর যিয়ারত করার অনুমতি প্রদান করিতেছি। সুতরাং এই দ্বীনি ফায়দাটির পানে দৃষ্টি রাখিয়া এবং ইহার কল্যাণের কথা ভাবিয়াই কবর যিয়ারত করা জায়েজ।

কবর যিয়ারতের ফায়দা

সুতরাং উল্লেখিত অবস্থায় মুসলমান অমুসলমান প্রত্যেকের কবর যিয়ারতের ফায়দা সমপরিমাণে লাভ হইয়া থাকে। কেননা কবর দর্শন করায় জানাযা দর্শনের ন্যায় মৃত্যুর কথা মানুষের মনে জাগিয়া ওঠে। কেননা হাদীস শরীফের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত রহিয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় স্নেহময়ী মাতার কবর যিয়ারত করার জন্য গিয়াছিলেন।

মহানবীর স্বীয় মাতার জন্য মাগফেরাত কামনা

ইমাম মুসলিম তদীয় বিশ্ব-বিখ্যাত হাদীসের কিতাবে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর একটি হাদীস নকল করিয়াছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় জননীর কবর যিয়ারতের জন্য গিয়াছিলেন। কবর যিয়ারত করিতে গিয়া তিনি যেমন রোদন করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁর সঙ্গী-সাথীগণও কাঁদিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন— আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার মাতার জন্য দো'য়া ও মাগফেরাত কামনা করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাকে সে অনুমতি দান করা হয় নাই। অতঃপর আমি তাহার কবর যিয়ারত করার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইহার অনুমতি দিয়াছিলেন। সুতরাং তোমরাও কবর যিয়ারত কর। কেননা কবর যিয়ারত দ্বারা অন্তরে পরকালের ও মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। **এখানে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মাতার জন্য দো'য়া ও মাগফেরাত কামনা করিয়া যখন বিফল হইলেন, তখন যাহারা বুযুর্গানে দ্বীনের কবরের নিকট যাইয়া শির্কী কাজ করিয়া থাকে, তাহারা কিরূপে ঐ বুযুর্গানে দ্বীনের সাফায়াতের দাবীদার হইতে পারে?**

কেননা, শির্কী শাফায়াতের প্রতিবন্ধক কাজ। আর কবর যিয়ারত সম্পর্কে মৃত্যুর স্মরণ হওয়ার কথা দ্বারা ইহা বুঝা যায়, যদি কোন লোক মৃত্যু ও পরকালের স্মরণ এবং দুনিয়ার প্রতি আনাসক্তি অর্জন করার নিমিত্ত অথবা সমাহিত মুমীন ব্যক্তিগণের জন্য মাগফেরাত কামনা করার উদ্দেশ্যে কবরস্থানে গমন করে, তবে ইহাতে কোনই ক্ষতি ও দোষের কারণ নাই। এই উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যাওয়া এবং কবরকে যিয়ারত করার বৈধতা শরীয়ত অনুমোদন করে।

অভিশপ্ত হওয়ার আশঙ্কা

উল্লেখিত উদ্দেশ্য ব্যতীত যদি অন্য কোন শরীয়তের পরিপন্থী উদ্দেশ্যে কেহ কবরস্থানে যায় এবং কবর যিয়ারত করে, যেমন— কবরবাসীর নিকট কোনকিছু প্রার্থনা করা, বিপদ-আপদ হইতে নাজাতের জন্য আবেদন করা, চীৎকার করিয়া কান্নাকাটি করা, নর্তন-কুর্দন ও আনন্দ-স্ফুর্তি করা, গান ও কাওয়ালী গাওয়াসহ যাবতীয় শরীয়তের খেলাফ কাজ করা, তবে তাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলার লানৎ ও অভিশাপ বর্ষিত হইবে। তাহাদের নাজাত পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। বরং শির্কের বদ্ধজালে আবদ্ধ হইবার আশঙ্কাই সমধিক। কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ধরনের যিয়ারতকারীদের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ দিয়াছেন। যেমন, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন—

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ .

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারতকারিণী রমণীদের প্রতি লানত করিয়াছেন। (তিরমীযী, ইবনে মাযা আহমদ) কতিপয় উলামায়ে কেরাম বলেন— নারীগণকে কবর যিয়ারত করিতে এইজন্য নিষেধ করা হইয়াছে যে, তাহারা সাধারণত অধৈর্য হওয়ার কারণে কবরস্থানে গিয়া উচ্চঃস্বরে রোদন ও বিলাপ আরম্ভ করিয়া দেয় এবং নানাবিধ শরীয়তবিরোধী এমন এমন কথা বলিয়া ফেলে যাহা পরিষ্কাররূপে হারাম। সুতরাং এই কারণেই তাহাদের প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লানত দিয়াছেন। মোট কথা কয়েক ধরনের কবর যিয়ারতকারিগণের জন্য আল্লাহ্‌র লানত হইবার কারণ হয়। কেননা তাহাদের দ্বারা শরীয়ত কর্তৃক নিষেধকৃত হারাম কার্যাবলী প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাই এই ধরনের কাজ নারী-পুরুষ যাহাদের থেকেই প্রকাশ হউক না কেন, সকলের জন্যই হারাম এবং সকলের প্রতিই আল্লাহ্‌র লানত বর্ষিত হইবে।

অবশ্য জায়েয ও বৈধ পন্থায় যদি কোন নারী বা পুরুষ কবর যিয়ারত করে, তবে তাহাদের জন্য জায়েয ও বৈধ হইবে। কেননা হযরত ফাতেমা (রাঃ) সাইয়্যিদুশ শুহাদা হযরত হাম্‌যা (রাঃ)-এর কবর যিয়ারত করিয়াছেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-এর রওজা মুবারকও যিয়ারত করিয়াছেন। হাদীসে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান।

কবর যিয়ারতের সুন্নাত তরীকা

এখন আমরা কবর যিয়ারতের সুন্নাত তরীকা এবং নবী করীম (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম কবর যিয়ারতের সময় কি কর্মপন্থা অবলম্বন করিতেন সেই বিষয় আলোচনা করিব। মিশকাত শরীফে 'যিয়ারতে কবর'-এর পরিচ্ছেদের প্রথম অধ্যায় মুসলিম শরীফ হইতে একটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত হাদীসে হযরত বারীদাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে কবর যিয়ারতের সময় নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করার জন্য নির্দেশ দিয়া ইহা শিখাইয়াও দিয়াছেন। দোয়াটি এই—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔

মিশ্‌কাত শরীফের সংকলক তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন এক সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা মোনাওয়ারার কবরস্থানে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তিনি কবরবাসীদের দিকে মনোনিবেশ করিয়া বলিলেন—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا نَحْنُ بِالْاَثَرِ۔

তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি মুসলিম শরীফ হইতে হযরত আয়শা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়া আর একটি হাদীসে নকল করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত আয়শা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরজ

করিলেন– ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি কবরস্থানে যাই, তবে সেখানে গিয়া কি বলিব? জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দোয়া পাঠ করিতে এরশাদ করিলেন—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ۔

উল্লেখিত হাসীসসমূহ দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে,' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায় কেরামগণের পরকাল ও মৃত্যুর স্মরণ ব্যতীত কবর যিয়ারত করার অপর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু যেখানে তিনি নিজের জন্য রহমত ও মাগফেরাতের দোয়া করিতেন, সেখানে তিনি মৃত মুসলমানদের জন্যও মাগফেরাত কামনা করিয়া দোয়া করিতেন, যেন জীবিত লোকগণের তরফ হইতে মৃত লোকগণ উপকৃত হন। আর মৃত হউক বা জীবিত হউক এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইদের জন্য মাগফেরাতের কামনা করিয়া দোয়া করা যে ছওয়াবের কাজ তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বে-শরিয়তী পন্থায় কবর যিয়ারত দ্বারা নেক্‌কারগণের রূহ অখুশি হওয়ার বিবরণ

কিন্তু বর্তমান যুগের লোকেরা নিজেদের উপকার লাভ ও ক্ষতি হইতে রেহাই পাইবার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করিয়া থাকে এবং সমাহিত ব্যক্তিগণের আত্মাকে নিজদের কাজকর্ম ও অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকার কথা ভাবিয়া তাহাদের কবরের সামনে দাঁড়াইয়া খুব বিনয়তা নম্রতা ও দীনতা-হীনতা প্রকাশ করিয়া নিজেদের মনস্কামনা ও উদ্দেশ্য পেশ করিয়া থাকে এবং তাহাদের নামে বিভিন্ন জিনিস মান্নৎ করে। তাহাদের নিকট এই কথা বলে যে, আমাদের অমুক হাজত ও প্রয়োজন পূরণ করিয়া দিন। অথবা এই কথা বলে যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের বিপদ-আপদ ও মুসিবত বিদূরীত হওয়ার নিমিত্ত আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের তরফ হইতে আবেদন পেশ করুন। সুতরাং এই বিদ্‌য়াতীদের এই ধরনের শরীয়ত বিরোধী কাজকর্ম ও কথাবার্তার এবং তাহাদের এই নবতার আবিষ্কৃত তরীকার প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামসহ সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতের সকলেই ঘৃণা পোষণ করিয়াছেন। এই কাজের জন্য তাহারা সকলেই অখুশি ও বেজার।

সুন্নাত তরীকা বর্জন ও শরীয়ত বিরোধী তরীকার অনুসরণকে পরিত্যাগ করা একান্ত অপরিহার্য

বস্তুতঃ প্রত্যেকটি মুমিন বান্দার জন্য একান্তভাবে কর্তব্য হইল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ও সাহাবাগণের সেই কাজ ও কথাকে অনুসরণ করিয়া চলা এবং তাহারই ইক্তিদা করা, যাহা হাজার হাজার উলামায়ে কেরাম সংকলন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কেননা অপরাপর কথা ও কাজের অনুসরণ ও আনুগত্যকরণের ব্যাপারে কোথাও এমন কোন হাদীস খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সাহাবায়ে কেরামগণের কথা ও কাজকে অনুসরণ ও উহার ইক্তিদাকরণ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের অনুকরণের বেলায় আমাদের কোনরূপই আলস্য ও গাফলতী প্রদর্শন করা উচিত নয়। বরং এই ফেৎনা ফাসাদের যমানায় নিজেদের সকল বুযুর্গানদের কথা ও কাজকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণের সুন্নাতের মাফকাঠিতে সর্বদা পরিমাপ করিয়া চলা উচিত। কেননা এই যমানায় আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত কোন বস্তুই আল্লাহ্র আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। যেমন, আল-কুরআনে এরশাদ হইয়াছে—

لَاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَحِمَ۔

অর্থাৎ, আজিকার দিন আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত কোন বস্তুই আল্লাহ তা'আলার আযাব হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। (সুরা হুদ)

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ধরনের ফেৎনা-ফাসাদ ও শিরক বিদ্‌য়াতের গোমরাহী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার অহী দ্বারা উম্মতের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন— মতদ্বৈততা, অনবগততা ও অনৈক্যতার বিক্ষুব্ধ সাগর আমার উম্মতকে হযরত নূহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কওমের ন্যায় গোমরাহীর তুফানের মধ্যে ফেলিয়া বরবাদ ও হালাক করিয়া দিবে। যাহারা আমার সাহাবাগণের এবং আসল আহ্‌লে বায়েতগণের

সুন্নাতের কিস্তিতে আরোহণ না করিবে, তাহারা এই গোমরাহীর তুফানে ডুবিয়া মরা হইতে কোনক্রমেই বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। তাঁহার কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে—

اَلَاۤ اِنَّ اَهْلَ بَيْتِىْ فِيْكُمْ مِثْلُ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ مَّنْ رَّكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ۔

অর্থাৎ, তোমরা সাবধান হইয়া যাও। আমার আহলে বায়েত তোমাদের জন্য হযরত নূহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিস্তি সদৃশ। যে ব্যক্তি এই কিস্তিতে আরোহণ করিবে অর্থাৎ তাহাদেরকে অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া চলিবে, সে নাজাত পাইবে। আর যাহারা তাহাদের অনুকরণ-অনুসরণ পরিত্যাগ করিবে তাহারা হালাক ও বরবাদ হইয়া যাইবে।

এই হাদীসটি যদিও প্রকাশ্যরূপে আহলে বায়েতগণের ফজীলত ও মর্যাদার বিষয় নিয়া বর্ণিত হইয়াছে যেমন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র'ঃ) তদীয় মসনদে 'আহলে বায়েতগণের ফজীলত' বর্ণনার অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি এই হাদীসটি সম্মানের দিক দিয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। যেমন হযরত আজাদ বিন সারীয়াহ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সিয়াহ সিত্তাহ ও সুনানের কিতাবসমূহের লেখকগণ নিজ নিজ কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ হাদীসটিও খোলাফায়ে রাশেদার ফজীলত ও মর্যাদার বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে এবং উহা দ্বারা আহলে বায়েতগণের ফজীলত প্রমাণিত হয়। ঐ হাদীসটি নিম্নরূপ।' (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) আমার ইন্তেকালের পর যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহারা বহু মতদ্বৈততা ও ইখ্‌তিলাফ দেখিতে পাইবে। সুতরাং এই সময় তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হইল, আমার সুন্নাত এবং আমার পরিবর্তে খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাৎকে খুব দৃঢ়তার সাথে আকড়াইয়া ধরা। দ্বীনের ভিতর নব আবিষ্কৃত পথ হইতে দূরে সরিয়া থাকা। কেননা প্রত্যেকটি নব আবিষ্কৃত পথ (বিদয়াত) হইল গোমরাহী।' মুদ্দাকথা হইল, প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক স্থানে মুসলমানদের উপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায় কেরামগণের অনুসৃত মত পথের পায়রাবী ও আনুগত্য করিয়া চলা অন্যান্যদের কথা কাজকে এবং ঐ সকল বুযর্গানের পায়রবী ও অনুসরণকে পরিত্যাগ করিয়া চলা ফরজ, যাহারা আল্লাহ রাসূলের পথের পরিপন্থী পথে

চলিয়া থাকে। কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণের সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণকে জানিয়া-বুঝিয়া ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগকারীগণ ফাসেক ও অভিশপ্ত লোক। ইমাম মুসলিম নিশাপুরী (রঃ) তদীয় কিতাবে হযরত আয়শা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَرَدٌّ.

যদি কোন লোক এমন কাজ করে, যে কাজ সম্পর্কে আমার তরফ হইতে কোনরূপ প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অনুমতি নাই; সেই কাজ ও সেই কাজের কর্তা উভয়ই প্রত্যাখ্যাত ও মুরদুদ। অর্থাৎ এমন লোকের পায়রবী কস্মিনকালেও করা যাইবে না।

পীরের জন্য সুন্নাতকে তরক করা মূর্তির ইবাদতের সামিল

ইহা আমাদের ভালরূপে অবগত হওয়া উচিত যে, পীর-ফকীর ও দরবেশগণের কথা অনুযায়ী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাগণের সুন্নাতের অনুকরণ অণুসরণকে পরিত্যাগ করিয়া চলার অর্থ তাহাদিগকে মা'বুদ মনোনীত করিয়া নেওয়া এবং তাহাদের ইবাদত করা। যেমন, আল-কুরআনের আয়াত—

وَمَا أُمِرُوْٓا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا. (٩ : ٣١)

এর মর্মার্থ, যাহা ইয়াহুদ নাসারাগণ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। হযরত আদী বিন হাতেম (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহুদ নাসারাগণ তো তাহাদের পীর দরবেশ ও রাহেবগণের ইবাদত করিত না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যে তাহাদিগকে পীরদরবেশ ও রাহেবগণের ইবাদত করার কথা বলিয়াছেন তাহা কিসের ভিত্তিতে বলিয়াছেন? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাবাবে বলিলেন— ইহারা তাহাদের ইবাদত করিত না বটে, কিন্তু তাহাদের পীর দরবেশ ও রাহেবগণ যেই হারাম বস্তুকে তাহাদের জন্য হালাল করিয়া দিত, উহারা তাহাই হালাল-হারাম বলিয়া মনে করিয়া নিত। সুতরাং তাহারা হালাল হারামের ব্যাপারে উহাদের কথা মানিয়া চলার অর্থই হইল ঐ পীর দরবেশ ও রাহেবগণের ইবাদত করা।

পথভ্রষ্টকারী নেতা ও ইমাম

ইমাম আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়াহ তদীয় কিতাব 'সিরাতুল মুস্তাকীমে' লিখিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি দ্বীনি ব্যাপারে অর্থাৎ হালাল হারাম ওয়াজিব মোস্তাহাবের মধ্যে কোন ব্যাপারে এমন কোন লোকের আনুগত্য ও অনুকরণ করিয়া চলে, যাহা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দেন নাই, তবে হুকুমদাতা ও আবিষ্কার কর্তার ন্যায় উহার অনুকরণকারীর উপর উহার গুনাহের অংশ বর্তাইবে এবং উভয়ই গুণাহগার হইবে। যেমন সুনানে আবু দাউদ ও জামে তিরমিজী শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভৃত্য হযরত সাওবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

اِنَّمَا اَخَافُ عَلٰى اُمَّتِى الْاَئِمَّةُ الْمُضِلِّيْنَ.

অর্থাৎ, আমি আমার উম্মতের জন্য পথভ্রষ্টকারী ইমাম ও নেতৃবৃন্দকে ভয় করিতেছি।

মুসলীম শরীফে এই একই বিষয়ের আর একটি হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। তথায় হুযূর সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

يَكُوْنَ بَعْدِىْ اُمَّةٌ لاَّيَهْتَدُوْنَ بِهِدَايَتِىْ وَلاَيَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِىْ
وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنَ.

অর্থাৎ, আমার পরে এমন লোক পয়দা হইবে যাহারা আমার হেদায়েত ও তরীকা মাফিক চলিবে না এবং আমার সুন্নাতেরও অনুকরণ করিবে না। অনতি বিলম্বে তাহাদের মধ্যে এমন নেতা ও ইমাম সৃষ্টি হইবে যাহাদের অন্তঃকরণ হইবে শয়তানের ন্যায়।

আমল মকবুল ও মুরদুদ হওয়ার আলামত

মোটকথা, প্রত্যেক কাজ করা না করার বেলায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত এবং সাহাবায়ে কেরামগণের দরবারে মানুষের আমল গ্রহণীয় ও মকবুল হওয়ার আলামত। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণের সুন্নাত ও আদর্শে প্রত্যেক কাজ করা ও

না করার বেলায় বর্জন করিয়া চলা, উঁহার বিরোধিতা করা এবং উহার সাথে বৈসাদৃশ্য হওয়াই হইল আল্লাহ্‌র দরবারে আমল গ্রহণীয় না হওয়া বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আলামত। এই ব্যাপারে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, শাসক ও জনগণ সকলেই সমান। কাহারো ক্ষেত্রে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব বা বৈসাদৃশ্য হইবার অবকাশ রাখা হয় নাই।

আমাদের ইহা ভালভাবেই অবহিত থাকা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা রাব্বুল আলামীন তাঁহার মহব্বতের পথে পরিচালিত ব্যক্তিগণের সম্মানে তাঁহার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ.

অর্থাৎ, হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত করিতে চাও, তবে তোমরা সকল কাজে আমার অনুসরণ করিয়া চলো। তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলাও তোমাদিগকে মহব্বত করিবেন এবং তোমাদের গুনাহ্‌রাশি মার্জনা করিয়া দিবেন। (সূরা আলে ইমরান)

সুতরাং উল্লেখিত আয়াত দ্বারা পরিষ্কার বুঝা গেলো যে, আল্লাহ তা'আলার প্রিয় পাত্র হওয়া এবং গুনাহ্‌রাশি মার্জনা হওয়ার একমাত্র পথ হইল সকল কাজে ও সকল বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও অনুসৃত কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়া চলা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বিকল্প পথ নাই। দ্বিতীয় কোন মানব রচিত পথে চলা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আর খুলাফায়ে রাশেদার পায়রবী করাও তাঁহারই পায়রবীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ তিনি তাহাদের পায়রবী করার অর্থ হইল নবী করীম (সঃ)-এর পায়রবী করা। অতএব, দ্বীনি ব্যাপারে অর্থাৎ, জীবন বিধান বিষয়ক সকল ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার সাহাবাগণ যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা করিয়া যাওয়া এবং যাহা না করিয়াছেন বা যাহা হইতে বিরত রহিয়াছেন, তাহা হইতে বিরত থাকিয়া পাকা সুন্নী হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস ও দ্বীনের স্তম্ভের বেলায় সুন্নাতের পায়রবী ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ

আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমত ও মেহেরবানী ব্যতীত জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাগণের সমুদয় কথা

ও কাজকে যথার্থরূপে অনুসরণ ও পায়রবী করিয়া চলা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কিন্তু দ্বীনি আক্বীদা-বিশ্বাস ও উহার রুকন ও স্তম্ভসমূহের ব্যাপারে ইসলাম কর্তৃক পেশকৃত আক্বীদা ও ধ্যান-ধারণা পোষণ করা ঈমানের অপরিহার্য বিষয়ের মধ্যে অন্যতম বিষয়। সুতরাং হক্কানী উলামায়ে কিরাম বলিয়াছেন, এই ব্যাপারে একই আক্বীদা-বিশ্বাস পোষণের দিক দিয়া প্রত্যেকটি মুসলমান সমমর্যাদায় সমাসীন। কাহারো উপর কোনরূপ প্রাধান্য নাই। হ্যাঁ, মর্যাদা ও সম্মানের দিক দিয়া যদি কোনরূপ বৈপরিত্য ও বৈসাদৃশ্য থাকিয়া থাকে, তবে উহা আমলের জন্য, আক্বীদা-বিশ্বাসের জন্য নয়। অর্থাৎ, বাস্তব জীবনের আমল ও কার্যাদির দিক দিয়া একের উপর অন্যের সম্মান ও মান-মর্যাদা কম-বেশি হইতে পারে। কিন্তু আক্বীদা-বিশ্বাসে ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে সকল মুসলমান সমান।

কবর পূজা ও পীর পূজার প্রতিবিধান

আমাদের সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইসলামের ও বুযূর্গানে দ্বীনের আক্বীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী কবর পূজা ও পীরপূজার দূরারোগ্য রোগ প্রবেশ করিয়াছে। উঁহার একমাত্র প্রতিষেধক ও পরীক্ষিত চিকিৎসাপত্র হইল আল-কুরআনের বিশুদ্ধ আয়াতসমূহ। কেননা, কুরআনে হাকীমই হইল মানসিক রোগ বিদূরিত করার একমাত্র বিজ্ঞ ও দক্ষ চিকিৎসক, যাহা মানুষকে অলীক ও ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণা এবং অভিশপ্ত শয়তানের অর্থহীন বাতিল ওয়াস্‌ওয়াসা ও কু-মন্ত্রণা হইতে বাঁচাইয়া রাখে। কেননা, দুষ্ট রোগী পরহেযগারী প্রদর্শন করিয়া মূলতঃ নিজ আত্মার উপরই অত্যাচার করে। তাই যাহারা আত্মার উপর জুলুম করিয়া থাকে, তাহারা আল-কুরআন হইতে কোনই ফায়দা পায় না। যেমন, ইরশাদ হইতেছে—

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا.

অর্থাৎ, কুরআনুল কারীমকে মু'মিনগণের জন্য আরোগ্য দানকারী এবং রহমত বিশেষ নাযিল করা হইয়াছে। আর জালিমদের জন্য হইল উহা আপাদমস্তক ক্ষতির কারণ।

অর্থাৎ, সুস্বাদু ও শক্তিশালী খাদ্য যেরূপ স্বাস্থ্যবান লোকদের জন্য কল্যাণকর, তেমনি আল-কুরআন ঈমানদারগণের জন্য উত্তম, সুস্বাদু ও শক্তিশালী খাদ্য

বিশেষ। আর জালিমদের জন্য ক্ষতিকারক। কারণ, তাহাদের রোগ আরো বাড়াইয়া তোলে, যেমন শক্তিশালী খাদ্য রোগীদের জন্য ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কোন একজন কবি বলিয়াছেন—

بار ان کہ در لطافت طبعش خلاف نیست

در باغ لالہ روید ودر شور لا یوم خس۔

অর্থাৎ, বর্ষার পানির মধ্যে স্বভাবতঃ কোন বৈপরিত্য নাই। কিন্তু ঐ পানি যখন বাগানে পতিত হয়, তখন বাগান ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া উঠে, আর অনুর্বরা ও লবণাক্ত জমিতে পতিত হইলে সেখানে ঘাস ছাড়া কিছুই জন্মায় না।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে মজীদে ইরশাদ করিয়াছেন—

اَلْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِاِذْنِ رَبِّهٖ وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, উর্বরা জমি আপন প্রভুর নির্দেশে সুন্দর ফল ও শস্য দিয়া থাকে। আর খারাপ ও লবণাক্ত জমি জন্ম দিয়া থাকে শুধু অর্থহীন ও অব্যবহার্য বস্তু। এমনিভাবে কৃতজ্ঞ বান্দাগণের জন্য নিদর্শন বর্ণনা করিয়াই থাকি। (সূরা আল-আরাফ- ৭)

নেক্‌কার বান্দাগণ বলিয়া থাকে যে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لَآ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُوْلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ـ

অর্থাৎ, সেই মহান সত্তার জন্যই সমুদয় প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে সহজ-সরল রাস্তায় হিদায়াত দান করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে হিদায়াত না করিলে আমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হইতাম না। নিঃসন্দেহে আমাদের পরওয়ারদিগারের রাসূল হক কথা নিয়া দুনিয়ায় আগমন করিয়াছেন। (সূরা আল-আরাফ- ৫)

فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ـ

অর্থাৎ, এক জামাতের লোক জান্নাতের অধিবাসী হইবে, আর অন্য এক জামাত জাহান্নামের বাসিন্দা হইবে। (৪২ ঃ ৭)

আম্বীয়াগণের হাজত পেশ করার তরীকা

যেহেতু আম্বিয়ায়ে কিরাম, সাহাবা ও উলামাগণের আক্বীদা-বিশ্বাসে সামঞ্জস্য থাকা একান্ত অপরিহার্য। তাই ইহা আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, তাহারা নিজেদের হাজত ও প্রয়োজন উত্থাপন করার বেলায় আল্লাহ তা'আলার সত্তা ব্যতীত অন্য কোন দিকে আদৌ কোনরূপ দৃষ্টিপাত করিতেন না। তাহাদের মধ্যে কেহ মানুষের মূর্তি, প্রতিমা ও মা'বুদগণের নিকট প্রয়োজন ও হাজত পেশ করা তো দূরের কথা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাহাকেও তাহারা মূল হাজত পূরণকারী ও দাবী রক্ষাকারী বলিয়া মানিতেন না। কেননা, তাহারা নিজেদের ন্যায় দুনিয়ার সকল সৃষ্ট জীবকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট মুখাপেক্ষী মনে করিয়া থাকেন। এইসব বুযুর্গানে দ্বীন সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার নিষেধকৃত বস্তু ও কাজকে পরিহার করিয়া তাঁহার খুশি ও সন্তুষ্টি বিধানের কাজে অনুরিত থাকিতেন। মিল্লাতে মুস্‌লিমার মূল প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যখন চড়কগাছ দ্বারা অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্য উপরে তোলা হইল, তখন তিনি দুইটি অবস্থা অর্থাৎ, নিজ কথা ও কাজের দ্বারা হিদায়াতের পথের পানে ইঙ্গিত দান করিয়াছিলেন। এই দুইটি অবস্থার প্রথমটির পায়রবী ও অনুকরণ প্রত্যেকটি মুমীন-মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। আর দ্বিতীয় অবস্থাটি শুধু কেবল আল্লাহ তায়লার নিকটতম বান্দাদের জন্য। ইহা সাধারণ মানুষের ইচ্ছা ও ইখ্‌তিয়ারের বাহিরের এবং খুব মুস্কিলজনক কাজ। সুতরাং ইতিহাস ও তাফসীরের কিতাবসমূহে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়া লেখা হইয়াছে যে, যখন কাফেরগণ চড়কগাছের সাহায্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আগুনের কুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছিল, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাহার সম্মুখে হাজীর হইয়া আরজ করিলেন— 'আপনার কোন সাহায্যের প্রয়োজন থাকিলে বলুন, আমরা সাহায্যের জন্য প্রস্তুত।' তখন জাবাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিয়াছিলেন, তোমাদেরকে আমার কেন প্রয়োজনে আসিবে? আমি তোমাদের নিকট মোহতাজ নহি। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন— আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করুন। জবাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন– আমার অবস্থার কথা আল্লাহ তা'আলা ভালরূপেই জ্ঞাত আছেন, ইহাই আমার চাওয়া ও আবেদনের জন্য যথেষ্ট। উভয় বাক্য দুইটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিদান করা উচিত। ভাষাবিদ্‌গণের মতে প্রথম বাক্যটি দ্বারা পরিষ্কাররূপে

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কাহারো নিকট হাজত পেশ করার বা আবেদন করার অবৈধতাই বুঝা যায়। এমনকি সেই অপর কোন সত্তা আল্লাহ তায়ালার রাসূলই হোক না কেন? অনুসন্ধিৎসু উলামায় কেরাম ইহার মূলতত্ত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এই কথাও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পরীক্ষার বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় ছিল। আল্লাহ তা'আলা যেমন তাহাকে অন্যান্য বাক্য দ্বারা পরীক্ষা নিয়াছেন, তেমনি এই স্থানেও তিনি তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছেন। যেমন হযরত জিবরীল (আঃ)-এর আগমন এই উদ্দেশ্যেই হইয়াছিল। কেননা হযরত জিব্‌রাইল (আঃ) যখন ইব্রাহীম (আঃ)-এর এহেন অসহায় অবস্থা দেখিলেন, তখন তাহার মধ্য দয়ার উদ্রেক হইলে তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আরজ করিলেন, যদি আপনার হুকুম হয়, তবে আমি ইব্রাহীম (আঃ)-কে সাহায্য করিতে পারিব। তখন জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করার পর তাহাকে সাহায্য কর। এই মহান পরীক্ষাটির উদাহরণ হইল এই যে, যেমন কোন বাদশাহ তাহার বিশেষ মালখানার জন্য কাহাকেও পাহারাদার নিযুক্ত করিল এবং তাহার প্রতি নির্দেশ জারি করিল যে, আমি ব্যতীত এই মালখানার চাবি অপর কাহারো হাতে দিবে না। ইহার পর বাদশাহ তাহার খাস দরবারের কোন এক লোককে পাহারাদারের নিকট প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিল যে, তাহার নিকট হইতে গিয়া চাবি নিয়া আস কিন্তু আমিই যে তোমাকে চাবি আনার জন্য প্রেরণ করিতেছি তাহা বলিবে না। এই সময় যদি পাহারাদার বাদশাহের নির্দেশের উপর দৃঢ় থাকে এবং তাহাকে চাবি না দেয়, তখন বাদশাহ মনে মনে ভাবিবেন, এই লোকই মালখানার চাবি বহনের উপযুক্ত লোক। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র হযরত ইস্‌হাস (আঃ)-এর একান্ত ইচ্ছা ছিল, সে নবী না হইয়া তাহার ভ্রাতা আইস নবী হউক। সুতরাং এইজন্য তিনি কখনোই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আত্মার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই এবং তাহার নিকট দোয়া কবুল হইবার জন্যও দরখাস্ত করেন নাই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও শানের প্রতি লক্ষ্য করুন যে, ছোট ভ্রাতাই (হযরত ইস্‌হাক আঃ) নবুয়তীর মসনদ পাইয়া গেলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা যাহার উপর মর্জি হয় তাহাকেই তিনি তাঁহার রহমতের জন্য বিশেষরূপে নিয়োজিত করিয়া রাখেন। হুয়াল কাহেরু ফাওকা ইবাদেহী' অর্থাৎ তিনি তাঁহার বান্দাদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বিচ্ছেদ বেদনায় হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর যে মর্মান্তিক অবস্থা হইয়াছিল তাহা সমগ্র বিশ্বজগতের কাছে প্রসিদ্ধ। তাঁহার অবস্থা

এমন হইয়াছিল যে, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চক্ষুদ্বয় সাদা হইয়া গিয়াছিল। দিবালোকের আলো বলিতে কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর হইত না। এই কারণ অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়া আলাহ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন—

يَا اَسَفَا عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحَزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ۝

অথচ এই স্থানে তাহার পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও বাপ-দাদাগণের কবর বর্তমান ছিল। কিন্তু তাহাদের কাহারো নিকট তিনি এই বিষয় দরখাস্ত ও হাজত পেশ করেন নাই। বরং তিন শুধু ইহাই বলিয়াছেন, আমি আমার দুঃখ-চিন্তা ও হয়রানী- পেরেশনীর ফল একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটেই জানাইতেছি। যেমন আল কুরআনে এই কথার বর্ণনা উল্লেখ হইয়াছে। এরশাদ হইতেছে—

اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ۔

অর্থাৎ, আমি আমার দুঃখ-চিন্তা ও হয়রানীর কথা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দরবারেই পেশ করিতেছি। (সূরা ইউসুফ)

এখানে 'ইন্নামা' শব্দের উল্লেখ হরফ অর্থাৎ বিশেষকরণের অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। ইহা দ্বারা ইহাই প্রকাশ হয়, গায়রুল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাওয়া তো দূরের কথা নিজের দুঃখ-কষ্ট বর্ণনা করিতেও ইচ্ছুক নয়। বরং তিনি বলিয়াছেন—

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ۔

অর্থাৎ, ইহারা যাহা কিছু বলিতেছে সেই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য চাহিতেছি।

হযরত ইউসুফ (আঃ) জোলায়খার ঘরে থাকাকালে তাহার সম্মুখে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর চেহারার নকশা ভাসিয়া উঠিবার কারণে খারাপ কার্যের ইচ্ছা পোষণ করায় তাহার মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার ফরমান দ্বারা তিনি অনেক ফায়দা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পর কয়েদখানার কঠিন, শাস্তি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে কখনোই হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর আত্মার নিকট সাহায্য কামনা করেন নাই। বরং যাহার গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আকাঙ্খিত ছিল তাহাদের আবেদনও তিনি শ্রবণ করেন নাই। বরঞ্চ তাহাদিগকে তিনি ইস্‌লামের দাওয়াত জানাইয়া বলিয়াছেন—

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۝ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّا اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ

مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ (ط) اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ (ط) اَمَرَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ (ط) ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, হে কয়েদখানার সাথীবৃন্দ! মানুষের জন্য কি বহু উপাস্য থাকা ভাল, না চিরন্তন সত্য এমন একজন উপাস্য থাকা ভাল যিনি হইলেন সকলের চাইতে শক্তিশালী? তোমরা আলাহ তা'আলাকে ছাড়িয়া এমন কতিপয় অর্থহীন নামের ইবাদত করিতেছ, যাহাদিগকে তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদাগণ উপাস্য মনোনীত করিয়া নিয়াছে। তাহাদের মাবুদ বা উপাস্য হইবার অনুকুলে আল্লাহ তা'আলা কি কোন যুক্তি প্রমাণ ও দলিল-দস্তাবেজ নাযিল করিয়াছেন'? হুকুমদানের ও শাসন করার ইখতিযার একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রহিয়াছে। তিনি ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদত না করার জন্য তিনি হুকুম জারি করিয়াছেন। ইহাই হইল তাওহীদের সরল ও সঠিক পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা জানে না ও বুজে না। (সূরা ইউসুফ)

পরকালের বন্দীগণের দুইটি দল

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইলে ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসারী সুফিগণ বলেন, উল্লেখিত আল-কুরআনের আয়াতের বিষয়বস্তু এইদিকে ইঙ্গিত দান করিতেছে যে, পরকালের বন্দীলোকগণ হইবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হইবে ঐ সকল লোক যাহারা টাকা-পয়সা ও স্বর্ণ-পৌপ্যের গোলামে পরিণত হইয়াছে। আল্লাহ্‌র রাসূল ইহাদের প্রতি অভিশাপ দিতে দিয়া বলিয়াছেন—

لَعَنَ اللّٰهُ عَبْدَ الدِّيْنَارِ وَعَبْدَ الدِّرْهَمِ.

অর্থাৎ, দীনার ও দিরহামের গোলামগণের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হোক।

এই হাদীস উল্লেখিত লোকদের প্রতি ঘৃনা ও অপমানিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ দেশের নেতৃবৃন্দ আমীর-উমরাহ ও রাজ-বাদশাহগণ অন্তর্ভূক্ত হইবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ঐ সকল লোক হইবে, যহারা অভিশপ্ত নফসের খাহেসাতের অর্থাৎ প্রবৃত্তির গোলামে পরিণত হইয়াছে। কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন—

اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ.

অর্থাৎ, আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে অবলোকন করেন নাই যে নিজের প্রবৃত্তিকে খোদা মনোনীত করিয়া নিয়াছে। (আল-কুরআন)

আল কুরআনের এই আয়াতটিই এই সম্প্রদায়কে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার জন্য যথেষ্ট। এই দলটির আপাদমস্তক এমন প্রবৃত্তির গোলাম হইয়া উহার দ্বারা শাসিত হইতেছে, যাহা তাহার জন্য চরম শত্রু বিশেষ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন— 'তোমার সবচাইতে বড় দুশমন হইল তোমার নফ্স, যাহা তোমার মধ্যেই অবস্থিত'।

আল-কুরআনের ভাষ্য "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাহারো হুকুম ও শাসন করার ক্ষমতা নাই।" এই কথা দ্বারা এই সম্প্রদায়কে সাবধান ও সর্তক করা হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, 'এই দুনিয়া-মুসলিমগণের জন্য কয়েদখানা বিশেষ এবং কাফেরদের জন্য জান্নাত স্বরূপ।

অর্থাৎ পরকাল হইল কাফেদের জন্য বন্দী শিবির এবং মুসলমানগণের জন্য আরামের স্থান।

মহানবী আম্বিয়াগণের কবরের নিকট সাহায্য প্রার্থী না হওয়ার বিবরণ

রাসূলে করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সালামের জীবনচরিত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কাফেরদের সাথে তাহার বহু ঝগড়া-বিবাদ ও লড়াই করিতে হইয়াছে এবং সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ ও মুসিবতের মোকাবিলা করিতে হইয়াছে। বিশেষ করিয়া তিনি মক্কা শরীফে যখন সহায়হীন ও সম্বলহীন অবস্থায় দিন কাটাইতেন, তখনকার মর্মবিদারী করুণ অবস্থার কথা বর্ণনাতীত। কিন্তু এত বড় জীবন বিনাশী কঠিন বিপদের মধ্যে থাকিয়াও তিনি কখনই তঁহার পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও মিল্লাতে হানাফীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কবর নবী করীম (সঃ) হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া তাহার কবরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে সুযোগ পান নাই। তবে তাহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য আমরা ইহাই বলিব যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কবর নিকটে না থাকিলেও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কবর তো হাতীমে কাবায় ছিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ স্থানে হযরত

ইসমাঈলের কবর অবস্থিত থাকার বিষয়ও অবহিত ছিলেন। সুতরাং এত নিকটে তাহার কবর অবস্থিত থাকিলেও তিনি কেন তাহার কবরের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেন না? আর যেহেতু হিযরতের পূর্বে তিনি হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রাঃ)-এর ধন-সম্পদ পাইয়া বিরাট ধনী হইয়াছিলেন। কিন্তু বিরাট ধন-সম্পত্তির মালিক হইয়াও কখনো হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কবরের উপর নযরতনিয়ায ও মান্নৎ না মানিবার হেতুই বা কি ছিল এবং জীবন বিনাশরূপী বিপদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাহার কবরের নিকট গিয়া দোয়া ও প্রর্থনা করা হইতে তাঁহাকে কে বিরত রাখিয়াছিল? এই ধরনের কাজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে একমাত্র মেরাজের ঘটনার মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুসা (আঃ)-কে কবরে নামায পড়িতে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার নিকট সাহায্যে প্রার্থনা করিয়াছেন বলিয়া এমন কোন বর্ণনা মেরাজের ঘটনার মধ্যে পাওয়া যায় না। বরং সমুদয় ঘটনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাহারই সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছে সে-ই তাঁহার নিকট হইতে ফায়দা লাভ করিয়াছে। যেমন বায়তুল মোকাদ্দাসে নামায পড়ার সময় সকল আম্বীয়াগণের রুহু মোবারক মোকতাদী সাজিয়াছিলেন এবং হুযুর পরনূর (সঃ) হইয়াছিলেন তাহাদের সকরের ইমাম। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল নবী-রাসূলগণকে সর্ব প্রথম সালাম দানের দ্বারা বুঝা যায় যে তিনি তাহাদের সকলের জন্য করিয়াছেন। কেননা সর্ব প্রথম যে সালাম দেয় তাহার তরফ হইতেই যাহাকে সালাম দেওয়া হয় তাহাকে দোয়া করা হয়। আর এই সকল নবী সালামের জবাবের পর শুধু মারহাবা ইবনেস্ সালেহ (হে নেকাকারের পুত্র ধন্যবাদ) বলা এবং হযরত ইদ্রিস (আঃ) সহ অন্যান্য নবী-রাসূলগণ সালামের জবাবের পর শুধু মারহাবার ইবনেস্ সালেহ (হে নেককারের ভাই! ধন্যবাদ) বলা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই সকল আত্মা যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। আর যেই হাদীসটিতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, আমার উম্মতের উপর আল্লাহ তা'আলা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ করিয়াছিলেন। আমি পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের হুকুম বহন করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে হযরত মুসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন- আল্লাহ তা'আলা আপনার এবং আপনার উম্মতের উপর কি ফরজ করিয়াছেন? আমি জবাব দিলাম যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত

নামায ফরজ করিয়া দিয়াছেন। তখন তিনি আমাকে এই পরামর্শ দিলেন যে, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবার ক্ষমতা আপনার উম্মতের হইবে না। আপনি আল্লাহ্র দরবারে গিয়া কমাইয়া নিয়া আসেন। সুতরাং আমি আল্লাহ তা'আলার দরাবারে উপস্থিত হইলে আল্লাহ তা'আলা ইহা হইতে আমাকে অৰ্দ্ধেক কমাইয়া দিলেন। (শেষ হাদীস পর্যন্ত) এই হাদীসটি দ্বারাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন বলিয়া বুঝা যায় না। এই হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুস' (আঃ) আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চমার্গে অবস্থান করিয়াও আল্লাহ তা'আলার মূলতত্ত্ব সম্পর্কে কোন জ্ঞান না রাখার ফলে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে আপনার উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলা কি ফরজ করিয়াছেন? এখানে যদি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্য প্রার্থনা করার কোনরূপ উদ্দেশ্যে থাকিত, তবে তিনি হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকট গিয়া এই কথা বলিতেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের উপর এক বিরাট দায়িত্ব ফরজ করিয়া দিয়েছেন। তুমি আল্লা তা'আলার দরবারে দরখাস্ত করিয়া এই দায়িত্ব কমাইয়া নিয়া আস। তখন মুসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে গিয়া উহা কমাইয়া নিয়া আসিতেন। আর এই হাদীসে যে হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকট দিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গমনের কথা বর্ণিত হইয়াছে উহা হুযুর (সঃ)-এর ইচ্ছাপূর্বক গমন ছিল না। এবং ঘটনাচক্রে তাহার নিকট দিয়া আসিয়াছিলেন। এখানে যদি কবর পূজারী ও পীর পূঁজারী খবীছগণ এই কথা বলে যে, যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের শ্রেষ্ঠ নবী-রাসূলগণের আত্মার অসীলা দিয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনার আবশ্যকতা মনে করেন নাই। বরং তিনি সকল জরুরী ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ঐ সকল আত্মার অসীলা ব্যাতিরেকেই আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন। কেননা যে লোক ঐ সকল আত্মার অসীলা প্রার্থনা করে সে কখনো পয়গম্বরীর পদমর্যাদায় পৌছিতে পারে না। তবে আমরা এই জাহেলদের জবাবে এই কথাই বলিতে চাই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা যদি ইহাই হইয়া থাকে, তবে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-সহ সমগ্র সাহাবাগণ তো আর নবী ছিলেন না। তাহারা তো কখনো তোমাদের নবীর কবরের নিকট দিয়া কোন বস্তুর জন্য আবদার ও আবেদন-নিবেদন এবং হাজত পূর্ণ করার জন্য

দরখাস্ত পেশ করেন নাই। যদি কবরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধ হইত তবে তাহারা দুনিয়ার সর্বোত্তম কবর হুজুর (সাঃ)-এর কবরের নিকট গিয়া সাহায্য প্রার্থনা ও হাজত পূর্ণ করার আবেদন করিতেন। সুতরাং ইহার প্রমাণ যখন নেই, তখন তোমাদের কথা, কাজ ও মতবাদ শির্কী ও বিদয়াত ছাড়া কিছুই নয়।

সাহাবায়ে কেরাগণ নবী করীম (সঃ)-এর কবরের নিকট সাহায্য প্রার্থী না হওয়ার বিবরণ

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর দুই বৎসরের অধিককাল সময় খলীফার আসনে সমাসীন ছিলেন। এই সময় তিনি সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ চিন্তা-হয়রানীর মধ্যে নিপতিত থাকিয়া বাস্তব অবস্থার মোকবিলায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু হাদীস বর্ণনাকারিগণের মধ্যে কেহই এই কথা বর্ণনা করেন নাই যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) অমুক বিপদ বা প্রয়োজনের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন এবং সেখানে গিয়া আবদেন নিবেদন করিয়াছেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) হইতে এই ধরনের শির্কী কাজ প্রকাশ পাওয়ার ধারণা হইতে আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে পানাহ চাহিতেছি আমরা সন্দেহ করা তো দূরের কথা তাহার কালাম দ্বারা পীর পূজা ও কবর পূজার ফেৎনার প্রতিবাদ হইতে দেখিতেছি। তিনি চিরদিনের জন্য কবর পূজা ও পীর পূজার ফেৎনা মূলোচ্ছেদ করিয়া উহা আস্তাকুড়েঁ নিক্ষেপ করিয়াছেন।

নবী করীম (সঃ)-এর ইন্তেকালের ঘটনা

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নশ্বর জগত ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহার বিচ্ছেদ বেদনায় হযরত ওমর (রাঃ) অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমন কি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল ফরমাইয়াছেন এই কথা কাহারো মুখ থেকে তিনি বাহির হইতে দিলেন না'। এই সময় হযরত আবুবকর (রাঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুজরা মোবারক হইতে বহুদূরে একটি মহল্লায় ছিলেন। কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম কোন এক লোককে তাহার নিকট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

ইন্তেকালের সংবাদ পৌছাইবার জন্য প্রেরণ করিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের সংবাদ পাইয়া যেই হুজরায় তাঁহার দেহ মোবারক ছিল সেই হুজরায় প্রবেশ করিয়া ললাটের মধ্যবর্তী স্থানের উপর চুম্বন করিয়া বলিলেন—

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۔

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আপনি মরণশীল এবং উহারা সকলেও মরণশীল।

অতঃপর তিনি মসজিদে উপস্থিত হইয়া সমবেত সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা পাঠ করার পর আল কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইলেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ۔

অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু আল্লাহ তা'আলার রাসূল। তাঁহার পূর্বে আরো বহু নবী-রাসূল এই নশ্বর জগত হইতে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনিও যদি এই জড় জগত ছাড়িয়া চলিয়া যান বা কেহ তাহাকে হত্যা করিয়া শহীদ করিয়া পরপারে পৌঁছাইয়া দেয়, তবে কি তোমরা পিছন ফিরাইয়া দ্বীন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে? অর্থাৎ পয়গম্বরের ইন্তেকালের পর দ্বীনের হক্ব এর উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকা প্রতিটি মুসলমানদের উপর ফরজ। আর যাহারা পিছন ফিরাইয়া দ্বীন ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তাহারা আল্লাহ তা'আলার কিছু পরিমাণও ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় কৃতজ্ঞদিগকে প্রতিদান দিবেন। (সুরা নেসা)

হযরত আবুবকর (রাঃ) এই আয়াত সকল মানুষকে তোলাওয়াত করিয়া শুনাইবার উদ্দেশ্য ছিল তাহাদিগকে দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে তাম্বীহ করা। কোথাও যেন এমন অবস্থার সৃষ্টি না হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের দুঃখ ও চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইয়া তাহারা দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা হইতে বিরত হইয়া যায় এবং গাফলতির শিকারে পরিণত হয়। সকলকে তাহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করার জন্যই তিনি এই কালাম পাঠ করিয়া

শুনাইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত করিত, তাহার জানিয়া রাখা উচিত যে, সে মরিয়া গিয়াছে। আর যাহারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করিত তাহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব অবিনশ্বর। তাহার কখনো মৃত্যু নাই। সুতরাং হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বক্তৃতা শুনিয়া হযরত উমর (রাঃ)-এর মধ্যে চেতনা ফিরিয়া আসিল। তিনি তাহার আশ্চর্যজনক হেদায়েত শুনিয়া চমকিত হইয়া গেলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলেন— আল কুরআনের উল্লেখিত আয়াতটি আমাদের স্মৃতি শক্তির বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কণ্ঠে ঐ আয়াত শ্রবণ করার পর আবার আমাদের স্মৃতি শক্তির ভাণ্ডার ঐ আয়াতের রসে ভরপুর হইয়া উঠিল।

পীর পূজার মূলোচ্ছেদে সাহাবাগণের কর্মপন্থা

হযরত উমর (রাঃ)-এর কর্মপন্থা দ্বারা পীর পূজা ও কবর পূজার মূলোচ্ছেদ হইয়া বুযুর্গানে দ্বীনের পরিত্যাক্ত এবং তাহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুর প্রতি সীমাতিরিক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদনের বিদ্‌য়াতকে বিদূরীত করিয়া দেয়। যেমন হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এরশাদ করিয়াছেন— 'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মৎগণ আম্বিয়াগণের পরিত্যাক্ত বস্তু ও স্মৃতি চিহ্নসমূহের অনুকরণ এবং সেই সকল স্থানে গীর্জা ও উপাসনালয় নির্মাণ করার কারণেই হালাক ও বরবাদ হইয়া গিয়াছে।'

এই বর্ণনাটি ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি এই ব্যাপারে খুব সতর্ক দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মিম্বরটির উপর দণ্ডায়মান হইয়া খুৎবা দিতেন হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) হুজুরের প্রতি আদবের খেয়াল রাখিয়া সেই মিম্বরখানা ছাড়িয়া উহার নীচে আর একখানা সিড়ি গাঁথিয়া তাঁহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া খুৎবা দিতেন। এইসব ঘটনা তাহাদের থেকে ঘটনাচক্রে ঘটিয়া গিয়াছে নতুবা অভ্যাস ও ইবাদতের সাথে তাহার কোনই সম্পর্ক নাই। যদি তাহাই হইত, তবে হযরত ওসমান (রাঃ) সমগ্র সাহাবাগণের তুলনায় অধিক লাজুক ও বিনয়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের যেই সিড়ির উপর দণ্ডায়মান হইয়া খুৎবা দিতেন সেই সিড়ির উপর দাঁড়াইয়া খুৎবা দিতে সাহস করিতেন না।

যদিও কতিপয় উলামায়ে কেরাম ইহার এই হিকমত বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর দণ্ডায়মান হইবার সিড়ির পরে আর কোন সিড়ি জুড়িয়া দেওয়ার স্থান ছিল না বলিয়া তিনি আদব রক্ষা করিতে সমর্থ না হইয়া রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিড়ির উপর দণ্ডায়মান হইতে সাহস পাইয়াছেন। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু উলামায়ে কেরাম উহার হিকমতের কথা বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবুবকর ও উমর (রাঃ)-এর কর্মনীতির বিরোধিতা করিতে এইজন্য সাহস করিয়াছেন যেন পরবর্তীকালে বুযুর্গানে দ্বীনের বসার স্থান ও থাকার জায়গার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য কোনরূপ দলিল প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ অবশিষ্ট না থাকে এবং শিরকে খফী বা অপ্রকাশ্য শির্‌ক ও পূজার দ্বার খুলিয়া না যায়। এই ফেৎনা খুবই দুষ্ট ও অনিষ্টকারী ফেৎনা। পূর্ববর্তী লোকগণের মধ্যেও প্রথমতঃ এই ফেৎনারই উদ্ভব হইয়াছিল। যাহার ফলে উহারা—

أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ (আল্লাহ তা'য়ালাকে ছাড়িয়া অপরাপর সত্তাকে প্রভু মনোনীত করা)-এর প্রবক্তা হইয়া তাহাদের উপাসকে পরিণত হইয়াছিল। আর উম্মতে মুহম্মদীয়ার মধ্যেও উপাসকে পরিণত হইয়াছিল। আর উম্মতে মুহম্মদীয়ার মধ্যেও এই ফেৎনার উদ্ভব হইবার কথা নিশ্চিতরূপে জানাইয়াই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—

وَاللّٰهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔

অর্থাৎ, আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমরা আমলের দিক দিয়া ঐ সকল লোকের তরীকা ও পেশা গ্রহণ করিয়া ফেলিবে যাহারা তোমাদের পূর্বে চলিয়া গিয়াছে।

এমনকি কোন কোন বর্ণনায় শেরবান শব্দেরও উল্লেখ রহিয়াছে। অর্থাৎ সাবেক উম্মতগণের মধ্যে যেই পরিমাণ গুনাহর কাজের উদ্ভব হইয়াছিল সেই পরিমাণ গুনাহর কাজ নিশ্চিতরূপে তোমাদের মধ্যেও উদ্ভব হইবে। আল্লাহর শোকর যে, এই ফেৎনার আশঙ্কা হয়ত ওসমান (রাঃ)-এর কর্ম দ্বারা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতের যুগে এই ধরনের যাবতীয় ফেৎনা ফাসাদ এমনকি ইহার চেয়েও অত্যাধিক দুষ্ট ধরনের ফেৎনারও অবসান হইয়াছিল। সেই মানবতা বিধ্বংসী ফেৎনাটি হইল তখনকার যুগে সাধারণ মানুষ নিজেদের ইমাম ও নেতাগণের কথার কোনরূপ বাদ-বিচার না করিয়া বিনা

দ্বিধায় তাহা গ্রহণ করিয়া নিত। তাহারা উহা শরীয়ত মাফিক কিনা শরীয়তের পরিপন্থী তাহা চিন্তা ভাবনা না করিয়াই কার্যকরী করিতে লাগিয়া যাইত। আর ইহাই হইল— اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

ইমাম চতুষ্টয়ের অন্যতম ব্যক্তি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ) সহ ইমাম তাহাবী আবুবকর ইবনে শাইবা ও ইবনে আব্দুল বররা (রাঃ) তাহাদের কিতাবসমূহে উল্লেখ করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল ছিল যে তিনি মিনায় অবস্থানকালে চারি রাকআত নামাযের স্থলে দুই রাকআত কছর পড়িয়া নামায আদায় করিতেন। হযরত ওসমান (রাঃ) মদীনা হইতে হজ্ব করিবার জন্য যখন বায়তুল্লাহ শরীফে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি মিনায় অবস্থান কালে সাহাবায়ে ক্বেরামগণের সকলকে নিয়া পূর্ণ চারি রাকাআত নামাযই আদায় করিলেন। আর দুই রাকআত যে চারি রাকআতের অন্তর্ভূক্ত তাহা নিশ্চিত কথা। কিন্তু এই সময় তিনি মুসলিম জাহানের খলিফা হওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম তাহার এই কাজের সমালোচনা করিতে গিয়া হযরত ওসমান (রাঃ) এর যবান মোবারক হইতে সম্মত ওযর শুনিতে পাইয়া নিশ্চুপ হইয়া পড়িলেন। আর সেই ওযরটি হইল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা শরীফে মোসাফির রূপে গিয়াছিলেন। আর হযরত ওসমান (রাঃ) নব বিবাহ করা এবং পরিবার পরিজনসহ সেখানে অবস্থান করার কারণে তিনি মুকিম ছিলেন,। মুকিম হওয়া অবস্থায় যে নামায পূর্ণ করিয়া পড়া ওয়াজিব হয় সেই ব্যাপারে সকল উলামায়ে কেরাম একমত।

উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা আমরা পরিষ্কাররূপে ইহাই প্রমাণ পাইতেছি যে, নিজেদের ইমাম ও নেতাগণের দ্বারা সুন্নাতে রাসূলের খেলাফ কোন কাজ হইলে তাহার প্রতিবাদ ও সমালোচনা করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব। ঐ অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া সাহাবায়ে কেরামগণের জীবনাদর্শ ও তরীকার সম্পূর্ণ পরিপন্থী কাজ।

উবাই মোনাফেকের জানাযার ঘটনা

পীর-পূজারকগণ অযৌক্তিক ও শরীয়ত অসমর্থিত ওযর-আপত্তি পেশ করিয়া বলিয়া থাকে যে, পীরের হুকুম ও আদেশ বিনা উচ্চবাচ্যতে মানিয়া নেওয়া এবং তাহা কার্যকরী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা প্রতিটি মুরীদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য ও ওয়াজিব। যেমন কোন কবি বলিয়াছেন—

اگرشاه روزرا اگويد شب است اين *
بيا يد گفت اينك ماه وپروين -

তাহাদের এই ওযর অযৌক্তিক ওযর। এই ফেৎনার অবসান করাইবার সহযোগী দলীলরূপে আমরা হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর জীবনের সেই কর্ম চরিত্রটিকে দেখিতে পাই, যাহার সত্যতা ও যৌক্তিকতার সমর্থনে আলকুরআনে আয়াত নাযিল হইয়াছে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফিকের মৃত্যুর পর তাহার মুসলিম সন্তান আবুদল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন— ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আব্বাজানের কবরের কাছে যাইয়া তাঁহার মাগফেরাতের জন্য একটু দোয়া করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাহার কবরের নিকট গিয়া মাগফেরাতের জন্য দোয়া করার ইচ্ছা করিলে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তাঁহার চাদর মোবারক নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া আরজ করিলেন— ইয়া রাসূলাল্লাহ! মোনাফিকগণের কবরের নিকট আপনি দাঁড়াইবেন না এবং তাহাদের জন্য কোনরূপ দোয়াও করিবেন না। কারণ ইহারা আল্লাহ তা'আলার দুশমন। এই সময় হযরত ওমর (রাঃ)-এর কথার প্রতি জোর সমর্থন জানাইয়া আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে মজীদে এই আয়াত নাযিল করেন—

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَا تُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ -

অর্থাৎ, ঐ মোনাফিকদের মধ্যে যাহাদেরই মৃত্যু হউক না কেন, তাহাদের জন্য আপনি দোয়া করিবেন না এবং তাহাদের কবরের নিকটও দাঁড়াইবেন না। কেননা তাহারা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের সাথে কুফরী করিয়াছে। আর তাহাদের মৃত্যুও হইয়াছে কাফেরী ও ফাসেকী অবস্থায়। (সূরা তাওবা)

সুতরাং হযরত উমর ফারুক (রাঃ) যখন আল্লাহর রাসূলকে মানা করিবার অধিকার রাখিয়া থাকেন, তবে অন্যান্যাদের কি অধিকার থাকিতে পারে চিন্তা করুন। হযরত উমর (রাঃ)-এর এহেন কর্মপন্থার জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কখনো রাগান্বিত বা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কোথাও এমন কোন

প্রমাণ বর্তমান নাই। বরং আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তাহার প্রতি তিনি খুশি ও সন্তুষ্ট ছিলেন। সুতরাং ইহার দ্বারা ইমাম নেতা পীর মোরশেদ ও শায়েখ বুযর্গদের কথা ও কাজ শরীয়তের বিরোধী হইলে ইহার সামলোচনা ও প্রতিবাদ করার অধিকার আরো বেশী জোড়ালোভাবে প্রমাণিত হয়।

সুন্নাত-ই একমাত্র মাপকাঠি

বুযর্গ ও শায়খ মোর্শেদগণের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাহাদের প্রতি আদব রক্ষা করিতে গিয়া সীমা অতিক্রম না হয় সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য্য কর্তব্য। আর তাহাদের আনুগত্য ও পায়রবীকে সুন্নতের অনুকরণ ও পায়বীর উপর যাহাতে প্রধান্য দেওয়া না হয়, সে বিষয়ও তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখা উচিত। কেননা ঈমানদারগণের জন্য সুন্নাৎ তরীকার উপর পীর মোর্শেদ ও ইমাম নেতাগণের কথা ও কার্জকে প্রাধান্য দেওয়া খুবই খারাপ কাজ। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমাইয়াছেন—

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا -

অর্থাৎ, যাহারা মুমীনগণের কর্মপন্থা ও তরীকার বিরুদ্ধবাদী মত-পথ ও কর্মপন্থার পায়রবী করে আমি তাহাগিকে ঐ সকল লোকদের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকি, যাহাদের সাথে তাহাদের বন্ধুত্ব রহিয়াছে আর আমি তাহাদিগকে জাহান্নামে পৌছাইয়া দিব। ঐ প্রত্যাবর্তনের স্থানটি খুবই খারাপ ও ভায়াবহ স্থান। (সুরা নেসা)

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলিয়াছেন –'যে কথা বলা হইয়া থাকে উহার প্রতি দৃষ্টি কর। বক্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিও না।' তাঁহার এই বাণীটিও আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের জন্য যথেষ্ট। আমাদের ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, তাহারা এই ফরমানটি এমন পূর্ণাংগ ও তাৎপর্যপূর্ণ ফরমান যাহা কিয়ামতের দিন মানুষের জন্য ফলপ্রসূ বলিয়া প্রমাণিত হইবে। দাজ্জাল বাহির হইবার সময় যাহারা এই ফরমানটির উপর আমল করিবে না— তাহারা এই অভিশপ্তের দ্বারা সংগটিত অস্বাভাবিক ঘটনাবলী দর্শন করিয়া গোমরাহীর জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে এবং দোযখের অংশটিকে বেহেস্ত মনে করিয়া উহার

সহযোগীদের দলভুক্ত হইয়া পড়িবে। আর যাহারা এই ফরমানটিকে কার্যকরী করিয়া চলিবে, তাহারা দাজ্জালের দাগাবাজী হইতে রেহাই পাইয়া যাইবে। যেমন বুখারী ও মোসলেম শরীফের হাদীসে দাজ্জালের কথা উল্লেখ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে—দাজ্জাল মদীনা শরীফের নিকটে কোন অনুর্বর ভূমিতে যখন অবস্থান করিতে থাকিবে তখন তাহার নিকট একজন খুব উত্তম লোক আসিয়া তাহাকে বলিবে—আমি সাক্ষ্য দিতেছি এবং পরিষ্কাররূপে ঘোষণা দিতেছি যে, তুমিই সেই দাজ্জাল, যাহার কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার ভাবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। তখন দাজ্জাল তাহার দলের উপস্থিত লোকদের নিকট বলিবে, আমি যদি এই লোকটিকে হত্যা করিবার পর জীবিত করিয়া দিতে পারি, তবে কি আমার বেলায় তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিবে? তখন তাহার অনুসারিগণ বলিবে, না কোনই সন্দেহ থাকিবে না। সুতরাং দাজ্জাল ঐ লোকটিকে হত্যা করিয়া জীবিত করার পর ঐ লোকটি বলিবে— 'এখন আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হইয়াছে যে, তুমিই সেই দাজ্জাল যাহার সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছেন। অতঃপর এই লোকটিকে আবার হত্যা করার জন্য দাজ্জাল পূর্ণ প্রচেষ্টা চালইয়াও কিন্তু সফল হইতে পারিবে না। আল্লাহ্‌র শোকর যে ঈমানদারগণ তাহাদের ঈমানকে কোন অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার উপর নির্ভরশীল বলিয়া মনে করে না। যদি তাহাই হয়; তবে দাজ্জালের আবির্ভাবের যমানায় কোন লোকই কুফরীর হাত হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ এমন যুগে ও সময় আমাদের জন্য ঐ সকল লোকদের কথা ও কাজকে গ্রহণ করিয়া তাহার স্বীকৃতি প্রদান করিতে হইবে, যাহার কথা ও কাজ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণের কথা ও কাজ মাফিক হইবে। অন্যথায় তাহাকে আমাদের প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে এবং তাহার আমল হইতে দূরে থাকিতে হইবে। আর তাহাকে কোনরূপ দলিল মনে করা যাইবে না। এই ফেৎনা ফাসাদের যমানায় এই কাজ ঈমান বাঁচাইবার জন্য আমাদের প্রতি ওয়াজিব।

সুফীগণের মতে পীরের কথা ও কাজ ইসলামের দলীল নয়

সুলতানুল মাশায়েক হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর অন্যতম বিশিষ্ট খলিফা শায়খুল ইসলাম নাসিরুদ্দীন মাহমুদ (রঃ) যিনি 'চেরাগের দিল্লী' নামে মশহুর ছিলেন, তিনি বলিলেন 'পীর মুর্শেদ ও শায়খ বুযুর্গদের কথা ও কাজ

শরীয়তের দলিল নয়।' যাহারা এই কথার সমালোচনা করিয়াছে তাহাদের জবাবে সুলতানুল মাশায়েখ হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) বলেন— ইহাই হক্ক কথা। অর্থাৎ তাহাদের কথা ও কাজ ইসলামের দলিল নয়। আর মাশায়েখগণের জীবনেতিহাস 'সীয়ারে মাশায়েক' কিতাবে লিখা আছে যে একদিন শায়খ শিহাব উদ্দিন উমর সরোয়ার্দ্দী (রঃ) নামায পড়ার জন্য নিজ বাড়ীর বাহিরে গমন করিয়াছিলেন। এই সময় তাহার মুরীদগণ অজু করিবার কাজে নিয়োজিত ছিল। শায়খকে দেখিয়া তাহারা তাড়াহুড়া করতঃ ওজুর কাজ সমাধা করিয়া শায়খের তাজীমের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু একজন মুরীদ বিশেষ কোন তাড়াহুড়া না করিয়া ধীরস্থির ভাবে পূর্ণভাবে ওজুর কাজ সমাধা করিয়া শায়খকে আসিয়া সালাম করিল। তিনি মুরীদের সালামের জবাব দিয়া বলিলেন—মিয়া খুব ভাল কাজ করিয়াছ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের তাজীমের উপরে সৃষ্টির তাজীমকে প্রাধান্য দেও নাই। এই জন্য তুমি ধন্যবাদের পাত্র। মানুষের বুঝ ও উপলব্ধির জন্য এই আদবের তুলনায় সর্বোচ্চ আদব হইল ইহাই, যাহা হাদীস বর্ণনাকারীগণের মুখ থেকে নিঃসৃত হইয়াছে। বর্ণিত আছে যে, 'ইয়ামন দেশ হইতে একদল লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মোলাকাত করার জন্য মদীনায় পর্দাপণ করিয়াছিল। তাহারা মদীনায় উপস্থিত হওয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় চেহারা অবলোকন করিয়া বিমোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সওয়ারী হইতে অবতরণ করিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইল। কিন্তু এই দলের লোকদের মধ্যে একজন সাহসী লোক ইহা না করিয়া সে প্রথমতঃ মসজিদে নববীতে গিয়া দুই রাকায়াত নামায আদায় করিল। ইহার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবার মোবারকে সে উপস্থিত হইলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহার প্রতি এই কাজের জন্য খুবই খুশি হইয়া গেলেন।

এই ধরনের বহু হাদীস ও ঘটনাবলী সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও শায়খ মাশায়েখগণের জীবন চরিতের পুস্তকের মধ্যে উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং তাহাদের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তিশ্রদ্ধা ও আদব পোষণ কখনোই সমীচীন নয়। আর তাহাদের কথা, কাজ ও অবস্থাকেও কখনো ইসলামের দলিলরূপে মানিয়া নেওয়া ঠিক হইবে না। কেননা ইসলামে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনগণের কথা ও কার্যাবলীই দলিল ও মাপকাঠী রূপে নির্ধারিত হইয়া থাকে।

অজ্ঞতাই মূল ব্যাধি

মূল কথা হইল মানুষের অজ্ঞতা ও দ্বীনী ইল্মহীনতাই তাহাদিগকে বরবাদ করিয়া দিয়াছে। এলেমের প্রশংসা করিতে গিয়া পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিতেছেন—

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ ط اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوْا اُوْلُوا الْاَلْبَابِ۔

অর্থাৎ, যাহারা দ্বীনী এলেমের অধিকারী এবং যাহারা অধিকারী নয়, তাহারা কি মর্যাদার দিক দিয়া মহান (কখনো হয়)। জ্ঞানী লোকেরাই নসীহত গ্রহণ করিয়া থাকেন। (সূরা যুমুর)

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রজব মাসের কোন এক রাত্রে মসজিদে নববীতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) আল-কুরআনের এই আয়াত বার বার পাঠ করিতেছেন এবং কাঁদিতেছেন—

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মুমিনগণের নিকট হইতে জান্নাতের বিনিময়ে তাহাদের জানমাল খরিদ করিয়া লইয়াছেন।

আর হযরত আলী (রাঃ) ইহা বারবার পাঠ করিয়া আহাজারী করিতেন।

দ্বীনি ইল্ম এমনই একটি মূল্যবান বস্তু যে, এই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে তাহার নিকট ইল্ম লাভ করার জন্য দোয়া করিতে শিক্ষা দিয়াছেন— رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

অর্থাৎ, হে পরওয়ারদিগার! আমার দ্বীনি ইল্ম ও জ্ঞানের ভাণ্ডার বর্দ্ধিত করিয়া দিন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র এরশাদ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর দ্বীনি ইল্ম অর্জন করা ফরজ। আল্লামা শেখ শাদী শিরাজী (রঃ) বলিয়াছেন—

چو شمع ازپئے علم باید گد اخت *

که بے علم نتوان خدار اشناخت ۔

অর্থাৎ, পঙ্গপাল যেমন আলোর জন্য পাগল হয়, অনুরূপ তোমরাও দ্বীনী ইল্‌ম অর্জন করার জন্য পাগল হইয়া যাও। কেননা, দ্বীনী ইল্‌মহীন অজ্ঞ লোকেরা আল্লাহ তা'আলাকে চিনিতে পারে না।

সাবধান! এমন কতিপয় জাহেল সুফী রহিয়াছে যাহাদের দ্বীনী এলেমের সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক নাই এবং তাহাদের সম্পর্কে এই কথা বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহারা দ্বীনী এলেমের বুঝ জ্ঞান অর্জন না করিয়া তাসাউফের পোশাক পরিধান করে তাহারা জীন্দিক। তাই সকল লোক 'রাব্বী যিদনী ইল্‌মা' আয়াতের সাথে হাদীস মিলাইয়া তাহার ব্যাখ্যা পরিবর্তন করিয়া দেয়। আর তাহারা বলিয়া থাকে যে, ইহা একটি অন্যান্য ধরনের ইল্‌ম। ইহা ছীনায় ছীনায় স্থান পরিবর্তন হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। এই বাহানাও চক্রান্ত দ্বারা তাহারা বহু লোককে গোমরাহ্ করিয়াছে এবং হেদায়েত ও আল্লাহ্‌র মারেফাৎ লাভের স্বচ্ছ পন্থাটি মানুষের নিকট সন্দেহযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই মানবরূপী শয়তানের দাগাবাজী হতে পানাহ চাহিতেছি যাহারা মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দেয়। এই বদবখত সম্প্রদায়টি যে ইল্‌ম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরজ করিয়া দিয়াছেন, সেই ইল্‌মকে অর্থহীন ও আজে-বাজে বিষয় বর্ণনা করিয়া থাকে। আর তাহারা বুযুর্গদের বিভিন্ন অর্থবোধক কবিতা আবৃতি করিয়া এবং বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী কুরআনের আয়াত ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের বিকৃত অর্থ করিয়া এমন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়া ঐ বুযুর্গানদের নিকট হইতে তাহা নকল করিয়া তাসাউফের শিক্ষানবীশগণকে হয়রান করিয়া বেড়ায়।

علم حو در علم صوفی کم شود *

این سخن کے بادر ے مردم شود ۔

এই কবিতাংশ তো ফার্সি ভাষাবিদগণের জন্য। ইহাদের মধ্যে সাধারণ কিছু আরবী ফার্সি জানলে ওয়ালা লোক এই সকল কালাম নিজেদের দাবীর অনুকূলে এই জন্য পেশ করিয়া থাকে, যেন জাহেল ও দ্বীনী ইল্‌মহীন লোকেরা তাহাদের অনুগত ও তাবেদার হইয়া যায়। তাহাদের সেই মনগড়া আরবী বাক্যগুলি হইল এই—

(١) اَلْعِلْمُ هُوَ الْحِجَابُ الْاَكْبَرُ ۔

(٢) اَلْجَهْلُ عِنْدِیْ اَحَبُّ مِنَ الْعِلْمِ ۔

তাহারা এই আরবী বাক্যগুলির অর্থ জাহেল লোকদের নিকট এইরূপভাবে পেশ করে যে, 'ইল্‌ম (মানুষের জন্য আল্লাহর মারেফত লাভের পথে) বিরাট পর্দা বিশেষ। ইহার চেয়ে জাহেলীপনা ও অজ্ঞতা আমার নিকট খুবই প্রিয়।' তাহাদের এই ধরনের মিথ্যা আজে-বাজে কথা আল্লাহ্‌র নবী ও সাহাবাগণের কাহারও থেকে বর্ণিত হয় নাই; বরং ইহা হইল পরবর্তীকালের সুফীগণের বাণী! তাহারা ইহার দ্বারা নিজেদের মুরীদগণকে এই দিকে ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, আমি আপাদমস্তক এলেমের বিমূর্ত প্রতীক হইয়া গিয়াছি। ইহা আল্লাহ তা'আলার ইল্‌ম অর্জন হইতে পারি না। আর দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা তাহারা এই দিকে ইঙ্গিত দান করিয়াছে যে, ইল্‌ম অর্জন করার পর আরেফগণের মানসিক অবস্থার বেলায় অজ্ঞতার যে স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় ইহা সেই ইল্‌ম হইতে অনেক উত্তম যাহা ইতিপূর্বে অর্জিত হইয়াছে। সুলতানুল আওলিয়া শায়খ ইব্রাহীম বিন আজম, যাহাকে শীর্ষস্থানীয় আওলীয়াগণের মধ্যে গণ্য করা হয়, তিনি বহু বৎসর পরকালীন ইল্‌ম ও মারেফত অর্জনের জন্য কষ্ট সাধনায় কাটাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন—

هو کر ل من ز علم محروم نشد *

کم بو زا سراز که مفهوم نشد

هفتدر سال سعی کردم شب روز *

معلوم شد که هیچ معلوم نشد ۔

অর্থাৎ, আমার অন্তঃকরণ কখনো দ্বীনী ইল্‌ম হইতে দূরে থাকে নাই। কিন্তু ইহার মূলতত্ত্ব রহস্য কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বৎসরের পর বৎসর দিবারাত্রি দ্বীনী ইল্‌ম অর্জন করিবার জন্য কাটাইয়া দিয়া ইহাই বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি দ্বীনী ইল্‌মের কিছুই অবগত হইতে পারি নাই।

এই বুযুর্গের এই কথাটি দ্বারা মনে হইতেছে যে, ইহা مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ বাক্যের সঠিক তরজমা। আমাদের একটু সুবিচারী দৃষ্টিতে

অবলোকন করা উচিত যে, বুযুর্গানে দ্বীনের কথা এবং এই সকল স্বার্থপর লোলুপ ভেড়ার দলের কেঁচামেচি ও বানোওয়াটি কথাগুলি যাহা জাহেল ও মূর্খ লোকদের নিকট হইতে নজর-নিয়াজ অসুল করার জন্য বলিয়া থাকে— আকাশ-পাতাল ব্যবধান। এই সব লোকের মধ্যে শায়খ সদু হইল অন্যতম ব্যক্তি। সে দ্বীনের পথে মানুষের জন্য বাঁধা ও কাঁটা বিশেষ। ইহা ছাড়া সে তাছাররুফের (নিজ ক্ষমতায় কিছু করার) দাবীদার। সে এমনিভাবে শরীয়ত বিরোধী শিরক বিদয়াতের আশ্রয় নিয়া মানুষের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইমাম মুসলিম তাহার কিতাবে হাদীস শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের নিকট হইতে ইল্‌ম ছিনাইয়া নিয়া ইল্‌ম শেষ করেন না বরং উলামায়ে কেরামগণের রুহ কবজ করিয়া ইল্‌ম উঠাইয়া নিয়া যান। অবস্থা এমন পর্যায় পৌঁছিবে যে, দুনিয়ায় কোন আলেম জীবিত থাকিবে না। তখন মানুষ জাহেল লোকদেরকে নিজেদের ইমাম ও নেতা মনোনীত করিয়া নিবে এবং মানুষ তাহাদের নিকট বিভিন্ন মাস্‌য়ালা জিজ্ঞাসা করিবে। আর তাহারা বিনা এলেমেই ফতুয়া দিয়া যাইতে থাকিবে। ফলে নিজেরা যেমন গোমরাহ হইবে তেমনি জনগণকে গোমরাহ করিয়া ফেলিবে। হে খোদা ! আপনার নিকট দ্বীনের পথ হইতে দূরে চলিয়া যাওয়া থেকে পানাহ চাহিতেছি।

ইয়াহুদীগণ অভিশপ্ত হইবার কারণ

আল কুরআনের ভাষা দ্বারা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, দ্বীনের মধ্যে নূতনত্বের আবিষ্কার এবং নানাবিধ আজে-বাজে রোস্‌ম-রেওয়াজ কুসংস্কার বিশেষ। আহলে কিতাবগণ দ্বীনের ভিতর এমনি নূতনত্ব ও কুসংস্কারের প্রশ্রয়ের ফলেই আল্লাহ্‌র পথ হইতে গোমরাহ হইয়া ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মোহাম্মদীকে সাবধান করার জন্য আহলে কিতাবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ -

অর্থাৎ, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের মধ্যে অন্যায়ভাবে নূতনত্ব ও আজে-বাজে রোসম-রেওয়াজের জন্ম দিওনা আর তোমরা ঐ সকল লোকদের খেয়াল খুশি মত চলিও না, যাহারা পূর্ব হইতেই নিজদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়া

ফেলিয়াছে এবং অনেক মানুষকেও পথভ্রষ্ট করিয়াছে! তাহারা সরল সহজ পথ হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। (সূরা আল মায়েদা)

এখানে মূল কথা হইল যে, মানব প্রবৃত্তির পায়রবী করিয়া চলাই হইল গোমরাহীর মূল কারণ— চাই সেই প্রবৃত্তি নিজের হউক বা অপর কোন লোকের হউক। সুতরাং মানব বৃত্তিনিচয়ের পায়রবীকে সর্বদাই পরিহার করিয়া চলা উচিত। দ্বীনের মধ্যে কোন কিছু নুতনত্ব ও আজে-বাজে রোস্‌ম রেওয়াজের প্রথা চালু না করা এবং প্রবৃত্তির অনুগত হইয়া না চলাই হইল দ্বীনের পথের পথিকগণের জন্য সরল সহজ পথ। যেমন বর্তমান যুগের লোকেরা এই দুষ্ট ফেৎনার মধ্যে নিপতিত রহিয়াছে। আর সেই উলামায়ে দ্বীনের ফরমান ও নির্দেশকে অমান্য করিয়া চলিতেছে যাহাদের সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন— 'আমার উম্মতের আলেমগণ ইসরাঈল বংশীয় নবীগণের ন্যায়।' আর তাহারা পথ ভ্রষ্টতা ও সরল-সহজ পথ হইতে বিপথে চলিয়া যাওয়ার উপকরণাবলী হইতেও বিরত থাকে না। বনী ইসরাঈলগণ এই কর্মপন্থা ও উপকরণাবলী গ্রহণ করার পরিণতিতেই গোমরাহ হইয়াছিল। পবিত্র কালামে মজীদে তাহাদের আলোচনা করিয়া আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন—

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ - كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ -

অর্থাৎ, বণী ইসরাঈলগণের মধ্যে যাহারা কাফের ছিল তাহাদের উপর লানৎ করা হইয়াছে। এই লানৎ হইয়াছে হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত ঈসা বিন মরিয়ম (আঃ)-এর যবানীতে। তাহাদের প্রতি এই লানৎ বর্ষণের কারণ হইল যে, তাহারা আল্লাহ্‌র হুকুমের খেলাফ করিয়া সীমা অতিক্রম করতঃ খারাপ কাজে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর তাহারা যে খারাপ কাজ করিত, সে সম্পর্কে একে অপরকে বিরত রাখিত না। বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের কর্মজীবন খুবই খারাপ ছিল। (সূরা আল মায়েদা)

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা পরিষ্কাররূপে জানা যায় যে, এই গোমরাহীর মূল কারণ হইল শরীয়ত গর্হিত কাজ হইতে বিরত না থাকা। ফলে তাহারা হালাক ও

বরবাদ হইয়া গিয়াছে। কেননা তাহাদের অন্তঃকরণে শরীয়ত গর্হিত ও দুষ্ট কাজের প্রতি ভালবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহারা এই সব খারাপ কাজকে মোবাহ ও বৈধ মনে করিত। নবীগণ এবং নবীগণের আসহাবগণ যখন তাহাদিগকে এই দুষ্ট কাজ করিতে বাঁধা দিল, তখন ইহারা তাহাদের কথার অবাধ্য হইয়া লানতের পাত্রে পরিণত হইয়া পড়িল। ইহারা শনিবারের দিন টাল-বাহানা করিয়া শিকার করাকে বৈধ মনে করিত ফলে হযরত দাঊদ (আঃ) তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র লানৎ বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আর আসমান হইতে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জন্য যে উপঢৌকন নাযিল করিতেন তাহা চুরি করিয়া ধনী লোকদের নিকট বিক্রয় করিত। যাহার ফলে তাহাদিগের প্রতি হযরত ঈসা (আঃ) লানৎ করিয়াছিলেন। এখন থেকে ইহাও পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হয় যে, কুরআন হাদীসের বিপরীতধর্মী কাজ করা এবং টাল-বাহানা করিয়া শরীয়তের খেলাফ কাজকে মোবাহ করিয়া নেওয়া শুধু কেবল বিরাট কবীরাহ গুণাহই নয় বরং আল্লাহ তা'আলার লানৎ বর্ষিত হইবার কারণও বটে। ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতে শরীয়ত বিরোধী ও গুণাহর কাজকে বৈধ ও হালাল মনে করাও কুফরীর মধ্যে এক শ্রেণীর কুফরী। সুতরাং যাহারা হযরত আবু বকর ছিদ্দিক ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর প্রতি দুষ্ট মনোভাব পোষণ করিয়া তাহাদিগকে ভৎর্সনা করাও কুফরী বলিয়া মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

নূতন পুরাতন মুশ্‌রিকগণের তরীকা

এখন আমি আবার সাবেক উদ্দেশ্যের পানে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। প্রাচীন ও বর্তমান যুগের মুশ্‌রিকগণ যে সব ক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকে সেই কার্যকলাপই পীর পূজারী, কবর পূজারী, মূর্তি পূজারী, ছবি পূজারী ও বুযুর্গানে দ্বীনের পরিত্যাক্ত বস্তুর পূজারী লোকদের দ্বারা হইয়া থাকে। তাহাদের আকিদা বিশ্বাস ও তৌর তরীকাই হইল ইহাদের আকিদা বিশ্বাস ও তৌর তরীকা। ইহাদিগকে যখন এই সব শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের অনিষ্টতা ও ফলাফলের কথা বলা হইত তখন এমনিভাবে জবাব দিয়া থাকে যেমনি মোশরেকগণ আল্লাহ তা'আলার রাসূলগণকে জবাব দিয়াছিলেন। অতঃপর ইহারা জাহেল মুর্খ লোকদের কাছে গিয়া এই কথা বলে যে,"আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের সব চাইতে নিকটতম উত্তম পথ হইল পীরের সেবা করা। মৌলবাদীরা যে সর্বদা হক্ক হক্ক করিয়া বক বক করিতে থাকে, ইহা দ্বারা মানুষকে আরও খারাপ করিয়া দিয়াছে। তাহাদের

কথায় আদৌ কর্ণপাত করা উচিত নয়। আর পীরের কথা ও আদেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য তাহা মনের মধ্যে স্থায়ীরূপে গাঁথিয়া রাখা উচিত যেন তাহা কখনো মন হইতে দূরে চলিয়া না যায়। আর হানাফী শায়াফীদের কথা ও তর্ক-বিতর্কের জালে যাহাতে আবদ্ধ হইয়া না পড় সে দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। কেননা— বুজুর্গান বলিয়াছেন যে, সুফীগণের জন্য কোন মাযহাব হয় না।"(নাউজুবিল্লাহ)

কতিপয় শীর্ষস্থানীয় সুফীগণের মাযহাব

আমাদের ইহা মনে রাখা উচিত যে, গাওসুল আজম সাইয়্যেদ মহীউদ্দিন শায়েখ আবদুল কাদের জীলানী (রঃ) (মৃত্যু- ৫৬১হিঃ) হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং ইমাম শায়াফী (রঃ)-এর শায়াফী মাযহাব অনুসারে ফতুয়া দিতেন। আর গরীব নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রঃ) ছিলেন শায়াফী মাযহাবের অনুসারী। সহরোয়ার্দী (রঃ)-ও শায়াফী মযাহাবের অনুসারী ছিলেন। আর শায়খ আল মালেক গজদোয়ানী, (মৃত্যু- ৫৭৫ হিঃ) খাজা আহম্মদ বসুয়ী, (মৃত্যু- ৫০২ হিঃ) এবং খাজা বাহাউদ্দিন (রঃ) (মৃত্যু- ৭৯১ হিঃ) প্রমুখ বুজুর্গানে দ্বীন ছিলেন নকশাবন্দীয়া তরীকা ও বসুইয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। ইহারা সকলেই হানাফী মাযাহাবের অনুসারী ছিলেন।

দুষ্ট লোকেরা ভাল লোকের বদনাম করে

এই সব দুষ্ট প্রকৃতির ও দুষ্ট মাযহাবের অনুসারীরা নিজেদের বুজুর্গানদের নামে কুৎসা রটাইয়া মিথ্যা অপবাদ ছড়াইয়া তাহাদিগের বদনাম করিয়া থাকে। কিয়ামতের দিন তাহাদের হাশর কোন দলের সাথে হইবে তাহা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। ইহাদের মধ্যে কতিপয় লোক এমনও রহিয়াছে যাহারা নিজেদিগকে আলকাদেরী নামে পরিচয় দেয়। আবার কেহ নিজদিগকে চিশ্‌তী বলিয়া থাকে। এমনি ভাবে কেহ নিজ নামের পিছনে নকশাবন্দীয়া লেজ লাগাইয়া খ্যাতিলাভ করার চেষ্টা করে। ইহাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যাহারা ইমামীয়া উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে অলীভীয়াহ্‌, জাফরীয়াহ্‌ ইসমাঈলীয়া মাহদীয়াহ ও এছনা আশারীয়াহ সম্প্রদায়ভুক্ত অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশধর ও অতি ভক্তজন বলিয়া পরিচয় দেওয়ার অপপ্রয়াস চালায়। ইহা শুধু অর্থহীন নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই নামগুলি যেমন আজে-বাজে কথা ও

অর্থহীন তেমনি ইহাদের দাবীও মিথ্যা দাবী। কেননা ইহাদের আমল আকীদার মধ্যে বুযুর্গানে দ্বীনের কোনই প্রভাব প্রতিপত্তি পরিলক্ষিত হয় না। ওয়াহদী বলিয়াছেন—

روح قران بر اسمان بر وند *

نقد تحقيق ازميان بروند ۔

در حقيقت بد ست كورے چند *

مصحف ما ند وكنه كورے چند ۔

كور باكس سخن نمے گويد *

سر فران كسے نمى جويد ۔

অর্থাৎ, কুরআনে করীমের বিষয়বস্তু নিয়া উাহারা চিন্তা-গবেষণা করে না।

পবিত্র কালামে মাজীদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন—

اَفَلَا يَرَوْنَ اَنْ لَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۔

অর্থাৎ, তাহারা এতটুকু লক্ষ্য করে না যে ইহারা যেমন পারে না। তাহাদের কোন কথার জবাব দিতে, তেমনি পারে না কোনরূপ ক্ষতি ও উপকার করিতে। (সূরা ত্বহা)

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন— 'অতি সত্বর মানুষের কাছে এমন একটি যুগ আসিয়া পৌছিবে যে যুগে ইসলামের নাম ছাড়া আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না– আল কুরআনের হরফ ব্যতীত আমল বলিতে কিছুই রহিবে না। তাহাদের মসজিদগুলি প্রকাশ্যে খুবই সুন্দর দেখাইবে কিন্তু ভিতরে হেদায়েতের নাম-গন্ধও পাওয়া যাইবে না। সেই যুগের আলেমগণ হইবে আল্লাহর আসমানের নীচের সৃষ্টি জীবের মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্ট সৃষ্টি জীব। এই যমানায়ই দ্বীনের ভিতর নানারূপ ফেৎনা-ফাসাদের উদ্ভব হইবে এবং তাহাদের কাছে-ই উহা প্রত্যাবর্তন করিয়া আসিবে।'

এই হাদীসটি ইমাম আবু নফর আহমদ বিন হোসাইন বায়হাক্বী (রঃ)-ও শোয়াবুল ঈমান কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান যমানায়ও এমন কতিপয়

বুযুর্গ লোক রহিয়াছেন, যাহারা মুশ্‌রিকগণের হেরেমে সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের উপর আমল করিয়া থাকেন এবং আপন বুযুর্গানের নামকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরেন। এই ধরনের আরো কিছু লোক পরিলক্ষিত হইলে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের দ্বীনের উপর দিয়া এইসব জাহেল পীর ফকিরদের বুযুর্গীর কথা মানুষের বিশ্বাস হইত না। তাহারা সর্বদাই খাঁটি বুযুর্গানদের নামে অপপ্রচার করিয়া বেড়ায় এবং তাহাদের নামে শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ করার মিথ্যা অপবাদ দেয়। মোট কথা সর্বদিক দিয়া ইহারা আসল লক্ষ্য এবং মূল হাকিকত হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। আল্লাহ তা'আলার শোকর যে এই সব পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনের জীবন চরিত্র ও অবস্থা সম্বলিত কিতাবাদি খুবই কম পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া ইসলামের কেন্দ্র হইতে যে সকল শহর দূরে অবস্থিত হৈ সকল শহরের বেলায় না পাওয়ার কথাটা খুবই সংগত কথা।

মূর্তি পূজারীদের সাথে কবর পূজারকদের সামঞ্জস্যতা

মূর্তি পূজারকগণ তাহাদের প্রতিমাকে রেশমী পোশাকসহ নানাবিধ মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরাইয়া থাকে। এই সব পীর পূজারকদের নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, তোমরা যদি কবরকে পীরের মর্যাদা দিয়া পীর মনে কর এবং তোমাদের পীর যদি মুসলমান হয়, তবে মুসলমানদের জন্যত রেশমের পোশাক পরিধান করা হারাম। সুতরাং কবরে এই ধরনের পোশাক পরিধান করা দ্বারা কি হারাম কার্য অপরিহার্য হইয়া পড়ে না? আর যদি কবরকে জিন্দা পীরের ন্যায় মনে না কর যেমন বাস্তবে করা হইতেছে, তবে কবরের সামনে তোমাদের আহাজারী করা বেওকুফী, মুর্খতা এবং মূতি পূজারকদের সাথে সামঞ্জস্যতা বৈ কিছুই নয়। কেননা তাহারাও নিজেদের প্রতিমার সামনে আহাজারী ও আবেদন-নিবেদন করিয়া থাকে। আর মূর্তি পূজারকদের একটি খামখেয়ালী হইল এই যে, নিজেদের অভাব-অভিযোগ ও মাকসুদ পূরণের জন্য প্রতিমার এবং প্রতিমার সেবকদের জন্য নজর-নিয়াজ ও মান্নৎ করাকে যেমন অপরিহার্য মনে করে তেমনী পীর পূজারকগণও নিজেদের প্রয়োজন, অভাব-অভিযোগ ও উদ্দেশ্যে সফলতা লাভের জন্য বুযুর্গানদের কবরস্থান এবং কবরের খাদেম-খুদ্দামদের নিকট যাইযা এই ধরনের সকল কাজই করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত মূর্তি পূজারকদের আর একটি বদ অভ্যাস হইল যে, নিজেদের সকল মূর্তির মধ্যে একটি মূর্তির জন্য সূর্য মাসের কোন একটি দিন নির্দিষ্টরূপে নির্ণয় করিয়া সমগ্র

লোক মূর্তি যিয়ারতের জন্য জামায়েত হয় এবং বিভিন্ন ধরনের নজর-নিয়াজ ও নৈবদ্য নিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া ঐ প্রতিমার সম্মুখে মাথা নোয়াইয়া কুর্নিশ করিতে থাকে। কবর পূজারকগণের অবস্থাও অনুরূপ। তাহারা বিভিন্ন কবরের মধ্যে কোন একটি কবরের জন্য চান্দ্র মাসের কোন একটা দিন নির্ণয় করিয়া সেখানে জামায়েত হয়। ইতিপূর্বে মূর্তি পূজারকদের সম্পর্কে উল্লেখকৃত সমুদয় কাজই এই লোকেরা সেখানে গিয়া করিয়া থাকে। শুধু এতটুকু নয় বরং সেখানে গিয়া নর্তন-কুর্দন করা, শারিন্দা বেহালা বাজাইয়া সুর ধরিয়া গান বাদ্য করা ইদ্যাদি সকল প্রকার অশ্লীল ক্রিয়া-কলাপ যাহা বড় বড় কবিরা গুনাহের মধ্যে অন্যতম কবিরা গুনাহের কাজ করিয়া থাকে। সব চাইতে তাহাদের বড় গুনাহের কাজ হইল পীর সাহেবের নিকট খাদেম হিসাবে থাকিয়া নর্তন-কুর্দন করা এবং তাহাকে কুর্নিশ করার কাজ বৈধ মনে করা। বাস্তব কথা যে, কিয়ামতের দিনে হিসাব-নিকাশের সময় তাহাদের আমলের মধ্য হইতে অনুরূপ সেবায়েত হইবে। এই দুষ্ট দুরাচারদের জন্য হাজারও আফসুস যে, তাহারা খেলাধূলা হাসি-ঠাট্টা ও নর্তন-কুর্দনকেই খোদা প্রাপ্তির পথ ও দ্বীনে শরীয়ত মনে করিয়া নিয়াছে। গান-বাজনা খেলাধূলা হাসি-ঠাট্টা ও নর্তন-কুর্দনকে যাহারা দ্বীনের রূপ দান করিয়াছে, কালামে পাকে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে কাফের বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং পানি ও জান্নাতের খাদ্য সামগ্রীকে তাহাদের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন। যেমন পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ঐ বস্তু দুইটিকে কাফেরদের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন। যাহারা পার্থিব জগতে বসিয়া নিজদের দ্বীন ধর্মকে খেলাধূলা ও হাসি-ঠাট্টার বস্তুতে পরিণত করিয়াছে এবং যাহাদিগকে পার্থিব জীবন প্রতারণার মধ্যে নিপতিত করিয়া রাখিয়াছে। উহারা যেমন এই মহান দিনটির কথা মুখে আনিত না এবং আমার আয়াত ও নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করিত। আমিও আজ (ঘৃণাভরে) উহাদের নাম মুখে নিব না। (সূরা আরাফ)

মূর্তি পূজারকদের আর একটি অভ্যাস হইল যে বিশেষ কোন দিনে তাহাদের মূর্তিকে খুব সাজ সজ্জায় শোভমণ্ডিত করিয়া উহার নিকট ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে দলে দলে আসিয়া জামায়েত হয়। পীর পূজারকগণ ও কবর পূজারিগণ এমনিভাবে

মিথ্যা কবর বানাইয়া তাজিয়া নাম দিয়া বিভিন্ন ধরনের সাজে সাজাইয়া আশুরার দিনে উহা সহ মিছিলে বাহির করে, মূর্তি পূজারকদের আর একটি কুঅভ্যাস হইল যে, প্রতিমাসমূহের নামে ঝাণ্ডা বানাইয়া সেই ঝাণ্ডাসহ খুব ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে দলে দলে মিছিল করিয়া মন্দিরে গিয়া জমায়েত হয়। অনুরূপ পীর পূজারী ও কবর পূজারীদলের লোকেরাও পীরের নামে ঝাণ্ডা বানাইয়া নেয়। যেমন— শাহ মাদারের ঝাণ্ডা, খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্তীর ঝাণ্ডা, সালারে মাসুদ গাজীর ঝাণ্ডা এবং সরওয়ার সুলতানের ঝাণ্ডা। আর ঐ ঝাণ্ডাসহ রাস্তায় রাস্তায় মিছিল অথবা একাকী বা পৃথক পৃথক ভাবে রাস্তায় নামিয়া যায়। ইহার পর নির্ধারিত কোন একটি দিনে ঐ ঝাণ্ডা সমবেতভাবে উত্তোলন করিয়া উল্লেখিত ব্যক্তিদের কবরের নিকট গিয়া উপস্থিত হয় এবং এহেন কালকে তাহারা খুব সওয়াব ও ইবাদতের কাজ ভাবিয়া নিজেদের অভাব-অভিযোগ, দাবী-দাওয়া ও মাকসুদ পূরণ এবং বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য প্রার্থনা করিতে থাকে। কতিপয় খোদাভীরু ও দ্বীনদার পরহেজগার উলামায় কেরাম ভারতে আসিয়া এই দলের অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া এবং ইহাদের কথাবার্তা শুনিয়া এই মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে, 'ইহারা আল্লাহর বান্দা নয় বরং পীর ফকির ও কবরের মাজারের বান্দা।' ইহারা প্রতিমার উপসনায় কাফেরদের পায়রবী করিয়া চলে। সুতরাং ভূত-প্রেত ও মূর্তির গান্দাপঁচা আবর্জনা ও নাপাকী হইতে তোমরা সকলে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথাকে পরিত্যাগ কর। আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহমত করুন।

কবরের ওরস ও মেলা

অগ্নিপূজক ও ভারতের মূর্তি পূজারকদের শিরকী অভ্যাসসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি অভ্যাস হইল যে নির্দিষ্ট কতকগুলি দিনের মধ্যে সমগ্র বৎসরে একটি দিন নির্ধারণ করিয়া আমোদ ফূর্তি করিয়া থাকে এবং ঐদিন মন্দিরের কাছে সকলে জামায়েত হয়। পীর পূজারকদেরও এই ধরনের অভ্যাস রহিয়াছে। তাহারা বুজুর্গানে দ্বীনের কবর ও মাজারে ওরস ও মেলার জন্য একটি দিন নির্ধারণ করিয়া নেয় এবং ঐ দিন সমগ্র লোক-ঐ কবরস্থানে বা মাজার শরীফে বা দরগাহে জমায়েত হইয়া আমোদ স্ফূর্তি নর্তন-কুর্দন, জলী যিকির, গান-বাজনা কাওয়ালী মুর্শিদী ইত্যাদি সকল প্রকার আমোদ স্ফূর্তি ও খেলা-ধূলায় দিনটি কাটাইয়া দেয়। আর ইহা দ্বারা শয়তানের অপবিত্র আত্মাকে খুশি এবং বুযুর্গানদের পবিত্র আত্মাকে নাখোশ করিয়া তুলে। যেমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের

থেকে বর্ণিত আছে যে, গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী এলাকা হইতে এক ব্যক্তি খাজা কুতুবুদ্দিনের ওরসে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া এক আলেম লোকের খানকায় আসিয়া আশ্রয় নিল। সে একদিন ঐ আলেম ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করিল যে, আপনি খাজা সাহেবের যিয়ারতে যান নাই কেন? তখন আলেম লোকটি জবাব দিল যে, ইন্তেকাল দিবসেই কবর যিয়ারত করা কোন জরুরী বিষয় নয়। বরং এই ওরসে বা মেলায় যাওয়া বিদয়াতীদের জামায়াতে সামিল হওয়া এবং তাহাদের জামায়াতকে শ্রীবৃদ্ধি করার নামান্তর। ইহার দ্বারা বিরাট ফেৎনার মধ্যে নিপতিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরকে ঈদগাহে পরিণত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মোটকথা এই আবেদ লোকটি যখন খাজা সাহেবের কবর যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, খাজা সাহেব কবর হইতে বাহিরে চলিয়া আসিয়াছেন এবং তাহার নিকট তিনি মানুষের এই ধরনের জামায়েত হওয়া ও শরীয়ত গর্হিত কার্য-কলাপের দ্বারা স্বীয় মাথা বেদনার দিকে ইংগীত করিতেছেন। সুতরাং এই আবেদ লোকটি ওরস হইতে ফিরিয়া কবর যিয়ারতের জন্য ওরসের সময় যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন— 'আমার কবরকে তোমরা ঈদাগাহ ও মেলার স্থানে পরিণত করিও না।' এই নিষেধাজ্ঞা দ্বারা উপকৃত হইতে লাগিলেন।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার আলোচনা

হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে তাইমিয়া যিনি সমসাময়িক কালে সিরিয়ার মুফতি ছিলেন; তিনি তাহার স্বলিখিত কিতাব 'সিরাতুল মুস্তাকিমে' রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। তিন এরশাদ করেন—

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে জাতির সাথে সাদৃশ্যতা গ্রহণ করে সেই ব্যক্তি ঐ জাতিরই অন্তর্ভূক্ত।

ইহার পর আল্লামা ইবনে তাইমিয়া লিখিতেছেন- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণীটির মূল উদ্দেশ্য হইল সাধারণ ভাবে কাহারও

সাথে সাদৃশ্যতা ও সামঞ্জস্যতা গ্রহণ হারাম হওয়া। এমনি ভাবে হুযূর এরশাদ করিয়াছেন যে— خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ তোমরা মুশ্‌রিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া কাফেরদের সাথে উহাদের আমোদ-ফুর্তি রোসম-রেওয়াজ ও অভ্যাসের সাথে সাদৃশ্যতা গ্রহণ হারাম হওয়ার বিষয় সম্বলিত কুরআনের বহু আয়াত, সহি হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামগণের কর্ম চরিত্রের কথা খুব কঠোরতার সাথে উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন তিনি তাহার কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন যদি কোন জাতি নূতন কোন বিদয়াতের পত্তন করে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের থেকে তদনুরূপ সুন্নাত উঠাইয়া নিয়া যায়। আশুরার দিন শিয়া সম্প্রদায় ও রাফেজী সম্প্রদায় যে সব রোসম রেওয়াজ ও অনুষ্ঠানাদি পালন করিয়া থাকে তাহাও ইমাম সাহেব কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যতার মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। ঐ কিতাবে তিনি বলেন— জাবালে রহমতের উপর যে বিরাট পাথর খণ্ড ও গম্বুজ রহিয়াছে তাহা তাওয়াফ করা শরীয়তের বিধান নয়। আর বিভিন্ন প্রথা ও অনুষ্ঠানাদিতে গান-বাজনা করা ঢোল তবলা ও বেহালা বাজান এবং সেখানে জামায়েত হওয়াও অতি দুষ্ট-কর্ম ও শরিয়ত বিরোধী কাজের মধ্যে সামিল। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলিয়াছেন— উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করা বিদয়াত। আর দোয়ার জন্য হাত উত্তোলন করাও বিদয়াত। নারী-পুরুষ একত্রে সম্মিলিত হওয়াও (স্বামী স্ত্রী নহে) বিরাট বিদয়াত ও গোমরাহী। ঐ কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় ঈদ উৎসব ও মেলা করার বর্ণনায় তিনি বলেন— এই ধরনের আমোদফুর্তি ও নির্দিষ্ট সময় ঈদ উৎসব করণের চেয়েও খুব খারাপ কাজ। কেননা ইহার ভিতর মূর্তি পূজারকদের সাথে সামঞ্জস্যতা রহিয়াছে। অথবা ইবাদতের রংয়ে রঙ্গিন হওয়া বা অসীলা গ্রহণ করা কিংবা এই ধরনের কোন একটি কাজের মধ্যে ইহা সামিল। কেননা মূর্তি পূজারকগণ তাহাদের মূর্তিতে মন্দির বা উহার অবস্থানের স্থানে নিয়া যাওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে এবং মনে করে এই ইচ্ছার দ্বারাই আমরা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করিতে সমর্থ হইব। আর মূর্তিসমূহের মধ্যে যে মূর্তিটি খুব বড় সেইটি সম্পর্কে জাহেলী যমানায় এই বিশ্বাস পোষণ করা হইত যে, ইহারা তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে। এই বড় মূর্তিগুলি তিন প্রকার। ইহার একটির নাম হইল লাত, যাহাকে তায়েফবাসী পূজা করিত।

ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, কোন একজন দ্বীনদার পরহেজগার লোক হাজীদের জন্য ছাতু তৈয়ার করিয়া দিত। তাহার মৃত্যু হইবার পর মানুষ তাহার কবরের সেবায়েত ও পূজারক হইয়া গেল। এইভাবে দীর্ঘ কয়েকটি যুগ অতিবাহিত হইবার পর ইহার একটি প্রতিমূর্তি বানাইয়া সম্মান করিতে লাগিল। ইহার পর একটি অট্টালিকা বানাইল এবং তাহার নাম রাখা হইল বায়তুর রুম্মাহ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার দ্বীন নিয়া যখন মানুষের দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং মাতৃভূমি মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে তায়েফ শহর জয় করিলেন তখন তিনি এই মন্দিরটিকে এবং উহার ভিতরকার মূর্তিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিয়া দিলেন। আর দ্বিতীয় প্রকার বড় মূর্তিটির নাম হইল উজ্জা। উজ্জা হইল এমন একটি বৃক্ষের নাম, যাহার তলায় বসিয়া কাফেরগণ নিজেদের জীব-জন্তু বলি দিত এবং আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিত। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম মাফিক হযরত খালেদ বিন অলিদ (রাঃ) যখন ঐ বৃক্ষটিকে কাটিয়া ফেলিলেন তখন উহা হইতে এমন বৃদ্ধ দুইটি শয়তান বাহির হইয়াছিল, যাহাদের মাথার কেশরাজী ছিল এলোমেলো ও কোকড়ানো। তৃতীয় মূর্তিটির নাম হইল মানাত। মদীনাবাসী ইহার পূজারক ছিল। আসলে এই মূর্তিটি ছিল একটি পাথর খণ্ড। কিন্তু এই পাপিষ্ঠদের মতে উহা ছিল জগতের খোদা। উহার সম্মুখে প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে আত্মীয়দেরকে হত্যা করিয়া রক্ত ঢালা হইত। আর এই স্থানে আরও এমন এমন বহু কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ ছিল যেই বৃক্ষে কাফেরগণ তাহাদের হাতিয়ার ঝুলাইয়া রাখিত। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন— কাফেরদের বৃক্ষের সাথে হাতিয়ার ঝুলানোর ন্যায় কবর পূজারকদের প্রত্যেকটি কাজই কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যতার পরিচয় বহন করে এবং উহাকে উপাস্যের মর্যাদায় সমাসীন করিয়া দেয়। সুতরাং যে সকল লোক শরীয়তের অনুমতি ব্যতীতই কোন দরগাহে, মাজারে, কবরস্থানে অথবা স্মৃতি চিহ্নের স্থানে বিভিন্ন আশা-আকাঙ্খা নিয়া বরকত লাভের জন্য গমন করে এবং অন্তরে এইরূপ বিশ্বাস রাখে যে, সেইখানে নামায পড়া এবং দোয়া করায় জিকরুল্লাহর চেয়ে অধিক সওয়াব ইহাদের অবস্থা কি হইবে? তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ইহার চেয়েও কবর পূজারকদের বড় দুর্নীতি হইল যে, ঐ সকল স্থান ও কবরকে আলোকিত করিবার জন্য সেখানে মোমবাতি ও তৈল দিবার মান্নৎ মানিয়া থাকে। এই ধরনের মান্নৎ পূর্ণ করা উলামায়ে কেরামদের সম্মিলিত মতে অবৈধ ও হারাম বরং বহু উলামায় কেরামদের মতে যাহাদের মধ্যে ইমাম আহমদও (রঃ) রহিয়াছেন, এই ধরনের মান্নৎকারীদের উপর কাফ্ফারা দেওয়া ওয়াজিব হইয়া যায়। আর নগদ টাকা-পয়সা ও মালমাত্তা এই সব স্থান ও কবরের খাদেম সেবায়েত এবং সেখানে অবস্থানকারী লোকদের জন্য মান্নৎ করা হইলে তখনও ঐ একই হুকুম প্রযোজ্য হইবে। অর্থাৎ কাফ্ফারা দিতে হইবে। কেননা এইসব স্থানসমূহের খাদেম ও সেবায়েতগণ অনুরূপ ঐ সকল খাদেম সমপর্যায়ভুক্ত, যাহারা লাত, উজ্জা ও মান্নাতের খাদেম ও সেবায়েত নামে পরিচিত ছিল। তাহারা জনসাধারণের ধন-সম্পদ বাতিল ও হারাম পথে ভক্ষণ করিত এবং তাহাদিগকে আল্লাহর পথ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিত। ইহা ছাড়া এই সকল স্থান ও কবরসমূহের খাদেম ও সেবায়েতগণের সাথে ঠিক অনুরূপ সমতা, সাদৃশ্যতা ও সমমর্যাদা ঐ সকল লোকদের সাথে রহিয়াছে যাহাদের সম্পর্কে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিয়াছেন—

مَاهٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْ اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ ـ

অর্থাৎ, এই সকল মূর্তি ও প্রতিমাগুলি কি বস্তু, তোমরা যাহাদের খাদেম ও সেবায়েত সাজিয়াছ?

এই একই অবস্থা হইল ঐ সকল মিথ্যা কবরসমূহ এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের স্মৃতি চিহ্নগুলির, যাহার খ্যাতির পিছনে শরীয়তী কোন দলিল প্রমাণ বর্তমান নাই। ইমাম ইবনে তাইমিয়া এই সকল বিষয়গুলি পরিসংখ্যানের পর বলিতেছেন যে, দামেস্কের মস্‌জিদে কাফ্ ও ইহার অন্তর্ভূক্ত। এই মসজিদ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ যে, উহার ভিতর হযরত আলী (রাঃ)-এর হস্ত চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে।

মূর্তি পূজারীদের সাথে সাদৃশ্যতার অবশিষ্ট আলোচনা

আমাদের ইতিপূর্বের আলোচনা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বর্তমান যুগে পদযুগলের চিহ্ন পাঞ্জা চিহ্ন এবং অন্যান্য মানব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বুযুর্গানদের নামের সাথে নাম রাখিয়া বানাইয়া রাখা হইয়াছে, ঐ সব স্থানের খাদেম ও সেবায়েতগণকে বরকত লাভ ও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্য কোন বস্তু দেওয়া সাধারণভাবে হারাম। ভারতের মূর্তি পূজারকদের একটি অভ্যাস হইল যে, প্রতি বৎসর কৃষ্ণের জন্ম-দিবস পালন করিতে গিয়া খুব আমোদ-ফুর্তি করে

এমনি ভাবে পীর পূজারিগণও প্রতি বৎসর বারই রজব আমীরুল মুমেনিন হযরত আলী (রাঃ) এর জন্ম দিবস পালন করিয়া ঐ দিন খুব আমোদ-আহলাদ করিয়া থাকে। আর তাহারা অগ্নি পূজারকদের ন্যায় 'নওরোজ'-ও পালন করিয়া থাকে। অথচ হযরত আলী (রাঃ) নিজেই এরশাদ করিয়াছেন যে— 'প্রত্যেকটি দিনই আমাদের জন্য নূতন। মূর্তি পূজারকদের অপর একটি অভ্যাস এই যে, সাক্ষাতের সময় সন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য সৃষ্ট জীবের নামের সাথে সালাম করিয়া রাম রাম বলিতে থাকে। এমনি ভাবে পীর পূজারকগণও ইয়া আলী মদদে বলিয়া সম্ভাষণ জানায়, কিন্তু আস্‌সালামু আলাইকুম বলে না। পৌত্তলিকদের আর একটি দস্তর হইল যে, শবদেহের সাথে আমোদ-ফূর্তি ও বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া চলিয়া থাকে। পীর পূজারকগণও নিজেদের মৃত লাশের সাথে পথ চলিবার সময় এইরূপ ক্রিয়াকলাপ করে। নিজেদের প্রতিমা মন্দিরে ঢোল-বাদ্য ও অন্যান্য বাদ্য-বাজনা করাকে ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের অসিলা মনে করা যেমন উহাদের নিয়ম, তেমনি পীর পূজারকগণও কবরের সম্মুখে এইরূপ ক্রিয়া-কাণ্ড করিয়া থাকে। শুধু ইহাই নয় বরং এহেন অপবিত্র মজলিসে ওজু সহকারে যাইয়া এই ধরনের কথাবার্তাও শুনিয়া থাকে। ইহাছাড়া মুশ্‌রিকদের আর একটি অভ্যাস এই যে, তাহারা অগ্রপশ্চাতের লজ্জাস্থান উলঙ্গকারী বিবস্ত্র লুচ্চা ও বদমায়েশদেরকে ঠাকুর ব্রাহ্মণ খোদা প্রেমিক সাধু সন্ন্যাসী ভাবিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে যদি কেহ কাহাকেও ভাঙ্গা ও গাজার কল্কি দেয় তবে তাহা নেয়ামত মনে করিয়া বিনা চিন্তায় গ্রহণ করিয়া নেয়। তাহাদের আর একটি নিয়ম হইল যে, প্রতিদিন ভোরবেলা পূর্ববর্তী সাধু সন্ন্যাসীদের নাম অজীফা হিসাবে জল্পনা করিয়া থাকে। এমনিভাবে পীর পূজারকগণও প্রতিদিন ভোরবেলা আল্লাহর নাম ত্যাগ করিয়া পূর্ববর্তী বুযুর্গানদের নামের শাজারাকে খুব ভক্তি গদ গদ চিত্তে অজীফা হিসাবে পাঠ করে এবং তাহারা ফরজ নামাযকে কোন জরুরী বিষয় বলিয়া মনে করেনা। মুশ্‌রিকদের আর একটি অভ্যাস হইল যে, তাহারা পূর্ববর্তী লোকদের নাম নিয়া মানুষকে পানি পান করার এবং ইহাকে গায়রুল্লাহর নামের সাথে নামকরণ করে। এমনিভাবে পীর পূজারিগণও ইমাম হোসাইন (রাঃ) নামের একটি পত্র বানাইয়া মানুষকে পানি পান করায় এবং উহাকে ইমাম হোসেনের নজরানা বলিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা এতটুকু কথাও চিন্তা করে না যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যাতীত অন্য কোন সত্তার জন্য নজর দেওয়া হারাম। এক্ষেত্রে শুধু এতটুকু কাজ বৈধ হইতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও খুশি অর্জনের নিমিত্ত কোন

দরিদ্রকে পানি পান বা অন্নদান করা যাইতে পারে যে, ইহার সওয়াব ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর রুহ মোবারকে বা অন্য কোন বুজুর্গানে দ্বীনের রুহের প্রতি পৌঁছিবে। প্রতিমা মন্দিরের সম্মুখে ও প্রতিমার নামে কোন জীব-জন্তু বলি দেওয়া যেমন মুশ্‌রিকদের নিয়ম তেমনি কবরের নজর-নিয়াজের জন্য এবং কবরের সম্মুখে জীব জন্তু জবেহ করাও পীর পূজারকদের একটি কু-অভ্যাস।

মুশ্‌রিকদের আর একটি নিয়ম হইল যে, মন্দিরের সম্মানের জন্য ঠাকুর দুয়ারা বা গুরু দুযারা ইত্যাদি নাম রাখিয়া থাকে। তেমনি পীর পূজারকগণও যেখানে তাজীয়া নির্মাণ করিয়া তাকে সেইখানের নাম রখিয়া থাকে 'ইমাম বাড়াহ্'। প্রতিমার সম্মুখে যেসব নৈবদ্য ও শিরনী মিঠাই ভোগ দেওয়ার পর খুব সম্মান সম্ভ্রম ও ভক্তি গদ গদ ভাবে যেমন পানাহার করা উহাদের নিয়ম, তেমনি পীর-পূজারীরাও কবরে নজরানা দেওয়া শিরনী মিঠাইকে খুব আদব এহতেরামের সাথে আহার করিয়া থাকে। কিন্তু কোরবানীর গোশ্‌ত যে নিঃসন্দেহে একটি বরকতময় বস্তু তাহা হস্তগত হইলে সেইদিকে উহাদের ততোটা ভক্তি শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয় না। ভারতবর্ষের কাফেরদের অভ্যাস হইল যে, যখন তাহারা নিজেদের প্রতিমার নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করে তখন নিজেদের ললাট ভূমি রঙ্গীন করিয়া এবং গলায় ফুলের মালা দিয়া আসিয়া থাকে। এমনিরূপে পীর পূজারকগণও কবরের গেলাফের উপর ছড়ানো সুগন্ধী নিজেদের নয়ন যুগলে লাগায় এবং এই সুগন্ধী উহার খাদেমগণের হস্ত দ্বারা নিজেদের মাথার তালুতে লাগাইয়া নিজেকে ভাগ্যবান ভাবিয়া খুব গৌরবের সাথে চলিয়া আসে, যেমন রাজা-বাদশাহের দরবার হইতে উপহার নিয়া খুশি-খোশালীতে চলিয়া আসা হয়। প্রতিমা পূজারকদের আর একটি অভ্যাস হইল যে, তাহারা প্রতিমা মন্দিরের খাদেম ও সেবায়েতগণকে খুব ভক্তি করে ভালবাসে এবং তাহাদিগকে আল্লাহর দরবারে নিজেদের ওকিল ও সুপারিশকারী ভাবিয়া থাকে। এমনিভাবে কবর পূজারকগণও কবরের খাদেম ও সেবায়েতগণকে নিজেদের বড় বড় ও বিশেষ কাজের বেলায় ওকিল মনে করে। আর এই ওকিলদের অখুশি ও অসন্তুষ্টির জন্য তাহারা খুবই চিন্তিত ও পেরেশান থাকে।

আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে আমরা আমাদের নফসের দাগাবাজী এবং দুষ্টতা হইতে পানাহ চাহিতেছি। আল্লাহ তা'য়ালা যাহাকে হেদায়েত করেন তাহাকে কেহই গোমরাহ করিতে পারে না। আর যাহাকে গোমরাহ করেন তাহাকেও কেহ হেদায়েত করিতে পারে না। আমীন।

শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রঃ) কর্তৃক শয়তানের চক্রান্ত ব্যর্থ করার ঘটনা

হে মুসলমানগণ! তোমাদের ইহা ভাল করিয়া জানিয়া রাখা উচিত যে, শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন সেই বিষয় তোমাদের গাফলতী ও অজ্ঞতার কারণেই তোমাদের উপর এই সব বালা-মুসিবত আসিয়া পতিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁহার বান্দাগণকে পরীক্ষা করার জন্য শয়তানকে কিছুটা অলৌকিক শক্তির অধিকারী করিয়া দিয়াছেন। সলফে সালেহীনদের জীবন চরিত্রে ঘটনাবলী বর্ণনাকারীগণ শায়েখ আবু নসর মূসা ইবনে আল কাদির জিলানী (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলিতেছেন যে, আমার পিতা শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর যবানীতে শুনিয়াছেন, তিনি বলেন আমি কোন একদিন সফরে বাহির হইয়া কোন একটি জঙ্গলা ভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলাম। কিন্তু সেখানে পানির কোন সুব্যবস্থা না থাকার দরুন আমি পীপাসায় খুব কাতর হইয়া পড়িলাম। আল্লাহ তা'য়ালা আমার পীপাসা নিবারণ করিবার জন্য মেঘ প্রেরণ করিয়া উহার দ্বারা আমার উপর ছায়া দিয়া রাখিলেন এবং পানি বর্ষণ করিলেন। আমি বর্ষার পানি পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। ইহার পর আমি আকাশের একটি কোণায় খুব বিরাটাকার নূরের ঝলক দেখিতে পাইলাম। আর উহার মধ্যে একটি আশ্চর্য ধরনের প্রতিচ্ছবিও আমার পরিলক্ষিত হইল। কিছুক্ষণ পর আমি ঐখান হইতে এই আওয়াজ শুনিতে পাইলাম যে, হে আবদুল কাদির 'আমি তোমার পরওয়ারদিগার। আমি যে সব বস্তু অন্যান্যদের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছি তাহা আজ আমি তোমার জন্য হালাল করিয়া দিলাম। সুতরাং যাহা ইচ্ছা তুমি তাহাই গ্রহণ করিতে পার এবং যাহা খুশি তাহাই তুমি করিতে পার।' আমি এই আওয়াজ শুনিয়া নাউজুবিল্লাহে মিনাস্ শয়তানের রাজীম পাঠ করিলাম। ইহা পাঠ করার সাথে সাথে ঐ প্রতিচ্ছবিটি যেমন দূর হইয়া গেল তেমনি নুরের ঝলকটিও অন্ধাকরে বিলিন হইয়া গেল। ইহার পর আবার আমাকে বলা হইল, 'হে আব্দুল কাদির! তুমি যে আল্লাহ তা'য়ালার বিধানের ইল্‌ম অর্জন করিয়াছ সেই এলেমের বদৌলতে আমার থেকে আজ নাজাত পাইয়া গেলে। তোমার ইল্‌ম ও বুদ্ধিজ্ঞান তোমার মান-মর্যাদা মাফিকই। আমি এই ধরনের ঘটনার দ্বারা সতরজন তরীকত পন্থী আহলে বাতেনকে গোমরাহ করিয়াছি। তাহারা কোন ক্রমেই আমার চক্রান্তের সামনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। তুমি যে আজ

নাজাত পাইলে তাহা তোমার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার দানকৃত ইল্‌মেরই ফল।' আমি শুনিয়া বলিলাম 'ইহা আমার কোন গৌরব নয় এবং আল্লাহ তা'য়ালার ফজল ও দান। তাঁহার নামের দ্বারা কোন কাজের শুরুকরণ বরং শেষকরণের মধ্যেই হেদায়েত রহিয়াছে।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রঃ)-এর এহেন শুকরিয়া জ্ঞাপন সম্বলিত বাণীটির মর্মার্থ হইল যে, এই নাজাত পাওয়া যে, ইল্‌মেরই সুফল এই ধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণ ভুল বরং আল্লাহ তা'আলার ফজল ও করমের দ্বারাই তোমার চক্রান্ত হইতে নাজাত পাইয়াছি। আমি এখনও নিশ্চিন্ত নই, আমি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ভবিষ্যতের জন্য আশা পোষণ করিতেছি। যেন তিনি আমাকে প্রথমতঃ তোমার চক্রান্ত হইতে নাজাত দিয়াছেন, তেমনি এই পর্বের শেষ মনজিলটি হইতে আমাকে রক্ষা করিয়া আমাকে আমার মনজিল মাকসুদে পৌছাইবেন। এই ঘটনাটি শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলবী (রঃ) শায়খ আবদুল কাদের (রঃ)-এর মূল উদ্দেশ্য ব্যতীতই (আখবারুল আখিয়ার) কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। মোটামুটি কথা হইল যে এখানে শয়তানী চক্রান্তের যে ঘটনাটি উল্লেখ করা হইল, আল্লাহ তা'য়ালা তাহার বান্দাগণকে পরীক্ষা করার জন্য ইহার চেয়েও অধিক আলৌকিক ক্ষমতা শয়তানকে দিয়াছেন। সুতরাং মানুষ মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত শয়তানের চক্রান্ত ও ফেরেববাজী হইতে নিরাপদ থাকিতে পারে না, সে বিষয় সকলের সজাগ থাকা উচিত। আল্লাহ তা'য়ালা কালামে মজীদে এরশাদ করেন—

لَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, ধ্বংস ও ক্ষতির মুখে নিপতিত লোক ব্যতীত আল্লাহ তা'য়লার ইমতেহান বা পরীক্ষা হইতে কোন লোকই নিশ্চিন্তিত ও নিরাপদ থাকিতে পারে না। (৭ ঃ ৯৯)

শয়তানের প্রতারণা ও ধোকাবাজী ভয় করা উচিত

মোদ্দাকথা হইল যে, যদি কোন ব্যক্তি শায়েখ আবদুল কাদির জিলানী (রঃ)-এর ন্যায় ঘটনা অবলোকন করে এবং উহা হইতে নাজাত লাভ করে, তবে সেই জন্য তাহার খুশিতে মাতওয়ারা হওয়া উচিত নয়। আর এই ধারণাও করা উচিত নয় যে, আমি কামালিয়াতের দরওয়াজায় পৌঁছিয়া গিয়াছি। আর ইহাও

যেন সে না বুঝে যে আমি মারেফাতের এমন পর্যায় গিয়া পৌঁছিয়াছি যাহা শয়তানের হস্তক্ষেপের বাহিরে। কেননা ইহা এমনই প্রতারণা যে, শয়তান এই পথে ও এই নিয়মে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রঃ) ব্যতীত শীর্ষ স্থানীয় বুযুর্গণকেও গোমরাহ করিয়া দিয়াছে। সুতরাং ইহার পর আর কোন ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু সকল লোককে নিজেদের খেয়াল-খুশি ও ধ্যান-ধারণাকে সর্বদাই আল কুরআনের আয়াত ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের মাপকাঠিতে পরিমাপ করিয়া তাহার অনুগত ওলীকে গ্রহণ করিতে হইবে আমাদের উপরোল্লেখিত আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রতিভাত হয় যে, অজ্ঞ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেরা আল্লাহ তা'য়ালাকে চিনিতে পারে না শুধু ইহাই নয় বরং আল্লাহর বিধানের পূর্ণাঙ্গ সংকলন যে এলমে ফেকাহ, সেই এলমে ফেকাহ ব্যতীত যেমন আল্লাহ তা'য়ালার মারেফাত অর্জন হইতে পারে না, তেমনি মানুষের দ্বীনধর্মও সঠিক হওয়া সম্ভব নয় এবং মারেফাতের পথিকগণও আল্লাহ তা'য়ালার মারেফাতের গোপন তত্ত্বের মুক্তা মালার দ্বারা সজ্জিত হইতে পারে না। আর এই এলমে ফেকাহ ও এলমে হাদীস ও এলমে তাফসীর ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই কোন কবি বলিয়াছেন—

علم دین فقه است تفسرو حدیث *

هرکه گیزد غیر ازین گرد وخبیث ـ

অর্থাৎ মানুষ যখন এই তিন প্রকার ইল্‌ম ব্যতীত অন্য কোন ইল্‌ম অর্জন করার জন্য অগ্রসর হয়, তখন মহা পাপিষ্ঠ শয়তান তাহার অন্তর্জগতে অলৌকিক শক্তি মহড়া প্রদর্শন করিয়া ঐ মানুষকে খবীস ও মহা পাপিষ্ঠ বানাইয়া ফেলে। অধিকাংশ সময় মানুষের মধ্যে এই ধরনের অনুরাগ ও প্রবণতা শয়তানের আনন্দদায়ক এবং নফসের প্রিয় বস্তুর কারণেই দেখা দিয়া এবং অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ইস্তেদরাজী (অলৌকিকত্ব প্রকাশের শয়তানী ক্ষমতা) রোগ সৃষ্টি করিয়া গোমরাহীর চরমে নিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। তখন এই জাহেল লোকেরা এই ধরনের আশ্চর্য ঘটনাবলীকে কেরামত মনে করিয়া নিজেদিগকে আল্লাহর সৃষ্টি জীবের নেতা ও ইমাম বানাইয়া নেয়।

খবীছ শয়তানের ক্রিয়াকাণ্ড

বর্ণিত আছে যে, এই সব আলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড করার জন্য একটি বড় খবীছ শয়তান নিয়োজিত রহিয়াছে। উহাকে শয়তানে আবয়ীয়াজ নামে ডাকা হয়। উহার আকৃতি সাদা হওয়ার কারণেই আবয়ীয়াজ নাম দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আল কুরআনের সূরা নজম তেলাওয়াতের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঐ সূরা তেলাওয়াত করিতে করিতে—

اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ـ

আয়াত পর্যন্ত পৌঁছিলেন, তখন তিনি আল্লাহ তা'য়ালার কালামের মহব্বতের সাগরে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হইয়া পড়িবার দরুন তাহার মধ্যে কিছুটা তন্দ্রার ভাব আসিল। তখন এই আবয়ীয়াজ শয়তানটি হুযূর পরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কণ্ঠস্বর ও তেলাওয়াতের ভাবভঙ্গীর অনুরূপ কণ্ঠস্বর ও ভাবভঙ্গী গ্রহণ করিয়া এই কবিতাংশটি আবৃত করিল—

تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى * وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى ـ

অর্থাৎ, এই বড় মূর্তিটির সুপারিশ অবশ্যই মঞ্জুর করিয়া নেওয়া হইবে।

সুতরাং মুশ্‌রিকগণ তাহাদের প্রতিমার প্রশংসার কথা শুনিয়া খুবই খুশি হইল। এমনকি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উক্ত সূরা পাঠান্তে সিজদা করিলেন, তখন উহারা খুশিতে আহলাদিত হইয়া তাহার সাথে সাথে সিজদা করিল। আর এই কথা বলাবলি করিতে লাগিল যে, আজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রতিমার প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং তাহার এবং আমাদের মধ্যে একটি সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা খুবই প্রকট। খালেস তরীকত পন্থি ও আহলে বাতেনগণ বলিয়াছেন যে, এই সাদা শয়তানের বিশেষত্ব হইল যে, মানুষকে এই ধরনের ধোকা দেওয়ার সাথে সাথে সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আরও বিভিন্ন প্রকার পন্থা অবলম্বন করে। যেমন অন্ধকারকে নূর ও আলোর জামা পরিধান করিয়া অতি উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময় করিয়া তোলা। সুতরাং এই খবীছ শয়তানটি আল্লাহ তা'য়ালার নাফরমানীত্ব কুফরী ও শির্‌কীকে এবং আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্যহীনতাকে নূরের তাজাল্লীর সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্যময় করিয়া নিজ ইচ্ছামত সালেকগণকে (তারীকত পন্থীগণকে) আল্লাহর পথ হইতে গোমরাহ করিয়া অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া

থাকে। আর এই প্রতারিত লোকেরা আগুনকে আল্লাহ তা'য়ালার নূর মনে করিয়া অন্যান্য লোকদেরকেও এই আলোর পানে দাওয়াত জানায়। সুতরাং খাঁটি খোদাভীরু দ্বীনদার পরহেজগার লোকেরা তাহার এই আহ্বানে আল্লাহ তা'য়ালার নিম্নলিখিত কালামের দ্বারা জওয়াব দেয়—

يَهْدِ اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -

আল্লাহ তা'য়ালা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তাহার নূরের পানে পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ তা'য়ালা (এমনিভাবে) মানুষের জন্য উদাহরণ পেশ করিয়া তাহাদিগকে বিষয়বস্তুটি বুঝাইয়া দেন। আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

يٰقَوْمِ مَا لِيْۤ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَى النَّارِ تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ -

অর্থাৎ, ভাইরা আমার! কি অবস্থা হইল যে, আমি তোমাদেরকে নাজাতের পথে ডাকিতেছি আর আমাকে ডাকিতেছ দোযখের পথে। অর্থাৎ তোমরা আমাকে আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কুফরীকরণ এবং এমন বস্তুর সাথে তাহার অংশীকরণের আহবান জানাইতেছ, যে বিষয় আমার নিকট কোন দলিল প্রমাণ বলিতে কিছুই নাই। আমি তোমাদিগকে সর্বশক্তিমান ক্ষমতাশালী ও মহা মার্জনাকারীর পানে আহবান জানাইতেছি।' (সূরা মু'মিন)

শয়তানী প্রবঞ্চনা ও অলৌকিকত্ব

মানুষ শয়তানের প্রবঞ্চনা ও অলৌকিক ঘটনাবলী দ্বারা বিশ্বাস ও আনুগত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। আর তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহর বিধানকে খুব দৃঢ়তার সাথে আকড়াইয়া ধরে, তাহারা প্রত্যেকটি যুগ-যমানায় ও প্রত্যেকটি দেশ ও স্থানে নিজদিগকে শয়তানের দাগাবাজী হইতে নিরাপদ রাখে। যেমন শায়খ আল হক মোহাদ্দেসে দেহলবী (রঃ) স্বীয় আখবারুল আখীয়ার কিতাবে শায়খ আল ওহাব মাগুবী (রাঃ) জীবন চরিতের উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, কোন এক সময় শয়তানের প্রবঞ্চনা ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রদর্শন সম্পর্কে আলোচনা হইলে তিনি বলিয়াছেন—

'ফাসেক ফাজের ও বিদয়াতী লোকদেরকে এমন শক্তি দেওয়া হইয়া থাকে যাহার দ্বারা তাহারা সাধারণ মানুষের অন্তঃকরণকে নিজেদের পানে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া আনিতে সক্ষম হয়। সুতরাং সাধারণ মানুষকে শরীয়তী বিধানের বেলায় পাকাপোক্ত না থাকার দরুন গোমরাহ করিয়া ফেলে। ইহার পর তিনি তাহার সমসাময়িক কালের একটি ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, আমি কোন এক সময় দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে দাক্কানের শহরগুলির কোন একটি শহরে গিয়া উপনীত হইলাম। শায়াফী মাযহাব পন্থী হযরত আল আযীয নামে এক ব্যক্তি ঐ শহরের কাজী ছিলেন। আমি তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমাদের এই শহরে এমন কোন বুযুর্গ ও সুফীলোক আছেন কি, যাহার খেদমতে আমি কিছুদিন অতিবাহিত করিতে পারি? জাবাবে তিনি বলিলেন, যে, সুফী পন্থীদের মধ্যে একজন বুযুর্গ আছেন এবং তাহার মুরীদ মোতাকেদও অনেক রহিয়াছে। কিন্তু কিছু শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ করার দরুন তাহার প্রতি আমার অন্তর সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং আমাকে ঐ লোকের যে ঠিকানা বলিয়া দিয়াছিলেন আমি সেই ঠিকানা মত তাহার নিকট গিয়া পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলাম যে, সে একটি উচ্চ স্থানে বহু নারী পুরুষ নিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে খবুই খুশি হইল এবং আমাকে অভিনন্দনও জানাইল। ইহার পর আসিল তাহার মদ্য পান করার পালা। সে নিজে ও সঙ্গী-সাধীগণ যেমন পরিতৃপ্ত হইয়া মদ পান করিল তেমনি আমাকেও খুব আগ্রহের সাথে মদ পান করার জন্য ইঙ্গিত দিল। আমি বলিলাম ইহা পান করা তো শরীয়তে হারাম করা হইয়াছে। সে আমাকে পান করাইবার জন্য বার বার যতই বলিল আমিও ততই কঠোরতার সাথে অস্বীকৃতি জানাইলাম। পরিশেষে সে আমার বেলায়' বিফল হইয়া কর্কশ স্বরে বলিল তুমি ইহা পান করিলে না। আচ্ছা দেখ আমি তোমাকে কি করিয়া ছাড়ি। ইহার পর আমি ভগ্ন হৃদয়ে তাহার নিকট থেকে চলিয়া আসিলাম। কিন্তু এই ঘটনাটি আমার সঙ্গী-সাথীদের কাহারো নিকট ব্যক্ত করিলাম না। ঐ অবস্থায়ই আমি খুব চিন্তিত মনে শুইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে আমি এমন একটি আশ্চর্যজনক ফলে ফুলে সুশোভিত ও নহর প্রবাহিত সুসজ্জিত বাগান দেখিতে পাইলাম, যাহার রূপ রেখার বর্ণনা শক্তির অতীত কাজ। কিন্তু বাগানটির পথে পথে এত কাঁটা ও বিপদ আপদ এবং বিভিন্ন প্রকার হয়রানী-পেরেশানী বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার কারণে বাগানের ভিতর গিয়া পৌঁছা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। এই সময় আরো দেখিতে পাইলাম যে, ঐ সুফী লোকটি

মদের পিয়ালা হাতে নিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া বলিল যে, তুমি যদি এই মদ পিয়ালা পান করিয়া নাও তাহা হইলে আমি তোমাকে এই বাগানের ভিতর পৌঁছাইয়া দিব। এই কথা শুনিয়া আমি জাগ্রত অবস্থার ন্যায় স্বপ্নেও তাহাকে হারাম বলিয়া পান করাকে কঠোরভাবে অস্বীকার করিলাম। এইরূপ ঘোর-প্যাঁচের মধ্যে আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। আমি সজাগ হইয়া 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ পাঠ করতঃ শুইয়া পড়িলাম। আল্লাহ মালুম আমি এমনিভাবে চল্লিশ-পঞ্চাশ বার স্বপ্ন দেখিলাম আর জাগ্রত হইলাম, আবার শুইয়া পড়িলাম। পরিশেষে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করিয়া আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দোয়া করার পর আবার শুইয়া পড়িলাম। এইবার স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত। তাহার হস্ত মোবারকে একখানা লাঠি। হঠাৎ করিয়া ঐ বিদয়াতী সুফী লোকটি সেখানে উপস্থিত হইল। এই সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহার লাঠি মোবারক ঐ বিদয়াতীর দিকে নিক্ষেপ করিলে বিদয়াতী একটি কুকুর হইয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখ হইতে ভাগিয়া পালাইল এই সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে বলিলেন, বিদয়াতী পালাইয়া গিয়াছে। এখন আর বেশি সময় এই শহরে অবস্থান করিও না। সুতরাং আমি স্বপ্ন হইতে জাগিয়া ঐ বিদয়াতী লোকটির আড্ডা খানায় গিয়া লোকের মুখে শুনিতে পাইলাম যে, সে নিজের হুজরাকে নস্যাত করিয়া দিয়া পুটুলী বাঁধিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। হেদায়াতের অনুগামীদের প্রতি সালাম।

স্বপ্নে মহানবীর যিয়ারত

এই কথা গোপন থাকা উচিত নয় যে, এই পথের সালেকগণ (তরীকত পন্থিগণ) এবং এই জামায়াতের মূল তত্ত্ব রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তিগণের অন্তর্জগতে নূরানী ও জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিবার সব চাইতে উত্তম মাধ্যম হইল স্বপ্নে বা মোরাকাবার হালতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মোহনীয় উজ্জ্বল ও নূরানী আভায় ভরপুর সমুজ্জ্বল চেহারা মোবারকের দর্শনলাভ করা এই দর্শনের গণ-সীমাকে শয়তানের ওয়াস ওয়াসা ও ইন্দ্রজাল হইতে আল্লাহ তা'য়ালা মুক্ত রাখিয়াছেন। অর্থাৎ তাহার চেহারা মোবারক ও আকৃতির রূপরেখা ধারণ করার ক্ষমতা শয়তানকে আল্লাহ তা'আলা দান করেন নাই।

সুতরাং উলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মোবারক ও আকৃতি স্বপ্নে বা মোরাকাবায়-দর্শন হইলে তাহা সেই পূর্ণ আকৃতি ও রূপরেখাটি হইবে, যেই আকৃতি ও রূপরেখাসহ তিনি এই নশ্বর জগত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এমনকি তাহার মাথার ও গোঁফের কেশ মোবারকের মধ্যে যে বিশগাছা কেশের কম পরিমাণ কেশ পাকা ছিল তাহাও দর্শন করা অপরিহার্য। উলামায় কেরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই চেহারা সুরতের কথাই গণ্য করিয়াছেন সুতরাং শায়ক আল হক মোহাদ্দেসে দেহলবী মিশকাত শরীফের 'কিতাবুর রুয়াইর' অধ্যায় উল্লেখিত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমার দর্শন করিয়াছে আসলে সে আমাকেই দেখিয়াছে। কেননা আমার চেহারা সুরত ও দেহের আকৃতি দারণ করার ক্ষমতা শয়তানের নাই।' এবং مَنْ رَاٰنِىْ فَقَدْ رَاَ الْحَقَّ (যে আমাকে দেখিয়াছে বাস্তবিকই সে আমাকেই দেখিয়াছে।) এই হাদীসের তরজমা করার পর লিখিয়াছেন যে, এই হাদীসগুলি বিভিন্নরূপে সংকলিত হওয়ার দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, যে লোক স্বপ্নে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ করিয়াছে, হাকিকতে সে তাহাকেই দেখিয়াছে। এই সম্মানিত হাক্কানী পথে মিথ্যা ও বাতিলের পদচারণা করার ক্ষমতা নাই। কেননা আল্লাহ তা'য়ালার শ্বাসত চিরন্তনী বিধান ও নিয়ম এমনিভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। যদিও শয়তানকে মানুষের সামনে স্বপ্নের মধ্যে প্রকাশিত হইবার জন্য এবং বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করার শক্তি ও ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূপ আকৃতির ন্যায় রূপ আকৃতি ধারণ করার শক্তি ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। সে এইরূপ আকৃতি ধারণ করিয়া মানুষের সম্মুখে আসিবে এবং তাহাদের অন্তরে এই কথা বুঝাইয়া দিবে যে, ইহাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকৃতি। ইহা তাহার ক্ষমতার বহির্ভূত কাজ।

উলামায়ে কেরাম ইহাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিশেষরূপে রক্ষিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। অন্য কোন মানুষকে এমন বৈশিষ্ট্য দান করা হয় নাই। এই হাদীস দ্বারা পরিষ্কাররূপে একথাও প্রতিভাত হয় যে, এই হুকুম রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর কাহারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উলামায়ে কেরামগণের একটি গ্রুপ এই হাদীস

সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার যদি এহেন বিশেষ আকৃতি ও রূপরেখার সাথে হয় কেবল তখনই এই ওয়াদার অধিকারী হইতে পারা যাইবে। আর কতিপয় উলামায়ে কেরাম এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের যৌবন কালীন আকৃতি বা বৃদ্ধকালীন আকৃতি অথবা দুর্বলতাকালীন আকৃতি কিংবা শেষ জীবনের আকৃতি মোটকথা যে আকৃতিতেই লাভ হউক না কেন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে এই মহত্বের মর্যাদা দান করিবেন।

আবার কতিপয় উলামায়ে কেরাম তাহার সীমারেখা সংকুচিত করিয়া এই মন্তব্য রাখিয়াছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই রূপাকৃতি নিয়া এই নশ্বর জগত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন এমন কি তাহার গোঁপ ও মাথার কেশ মোবারক বিশ গাছার অধিক যে পাকিয়া ছিল না, সেই রূপাকৃতিতে দর্শন হওয়া অপরিহার্য। নতুবা এই মহত্ত্বের সম্মান মর্যাদা লাভ করিতে পারিবে না। হাম্মান বিন যায়েদ (রঃ) বলেন, যখন কোন লোক ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সীরীনের খেদমতে আসিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দর্শন করার বর্ণনা করিত, তখন তিনি তাহাকে কি রূপাকৃতিতে দর্শন হইয়াছে সেই কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্যময় রূপাকৃতির কথা বলিতে না পারিত। তখন তিনি বলিতেন চলিয়া যাও। তুমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখিতে পাও নাই। হাম্মাদ বিন যায়েদ (রঃ) বলিয়াছেন যে, ইবনে সীরীনের এই বর্ণনা হাদীস পরীক্ষা নিরীক্ষার মাপকাঠিতে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং এই হাদীসের ব্যাখ্যায় তাহা লিখিতও রহিয়াছে। উলামায় কেরামগণের মধ্যে কতিপয় গোড়াপন্থী আলেমের অভিমত হইল যে, স্বপ্নে রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে যে কথা ও কালাম শুনা হয় তাহা সুন্নাতের মাপকাঠিতে ফেলিয়া পরিমাপ করা উচিত। যদি দেখা যায় যে, তাহা সুন্নাতের অনুকূলে তবে হক ও সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। আর যদি সুন্নাতের পরিপন্থী দেখা যায়, তখন মনে করিতে হইবে যে শ্রবণশক্তির মধ্যে জঞ্জাল সৃষ্টি হওয়ার কারণে ভুল শুনা হইয়াছে। শায়খুল আজম আল ওহাব মুত্তাকী (রঃ)-এর মুখে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, পাশ্চাত্য দেশের এক ফকীর স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে শরাব পান করার জন্য বলিতেছেন। সন্দেহ দূর করার জন্য সেই ফকীর সমসাময়িক কালের উলামায় কেরামগণের

নিকট হইতে এই বিষয় ফতুয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে এক একজনে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে লাগিলেন। এই সময় মদীনা শরীফে শায়ক মুহম্মদ বিন ইরাক নামে একজন সম্মানিত মহৎ ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাহার নিকট এই ফতুয়ার ঘটনা পৌছিলে তিনি বলিলেন ঘটনা আসলে এইরূপ নয়, যেরূপ সে শুনিয়াছে। বরং উহার শ্রবণ শক্তির মধ্যে জঞ্জাল সৃষ্টি হওয়ার দরুন সে ভুল শুনিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলে তাহাকে لَاتَشْرَبِ الْخَمَرَ (শরাব পান করিও না) বলিয়াছেন কিন্তু লোকটি لَاتَشْرَبِ الْخَمَرِ এর স্থলে اِشْرَبِ الْخَمَرِ (শরাব পান কর) শুনিয়াছে। স্মরণ শক্তির জঞ্জালের কারণে সে لَا (না) অক্ষরটি শুনিতে পায় নাই। কতিপয় ওলামায় কেরাম বলিয়াছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় কুরআনে কারীমের নাযিল কালে যখন শয়তান হুযূর (সঃ)-এর কণ্ঠস্বর নকল করিয়া মানুষকে গোমরাহ করিবার জন্য চক্রান্তজাল ফেলিয়া ছিল, তখন ঐ ফকির লোকটিকে স্বপ্নাবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠস্বর নকল করিয়া لَاتَشْرَبِ এর স্থলে اِشْرَبِ বলিয়া দেওয়া কোন আশ্চর্য কথা নয়। তাই এই ফকিরলোক শয়তানের কণ্ঠস্বর ধরিয়া নিয়াছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যাখ্যা প্রদানের অবকাশ থাকে না। মোট কথা এই নশ্বর জগতে মৃত্যু পর্যন্ত সেই প্রকাশ্য দুশমন, যাহাকে আল্লাহ তা'য়ালা আদুব্বুম মুবীন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন, তাহার প্রবঞ্চনা ও দাগাবাজী হইতে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট মানুষের পানাহ চাওয়া উচিত এবং যেই পথটি শির্কের আশঙ্কা হইতে অধিক নিরাপদ সেই পথে চলা উচিত, কেননা বুযুর্গানে দ্বীন ও উলামায়ে কেরাম হেদায়েতের পূর্ণাংগ বিমূর্ত প্রতীক রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার সম্পর্কে এই ধরনের আশঙ্কা পোষণ করিয়া থাকে তখন শয়তান যদি মানুষকে এই পথে আনিয়া গোমরাহ করে তবে তাহাদের নিরাপত্তা কোথায়? এমনিভাবে গোমরাহ করা কোন অসম্ভব কথা নয়। কেননা শয়তান প্রত্যেকটি লোকের পিছনেই লাগিয়া রহিয়াছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় কখন হইবে তাহা কাহারোই জানা নাই। ইহা ছাড়া সমগ্র শয়তানের সরদার সেই চির অভিশপ্ত আযাযীল ইব্‌লিস তো জীন্দা পীর হিসেবে বর্তমান রহিয়াছে। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মানুষকে গোমরাহ করার জন্য সেই-ই যথেষ্ট সে পীর বুযুর্গগণ ও শায়খদের আকৃতি ধারণ করিয়া তাহাদের অনুসারিগণকে সত্য পথ হইতে বিপথে নিয়া যায়। সাবধান! এই স্থানটি

পদস্খলনের স্থান। বহু ব্যক্তিই এইখানে পৌছিয়া সত্যের পথ হইতে পদস্খলিত হইয়া বাতিল পথে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই মহা পরীক্ষার সময় আল্লাহ তা'য়ালা কিতাব এবং রাসূলের সুন্নতকে দৃঢ়তার সাথে আকড়াইয়া না ধরা ব্যতীত উহার প্রবঞ্চনা হইতে নাজাত পাইবার দ্বিতীয়তঃ কোন পথ নাই।

পীর পূজকদের ভ্রান্তি

একথা আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, পীর পূজারকগণ বলিয়া থাকে যে শয়তান যখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূপাকৃতি ধারণ করিতে পারে না, তখন পীর-ফকির ও বুযুর্গানের রূপাকৃতির ধারণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন হেদায়েতের উজ্জ্বল প্রতীক, তেমনি পীর-ফকির ও বুযুর্গগণও হেদায়েতের উজ্জ্বল প্রতীক। এই ভ্রান্তি এমন একটি মারাত্মক ভ্রান্ত, যাহা মানুষকে গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত করে। আর ইহা এমনই একটি উদ্ভট ও অলীক মিথ্যা দাবী, যাহার বাতুলতার জন্য ঐ সকল লোকদের বর্ণনাকৃত ঘটনা যথেষ্ট। যে সব পীর পোরস্তদের মধ্যে কতিপয় লোক বলিয়াছেন যে, আমি মহরমের তাজিয়া মিছিলের সাথে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাঃ)-কে মাথায় চলিতে দেখিয়াছি। এই কারণে অগত্যা আমাকে তাজিয়া মিছিলের সাথে চলিতে হইয়াছে এবং উহার পর হইতে আমার নিকট তাজিয়ার মিছিলে অংশগ্রহণ করা এবং তাজিয়া দর্শন করা খুব ভাল অনুভব হয়। আর আমার নিকট কোন এক পীরপোস্ত লোক বলিয়াছে যে, একরাত্রে আমি অমুক বুযুর্গলোকের কবরস্থানে একটি পুরুষকে একটি রমণীর অবৈধ মিলন করিতে দেখিয়া উহাদিগকে কঠোরভাবে নিষেধ করিলাম, উভয়কে খুব ভৎর্সনা ও গালিগালাজ করিলাম। উহারা আমার কথায় লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল। ইহার পর আমি নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম যে, ঐ কবরস্থানের সেই বুযুর্গ ব্যক্তি এই কাজের জন্য আমাকে কর্কশভাবে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, ইহারা উভয়ই উভয়ের প্রতি দীর্ঘদিন যাবৎ অন্তরে প্রগাঢ় ভালবাসা পোষণ করিয়া আসিতেছে। এই রাত্রিটিতে মিলনের মোক্ষম সুযোগ পাইয়া নিজেদের দীর্ঘ দিনের বাঞ্ছিত মনস্কামনা চরিতার্থ করার কাজে তুমি কোথাকার শুকনা মোল্লা আসিয়া বাঁধা দিতেছ। তোমার মধ্যে মায়া-মহব্বত ও রস্ কস বলিতে কিছুই নাই। ইহাদের মূলতত্ব রহস্য সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞানই নাই। ইহাদের কাজে বাধা দেওয়া

হইলে উহার জন্য আমি নিজে বেশ ক্ষমতা রাখিয়া থাকি? এই কথা বলিয়া সে আমাকে এমন সজোরো লাথি মারিল? যাহার কারণে আমি বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছি। আল্লাহ তা'য়ালা এই সব বদবখ্ত ও লম্পটদিগকে হালাক করিয়া দিন। এই মিথ্যাবাদী জুয়া চোরের দলেরা কোথা হইতে যে এই ধরনের মিথ্যা অলীক ঘটনা বর্ণনা করিয়া থাকে। শয়তান পীর বুযুর্গদের রূপাকৃতি ধারণ করিতে পারে না। 'পীর পোরস্তদের এহেন ধারণা ও অবস্থার পটভূমিকায় উহারা এ ধরনের স্বপ্নকে সঠিক স্বপ্ন বলিয়া ভাবিয়া থাকে এবং এই ধরনের ঘটনা দেখিলে উহা সব সময় এড়াইয়া চলে। আর উহারা বলিয়া থাকে যে, পীর আমাদের ত্রুটিকে যেহেতু ঢাকিয়া রাখে সেহেতু পীরের চরিত্রবান হওয়া আমাদের জন্য একান্ত জরুরী বিষয়। কিন্তু যেহেতু এই সব লোকেরা পীরগণকে সমপূর্ণরূপে হেদায়েতের বিমূর্ত্ত প্রতীক ভাবে, সেই হেতু উহারা এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে কোনরূপ উচ্চ বাচ্য না করাকেই ভাল মনে করিয়া থাকে। উহারা হাফেজ শিরাজী (রঃ) দেওয়ান হইতে এমন কিছু কবিতাংশ পাঠ করিয়া মূর্খ লোকদের গোমরাহ করে, যাহা নিছক রূপক ও ইশারা ইঙ্গিত হিসেবে তিনি ভিন্নরূপ অর্থে লিখিয়া গিয়াছেন। যেমন নিজেদের সমর্থনে উহারা এই কবিতাংশটি মানুষকে পাঠ করিয়া শুনায়—

نه قاضیم نه امیرم نه فقیه *

مراچه سود که منع شراب خوری -

অর্থাৎ হাফেজ বলিতেছে— আমি বাদশাহ, আমির, কাজি, বিচারক, দেওয়ান, ফকীর কিছুই যখন হইতে পারিলাম না, তখন আমার শরাব পানের নিষেধাজ্ঞা দ্বারা কি উপকার হইবে?

এই ধরনের বহু মিথ্যা অলীক কিসসা-কাহিনী পীরপোরস্ত ও কবরপোরস্ত লোকদের কাছে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, যাহা দ্বীন শরীয়ত নবী-রাসূল এবং আওলিয়াগণের তরীকার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই ঘটনাবলী নিজের সাক্ষী নিজেই যদি দিতে পারে যে, শয়তান মুসলমান বুযুর্গানদের রূপাকৃতির ধারণ করিতে পারে তবে ভাল কথা। নতুবা আমি হাদীস শরীফ হইতে দলিল পেশ করিতেছি যে, দাজ্জাল যখন কোন এক বস্তীতে গিয়া উপনীত হইবে এবং সেখানের অধিবাসীগণকে নিজেকে আল্লাহ মানিয়া নেওয়ার জন্য দাওয়াত জানাইবে। তখন

তাহারা উহাকে মানিতে অস্বীকৃতি জানাইয়া বলিবে যে, আমাদের পিতামাতা ও পূর্ববর্তী বুযুর্গানেদ্বীন যেই দীন ধর্মের উপর আমাদিগকে রাখিয়া গিয়াছেন, সেই দ্বীন-ধর্মের উপর আমাদিগকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যও তাহারা নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। এই সময় দাজ্জাল তাহার অনুগত শয়তানটিকে ঐ সব বুযুর্গানদের রূপাকৃতি ধারণ করিয়া তাহার সত্যতার সাক্ষী নেওয়ার জন্য বলিবে। সুতরাং শয়তান তখন এই অভিশপ্তের কথামত ঐ বুযুর্গানদের রূপাকৃতি ধারণ করিয়া ঐ সকল লোকদের দ্বীন ঈমানকে বরবাদ করিয়া তাহাদিগকে জবরদস্তী মূলক অনুগত বানাইয়া নিবে' কিতাবের সেই হাদীসটি—যাহার ভিতর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—'আখেরী যমানায় শয়তান মানুষের রূপাকৃতি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে গোমরাহ করিয়া ফেলিবে। যেমন মাওলানা রুমী বলিয়াছেন—

ابسا ابلیس ادم روے حسٙت *

پر هو دست نبا يد داد دست ـ

অর্থাৎ এই জগতে মানবরূপী বহু ইব্‌লিস শয়তান রহিয়াছে। সুতরাং সর্বদা উহাদের দাগাবাজী, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার বেলায় আসল মানুষের সজাগ দৃষ্টি থাকা উচিত। যেমন— তেমন লোকের বয়াত নিয়া মুরীদের খাতায় নাম লেখান উচিত নয়।

শয়তান ও জ্বীন ইনসানের প্রবঞ্চনা হইতে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত

আমাদের উপরিবর্ণিত আলোচনা হইতে আরও পরিস্কার বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কালামে মজীদে শয়তানকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যখন তিনি বলেন—مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ অর্থাৎ কতিপয় শয়তান জ্বীন পরীর মধ্য হইতে হইয়া থাকে, আর কতিপয় হইয়া থাকে মানুষের মধ্য হইতে। ইহাদের উভয় শ্রেণীর কুমন্ত্রণা ও ওয়াসওয়াসা হইতে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সর্বদা পানাহ চাওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'আলার এই বিষয় বক্তব্য আল্-কুরআনের সেই সুরাটির মধ্যে বর্তমান পাওয়া যায় যাহা কায়দায়ে বোগদাদীর পাঠকগণ সুরায় ফাতেহার পর পাঠ করিয়া থাকেন। এই সুরাটি গায়রুল্লাহর পূজা পার্বন ও

উপাসনাকারীদেরকে প্রত্যাখ্যান ও প্রতিহত করার জন্য যথেষ্ট। আর এই দূরারোগ্য শির্কের রোগটি কি কারণে প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহাও উহার ভাষ্য দ্বারা পুরস্কাররূপে প্রমাণিত হইয়া যায়। সুতরাং আমি বড় বড় বিখ্যাত তাপসীর অনুযায়ী এখানে উহার তরজমা উল্লেখ করিতেছি। আশা করি তাওহীদপন্থী মুমিন মুসলমান ভাইদের নিকট সমাদৃত হইবে। বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম অর্থাৎ আমি সেই মহান আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ করিতেছি, যিনি পাপীতাপী ও নেক্‌কারদিগকে স্বীয় অফুরন্ত রহমত দ্বারা রিযিক দান করিয়া থাকেন। আর খাছ রহমত দ্বারা মুসলমানগণকে শয়তান ও জ্বীন ইনসানদের কুমন্ত্রণা ও দাগাবাজী হইতে রক্ষা করিয়া এই প্রতারণাময় পার্থিব জগতে নিরাপদে রাখিয়া থাকেন। তিনি এরশাদ করেন—

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ـ

অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি বলুন যে, আমি মানুষের প্রতিপালক, মানুষের বাদশা এবং মানুষের মাবুদের নিকট সেই দুষ্ট প্রভাব হইতে পানাহ চাহিতেছি যাহা অতি গোপনে মানুষের মধ্যে বিস্তার করে অর্থাৎ হে সরল সহজ পথের অনুসন্ধানকারী এবং ঐ পথে দৃঢ়তার সাথে অবস্থানকারী, হে পথিক। আল্লাহ তা'আলার দরবারে অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্রবঞ্চনা হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য পানাহ চাওয়া ব্যতীত কোন গত্যন্তর নাই। কারণ শয়তান হইল তোমার বাতেনী দুশমন।

اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ـ

অর্থাৎ, সে মানুষের অন্তর্জগতে ওয়াস্‌ওয়াসা দেয় চাই সে জ্বীনদের মধ্য হইতে হউক বা মানুষের মধ্য হইতে হউক।

এমতাবস্থায় আলাহ তা'আলা মানুষের সাথে নিজের তিনটি গুণকে সংশ্লিষ্ট করিয়া বর্ণনা দিয়াছেন অথচ তাহার এই গুণত্রয় সমগ্র সৃষ্টিকুলের বেলায় সমান। কেননা আল্লাহ তা'আলা যেমনি মানুষের মালিক ও বাদশাহ, তেমনি অন্যান্য সৃষ্টিকুলই তাহার তাসবীহ ও আরাধনা করে। যেমন এরশাদ হইতেছে—

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ـ

অর্থাৎ, সৃষ্টিকুলের সকল সৃষ্টিই আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও হামদ পাঠ করে কিন্তু তোমরা তাহাদের তাসবীহ বুঝিতে ও উপলব্ধি করিতে পার না। (সূরা বনী ইস্রাঈল)

আল্লাহ তয়ালা মানুষের সাথে যে তাহার এই বৈশিষ্ট্য ও গুণত্রয়কে বিশেষরূপে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহার মূল হাকিকত ও তত্ত্ব রহস্য বর্ণনা করিতে গিয়া তাফ্সীরকারকগণ লিখিয়াছেন যে, এই তত্ত্ব রহস্যের মধ্যে সব চাইতে উত্তম তত্ত্ব রহস্য হইল— অধিকাংশ মানুষ গায়রুল্লাহর মধ্যে এই গুণ তিনটির অস্তিত্ব বর্তমান থাকার বিশ্বাস পোষণ করিয়া কুফরীর মধ্যে নিপতিত হইয়া যায়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন যে, এই গুণ বৈশিষ্ট্যগুলি একমাত্র আলাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। এই গুণ বৈশিষ্ট্যগুলির কোন একটি গুণ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ সৃষ্টিকুলের মধ্যে কাহারও থেকে হইবার আকীদা বিশ্বাস রাখা উচিত নয়। কেননা এই আকীদা বিশ্বাস ইসলামের দৃষ্টিতে বাতিল আকীদা বিশ্বাস। ইহা শয়তানের ওয়াসওয়াসার ফলেই সৃষ্টি হয়। এই ওয়াসওয়াসা বিদূরীত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তার সাথে এই গুণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রমাণিত করিবার পন্থাও বাতলাইয়া দিয়াছেন। অধিকাংশ মানুষ যে বর্তমানে এই মারাত্মক দুরারোগ্য রোগের মধ্যে নিপতিত রহিয়াছে, তাহাতে কোনরূপই সন্দেহের অবকাশ নাই। বাতিল পন্থীদের আকীদা বিশ্বাস পর্যালোচনা করিলেই অবগত হওয়া যাইবে যে, এই দুরারোগ্য রোগটি বহু বাতিল পন্থীদিগকে ধ্বংসের অন্ধকারময় গহীন কুয়ার অতল তলে নিক্ষেপ করিয়াছে। বর্তমান যুগেও বহুলোক এই মুসিবত ও গোমরাহর মধ্যে নিপতিত রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে এবং অন্যান্য মানুষকে সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবৎ ও আখেরাতের আযাব হইতে নিরাপদে রাখুন।

তাসাব্বুর ও তাসার্‌রুফে শায়খ

কাফেরদের বাতিল ধর্মমতের কথা বাদ দিলেও দেখা যায় যে, কবর পোরস্তগণ বিভিন্ন কুফরী রোগের মধ্যে নিপতিত রহিয়াছে। যেমন তাহারা বলে যে, ইবাদত-বন্দেগীর দিকে মনোনিবেশ করার সময় পীরের চেহারা আকৃতির ধ্যান করা এবং তাহার সুষমামণ্ডিত সৌন্দর্যের ধ্যানে গভীরভাবে নিমজ্জিত হওয়াও মুরীদের কর্তব্য তালিকার একটি অন্যতম জরুরী কাজ। সুতরাং তাহারা যখন পীরের এহেন ধারণার মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দেয় এবং নিজ সত্তার কথা

ভুলিয়া যায়, তখন তাহারা এই অবস্থাকে ফানা ফীস্ শায়খ (পীরের জন্য সর্বস্ব বিলাইয়া দেওয়া) নাম দিয়া থাকে। এই বিষয় সাধারণ একটু চিন্তা ভাবনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই রোগটি পীরের বেলায় প্রতিপালকত্বের ধারণা বিশ্বাস পোষণ করার ফলেই সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার প্রশিক্ষণ তরবীয়ত এবং হুকুমের কৃতজ্ঞতা নিজের স্মরণকে বিলীন করিয়া দেওয়া অথবা এই কারণে জন্মলাভ করিয়াছে যে, পীরকে নিজের মধ্যে অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ দ্বারা স্থান লাভ করিয়া নেওয়ার বিশ্বাস দ্বারা এবং নিজকে তাহার অলৌকিক শক্তির প্রয়োগের সীমারেখা হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া দেওয়া। অথবা এই রোগটি তাহাদের মধ্যে এই কারণে সৃষ্টি হইয়াছে যে, পীরের ইল্‌ম ও জ্ঞান বৃদ্ধির সীমারেখাকে এত প্রশস্ত মনে করিয়াছে যে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান ও এলেমের ধারক ও বাহাক মনে করিয়া এইরূপ বিলীনত্বের পন্থা গ্রহণ করিয়া নিয়োছে।

বস্তুতঃ এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এই ধরনের ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাস বর্তমান থাকার জন্য এতটুকু নিদর্শনই যথেষ্ট যে, উহারা নিজেদের অভাব-অনটন, দুঃখ-দুর্দশা ও হয়রানী-পেরেশানীর সময় নিজদের বুজর্গানদের রূহের পানে মনোনিবেশ করিয়া তাহাদের নিকট দরখাস্ত করে এবং নিজেদের বাসনা ও মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য আহাজারী ও কাকুতী-মিনতি করিয়া থাকে। অথচ এই সব বিষয় মালেকুল মুলক আল্লাহ তা'আলা রাব্বুল আলামীনের বিশেষত্বের অন্তভুর্ক্ত। তিনিই স্বীয় বান্দাগণের অভাব-অনটন, দুঃখ দুর্দশা ও বাসনা মনোবাঞ্ছনা পূরণ করিয়া থাকেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন—

قُلْ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ -

অর্থাৎ. হে নবী! আপনি বলিয়া দিন যে, আল্লাহ তা'আলাই তোমাদিগকে ঐ সকল আপদ-বিপদ ও বালা-মুসিবত এবং প্রত্যেকটি ইবাদতের মধ্যে এবং মোরাকাবা ও মোশাহাদার মধ্যে পীরের চেহারা আকৃতির ধ্যান করাকে তাছাব্বুর বলা হয়। আর পীরে অলৌকিকত্বের ধারণা পোষণ করা এবং মুরীদের মধ্যে অলৌকিক শক্তির প্রয়োগকে বলা হয়, তাছাররুফে শায়খ। হয়রানী পেরেশানী হইতে পরিত্রাণ দিয়াছেন। ইহার পরও তোমরা তাহার সাথে শির্‌কী করিতেছ! (সুরায়ে আল আন্‌য়াম)

* *তাছাব্বুর ও তাছাররুফ তরীকতপন্থীদের বিশেষ দুইটি পরিভাষা।*

পীর-মাশায়েখগণের প্রতি খোদায়ীত্বের গুণাবলীর বিশ্বাস পোষণ করার বিবরণ

পীরপূজারক ও কবর পূজারকদের আর একটি অবস্থা হইল যে, তাহারা মৃত পীর মাশায়েখগণকে অসীম শক্তির মালিক মোখতার মনে করিয়া তাহাদের রূহের নিকট রোগ-ব্যাধির সময় আরোগ্যতার প্রার্থনা ও অভাব-অনটনের সময় রুজী রোজগারের জন্য আবেদন নিবেদন করিয়া থাকে। অথচ এই সব বিষয় নিঃসন্দেহে প্রতিপালকত্বের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তাহার বান্দাদিগকে সুস্থ সবল স্বাস্থ্য এবং রিযিক দিয়া থাকেন এবং উহাদিগকে লালন-পালন করিয়া থকেন। এই সব লোক কাবা ঘরে বসিয়া একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য যে সব ইবাদতী কার্য করা হয়, সেইরূপ কার্যাবলী খুব জাঁকজমকের সাথে নিজেদের পীর মাশায়েখদের কবরের নিকট গিয়া যেমন কবরের উপর গেলাফ দেওয়া, নানান রংয়ের পর্দা ঝুলান, কবরকে স্পর্শ করা চুম্বন দেওয়ার এবং মুখে ও মনেপ্রাণে কবরকে তাওয়াফ করা সেখানে নজর-নিয়াজ দেওয়া, মান্নৎ করা, কবরের উপর কুরবানী দেওয়া, যে পানি দ্বারা কবরকে গোসল দেওয়া হয় সেই পানিকে জমজম কূয়ার পানির চাইতেও খুব বরকতময় পানি মনে করা। আর বায়তুল্লাহ শরীফকে দর্শন করার সময় যেরূপ ইবাদত ও কেবলা মনে করিয়া উহার প্রতি আদব ইহ্তেরাম সম্মান প্রদর্শন করা হয়, অনুরূপ পীর মাশায়েখদের কবর দর্শন করা এবং কবরস্থানের ইবাদত করাকে অন্যান্য স্থানের তুলনায় খুব ফজিলতপূর্ণ মনে করা। এই হইল ফকিরপোরস্ত ও কবরপোরস্তদের আকীদা বিশ্বাস ও জীবনের কর্মময় ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা। ইহারা যেই আদব ইহ্তেরাম ও সম্মান সারে জাহানের মালিক আল্লাহ তা'আলা রাব্বুল আলামীনের জন্য নিবেদিত করা অপরিহার্য ছিল, সেই আদব ইহ্তেরাম পীর ফকীরদের জন্য নিবেদন করার ধারণা কিরূপে পোষণ করিল? এই পীর ও কবর পোরস্ত সম্প্রদায়ের আর একটি নিদর্শন হইল যে, উহারা প্রতিটি গ্রামে ও বস্তীতে এক এক বুজর্গের কবরকে সাহেবে বেলায়েত (খোদা প্রাপ্তির মাধ্যম) বানাইয়া নেয় বা মনোনীত করিয়া থাকে। ইহাদের সকল বিষয়ের লক্ষ্যনীয় স্থানে পরিণত করিয়া নিয়াছে। আর এই বিদয়াতীরা নিজেদের ধারণা বিশ্বাস মাফিক এমন কতকগুলো প্রথা ও রোসূম রেওয়াজ বানাইয়া নেয়, যাহা সম্পূর্ণরূপে শরীয়ত বিরোধী এবং বাতেল প্রথা। যেমন উহারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের বিবাহের সময় নিজেদের ধারণা মাফিক ওলী-আল্লাহদের কবরের নিকট গিয়া তারিখ নির্ধারণ করে এবং উহার সেবামূলক কার্য করিয়া থাকে। বাদশাহের দরবারে যেরূপ নজর নেয়াজ পেশ করা হয়, তদ্রূপ কবরের নিকট গিয়া পীরের কাছে কোন বস্তু রাখিয়া আসে। রাজা বাদশাহগণের দরবারিগণকে যেরূপ খুশি করা হয় উহারাও কবরের খাদেম ও সেবায়েতগণের সাথে তদ্রূপ প্রথা অবলম্বন করে। শুধু এতটুকুই নয় বরং কতিপয় লোক এই সব কার্যাবলীর জন্য নিজেদের একজন ওকিল বা প্রতিনিধি নির্ধারিত করে যেন সে বিশেষ সময় মোয়াক্কেলের তরফ হইতে কবরের নিকট উপস্থিত হইয়া উহার কথিত উদ্দেশ্য পেশ করে। এই বিদয়াতীদের কাণ্ড কারখানার বিবরণ এইখানেই ক্ষান্ত নয়। উহাদের কুকীর্তির বর্ণনা শুনিতে হইলে মনোযোগ দিয়া শোন যে, বুজর্গানদের ওরসের সময় কবরের খাদেম ও সেবায়েতের হস্তদ্বারা বিশেষ করিয়া সাহেবে বেলায়েত কবরের খাদেম ও সেবায়েতগণের হস্ত দ্বারা নিজ মাথায় পাগড়ী বাঁধাইয়া নেয় এবং ইহাকে রাজ দরবারের উপঢৌকন স্বরূপ মনে করিয়া নিজকে ভাগ্যবান ভাবিয়া খুব খুশিতে বাড়ী চলিয়া আসে। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন—

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ.

অর্থাৎ, প্রতিটি দল নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস নিয়া খুশি থাকে ও গর্বিত হয়।

সুতরাং উহারা নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস মাফিক বিভিন্ন কথা, প্রথা ও রোসূম রেওয়াজ বানাইয়া নিয়া থাকে। যেমন উহারা বলিয়া থাকে যে অমুক চিশ্তীয়া তরীকার লোকটি নক্শাবন্দীদের বেলায়েতের অধীনে নিজ হেদায়েতের ডঙ্কা বাজাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু যখন সে কবরের নিকট দিয়া দণ্ডয়মান হইল তখন ঐ ওলী-আল্লাহর বাতেনীভাবে অলৌকিক শক্তি প্রয়োগের (তাছারুরুফের) কারণে তাহার নামকাম প্রসিদ্ধ হইল না। এই ধারণার উপর কিয়াস করিয়া বলে যে, শাহ বদীউদ্দিন মাদার (রঃ) যতক্ষণ পর্যন্ত ওলীয়ে হিন্দ শাহ মঈনুদ্দিন চিশ্তী (রঃ)-এর নিকট থেকে ভারতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতে তাহার বেলায়েতের সূর্য

উদয় হইতে পারে নাই। এইসব মর্মার্থ ঈমানে মাহমুদীর দ্বারাই হওয়া যাইতে পারে। পীর-ফকিরদের কিতাবে এই ধরনের বহু কথাই আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, যাহার মূল্য অলীক রূপকথা ও কিংবদন্তি কাহিনী বৈ কিছুই নয়।

পীর-বুযূর্গানদের হালতের পায়রবী কারা উচিত নয়

হক্কানী উলামায়ে কেরামগণের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহম করুন এবং তাহাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। তাঁহারা পীর বুজর্গানদের সম্পর্কে যে কথা বলিয়াছেন তাহা যথার্থই সহীহ কথা বলিয়াছেন। পীর বুজর্গান ও আওলীয়ায়ে কেরামগণের মানসিক অবস্থা ও কথা কার্য আল্লাহ তা'আলা অবিসংবাদিত ও মোতাসাহেব আয়াতের তরীকার ন্যায়। আল্ কুরআনের মোহকাম আয়াতগুলির অনুকরণ যেমন সহীহ তেমনি তাহারে কথা যদি শরীয়ত মাফিক হয়, তবে উহার পায়রুবী করিয়া চলা যাইতে পারে। আর তাহাদের অস্পষ্ট অবস্থা (হালত) ও অস্পষ্ট কর্ম চরিত্র যদি আল কুরআনের অস্পষ্ট (মোতাসাহেব) আয়াতের মত হয়, তবে আনুগত্য ও পায়রবী করা যাইবে না। কেননা আল কুরআনে অস্পষ্ট (মোতাসাহেব) আয়াতসমূহের পায়রুরবী করিয়া চলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ ইহার পায়রুবীর দরুন যে বহু লোক পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। আল কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলিতে এরশাদ হইতেছে—

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ـ (البقرة)

অর্থাৎ, ইহার পায়রুবীর কারণে আল্লাহ তা'আলা বহু লোককে গোমরাহ করিয়া থাকেন, আর বহু লোককে করিয়া থাকেন হেদায়েত দান। (সুরা আল বাকারাহ)

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলাই হইলেন সেই মহান সত্তা, যিনি আপনার কাছে কিতাব নাযিল করিয়াছেন।

এই কিতাবের কতিপয় আয়াত হইল স্পষ্ট (মোহকাম) আয়াত। আর ইহাই হইল কিতাবের মূল আয়াত এবং ইহার আনুগত্য করিতে হইবে আর কতিপয় আয়াত রহিয়াছে অস্পষ্ট, যাহা মানুষকে সন্দেহ ও গোলক ধাঁধায় নিপতিত করিয়া থাকে। সুতরাং যাহাদের অন্তঃকরণ বাঁকা এবং গোমরাহীতে ভরপুর তাহারা ফেৎনা-ফাসাদ ও মতদ্বৈধতা ছাড়াইবার উদ্দেশ্যে অস্পষ্ট আয়াতগুলির অনুসন্ধানে লাগিয়া যায় এবং ইহার ব্যাখ্যা দিয়া আনুগত্য করিয়া চলিতে থাকে। অথচ এই অস্পষ্ট আয়াতগুলির ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেহই জানেন না–' (সুরা আল ইমরান)

মিশকাত শরীফের লেখক স্বীয় কিতাবে আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন— 'আল কুরআন পাঁচ ধরনের আয়াত নিয়া নাযিল হইয়াছে। যেমন— ১. হালাল ২. হারাম ৩. স্পষ্ট (মুহ্কাম) ৪. অস্পষ্ট (মুতাশাবিহ) ও ৫. উদাহরণমূলক আয়াত (আমছাল) সুতরাং তোমরা হালালের নির্দেশকে হালাল এবং হারামের নির্দেশকে হারাম মনে করিতে থাক। আর স্পষ্ট আয়াতগুলির নির্দেশ মানিয়া চল আর যে সব অস্পষ্ট আয়াত রহিয়াছে উহার প্রতি বিশ্বস স্থাপন কর (কোনরূপ ব্যাখ্যা দিও না) এবং উদাহরণশীল ও ঘটনা বর্ণনামূলক আয়াতগুলি দ্বারা নসীহত গ্রহণ কর।'

বুযূর্গানে দ্বীনের অসাধারণ অবস্থার অনুকরণ বিরাট ফিৎনা-ফাসাদের কারণ

কতিপয় আওলীয়ায়ে কেরাম ও বুজর্গানে দ্বীনের দ্বারা এমন অসাধারণ ও আশ্চর্য্যজনক অবস্থা ও ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়ে, যাহার নিজ খেয়াল খুশিমত আনুগত্য করিয়া যাওয়া পরিণামে সমাজ জীবনে বিরাট ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হইবার কারণে পরিণত হয়। এই ধরনের ফেৎনা সাহাবায়ে কেরামগণের যমানায় উদ্ভব হওয়ায় 'তাহাদের সম্মিলিত মতামত দ্বারাই উহার মূলোচ্ছেদ করা হইয়াছে। যেমন নির্ভরযোগ্য কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, একবার হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে একজন বদরী সাহাবী, যাহাদেরকে আল্লাহ তা'আলা

এই পার্থিব জগতেই মাগফেরাতের সুসংবাদ দান করিয়াছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা তাহার নবীর যবানীতে এরশাদ করেন—

اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

অর্থাৎ, তোমরা যাহা খুশি তাহাই কর আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।

এই সাহাবী ভুলবশতঃ শরাব পান করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তাহাকে যখন গ্রেফতার করিয়া খলিফা হযরত উমর (রাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত করা হইল, তখন তিনি খলিফার নিকট এই বলিয়া ওজরখাহী পেশ করিলেন যে, 'আমি একজন বদরী সাহাবী। আল্লাহ তা'আলা আমাদের গুনাহ-খাতা মাফ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং শরাব পান করায় আমার কোন গুনাহ হয় নাই এবং আমার উপর শরীয়তের দণ্ডবিধানও প্রয়োগ হইতে পারে না।' কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) সমগ্র সাহাবায়ে কেরামগণের সম্মুখে তাহার প্রতি শরীয়তের দণ্ডবিধান প্রয়োগ করিলেন।' এই ঘটনার দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয় যে, আওলীয়ায়ে কেরাম এবং আল্লাহ তা'আলার একান্ত আপনজন হইলেও শরীয়তের বিধানের বেলায় সমগ্র সাধারণ অসাধারণ মানুষ সমমর্যদা সম্পন্ন। সুতরাং যে কাজ শরীয়তের দৃষ্টতে খারাপ ও মন্দ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা এইসব লোকের দ্বারা হইলে কখনোই সৎ ও ভাল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আর এই পার্থিব জগতেও তাহাদের বেলায় শরীয়তী দণ্ডবিধান কখনোই মওকুফ বা রহিত হইয়া যাইতে পারে না। তবে পরকালের ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারাধীন। তিনি ইচ্ছা করিলে যে কাউকে ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন। আবার যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তিও দিতে পারেন। সবই তাঁহার মর্জি।

সতর্কবাণী

এই কথা আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, এই স্থানে এমন দুইট গ্রুপ গাফলতী ও শৈথিল্যের মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছে, যাহারা খারেজী ও রাফেজীদের ন্যায় আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণের প্রতি মহব্বত, ভালবাসা এবং বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করার কারণে গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত। খারেজী মতাবলম্বীরা বলিয়া থাকে যে, অমুক লোকটি যদিও বহু নেক কাজ করিয়া থাকে কিন্তু সে

অমুক অন্যায় কাজটির দরুন মরদুদ হইয়া গিয়াছে। তাহার কোন কাজ ও কথাই অনুসরণযোগ্য নয়। আর রাফেজী মতাবলম্বীরা বলিয়া থাকে যে, অমুক লোকটি যাঁহাই করুন বা বলুক না কেন তাহা যদি শরীয়তের খেলাফও হয় তথাপি উহার অনুকরণ অনুসরণ অপরিহার্য।

যেমন কবি হাফিজ বলিয়াছেন—

بمے سجاد ور نگین کن گرت پیر مغان گوید *

که سالك بخبر نبود زراه ورسم منزلها

অর্থাৎ, পীর যদি জায়নামাযকে শরাব দ্বারা রঙ্গীন করিয়া ফেলিতেও বলেন তবে তাহা কর। কেননা সালেক পথের চিহ্নগুলি এবং তাহার মনযীল মাকসুদ সম্পর্কে অনবহিত থাকেন না।

হযরত আলী (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়া ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল (রঃ) তদীয় মসনদ কিতাবে একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, 'হে আলী। তোমার উদাহরণ হযরত ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় অর্থাৎ ইয়াহুদিগণ তাহার প্রতি এত কঠোর শত্রুতা পোষণ করিত যে, তাহার মাতার নামে মিথ্যা অপবাদ রটাইতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। আর নাসারাগণ তাহাকে এত বেশী ভালবাসিত যে, উহারা ভালবাসার আতিশয্যে উঠিয়া তাহার মানমর্যাদা এতখানি উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছিল, যাহা তাহার প্রাপ্য ছিল না। এই হাদীসটি বর্ণনা করিবার পর হযরত আলী (রাঃ) বলেন— 'আমার বিষয় নিয়া দুই শ্রেণীর মানুষ ধ্বংস হইয়া যাইবে। একশ্রেণীর মানুষ হইল যাহারা আমাকে সীমাতিরিক্ত ভালবাসিয়া থাকে এবং আবার এমন গুণগরিমা বর্ণনা করিয়া থাকে, যাহা আমার মধ্যে বর্তমান নাই। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হইল আমার শত্রুগণ। আমার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করিতে গিয়া তাহারা আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিতেও দ্বিধাবোধ করে না।

সুতরাং এই হাদীসটিই ঐ দুইটি গগ্রুপের গোমরাহীর উজ্জ্বল প্রমাণ।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের তরীকা

আল কুরআনের সুরায় ফাতেহার ইহ্‌দিনাস সীরাতাল মুস্‌তাকীম হইতে শেষ পর্যন্ত আয়াগুলির ব্যাখ্যায় তাপসীরকারকগণ বলিয়াছেন যে, মাগদুবে আলাইহীম দ্বারা ইয়াহুদী গ্রুপের কথা বুঝান হইয়াছে। বুজর্গানে দ্বীনের নামে মিথ্যা অপবাদ প্রচারে এবং তাহাদিগকে অপমানকরণে খারেজী সম্প্রদায়টির সাথে এই গ্রুপটির সাদৃশ্য রহিয়াছে। আর অলাদ দুয়াল্লীন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নাসারাদের গুণ-বৈশিষ্ট্যর কথা বিবৃত করিয়াছেন। সীমাতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শন এবং তাজীম-তাকরীম করণে এই সম্প্রদায়টির উদাহরণ হইল রাফেজী ফের্কাটি। সুতরাং চরম ও নরম পন্থা শূন্য সরল সহজ সীরাতুল মুস্তাকীম-এর উপর পরিচালিত জামায়াতই হইল একমাত্র আহ্‌লে সুন্নাৎ অল জামায়াত। তাহাদের কর্মপন্থা হইল স্বচ্ছ ও স্পষ্ট বিষয়গুলিকে কার্যকরী করা এবং খারাপ ও অপরিষ্কার হইতে দূরে থাকা; যেমন বলা হইয়াছে—

خُذْ مَا صَفَادَعْ مَاكَدَرَ۔

অর্থাৎ, যাহা কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নির্ভেজাল ও স্পষ্ট তাহা তোমরা আকড়াইয়া ধর। আর অপরিষ্কার ও পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া চল।'

এই তরজমাটির দ্বারা মনে হইতেছে যেন ইহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই হাদীসটির তরজমা যেখানে তিনি হযরত ঈমাম হাসান (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—

مَايُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَايُرِيْبُكَ۔

অর্থাৎ, যে বস্তু তোমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলিয়া দেয় সেই বস্তু পরিত্যাগ কর। আর যাহার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ নাই তাহা গ্রহণ কর।

তাই আহ্‌লে সুন্নৎ অল জামায়াত বুজর্গানে দ্বীনের নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া তো দূরের কথা তাহাদের ব্যাপারে আদৌ কোনরূপ জিহ্বাই নাড়াচাড়া করে না। বরং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাহারা এই বলিয়া প্রার্থনা জানায়—

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ۔

অর্থাৎ, হে আমাদের পরওয়ারদিগার। আমাদিগকে হেদায়েত করার পর আমাদের অন্তঃকরণকে গোমরাহ করিবেন না। আপনার তরফ হইতে আমাদের জন্য রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি রহমত দানকারী।' (সূরা আল ইমরান)

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔

অর্থাৎ, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদিগকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার ভাই-ভগ্নিগণকে ক্ষমা করিয়া দিন। ঈমানদারগণের বেলায় আমাদের অন্তঃকরণে কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবেন না। নিশ্চয় আপনি দয়ালু ও মেহেরবান। (সূরা আল্ হাশর)

শির্‌কী অজীফা

পীরের জন্য সীমাতিরিক্ত এল্‌ম ও জ্ঞান প্রমাণিত করার এবং তাহারা সৃষ্টি কুলের হাকিকত ও গোপন তত্ত্ব-রহস্য সম্পর্কে অবিহিত থাকার বিশ্বাস ও এতেকাদ পোষণের দ্বিতীয় আলামত হইল যে, অধিকাংশ সময় উহারা পীরের নিকটে ও দূর-দূরান্তে থাকিয়া হাজত পূরণের সাহায্যের দরখাস্ত করিয়া থাকে। আর যিকিরের নিয়ামনুসারে সকাল সন্ধায় এমন অজীফা অপরিহার্যরূপে পাঠ করিয়া থাকে, যেই অজীফার দ্বারা পীর বুজর্গানদের নাম নিয়া তাহাদেরকে ডাকা হয়। এই নিয়মে তাহারা বুজর্গানদের নাম দ্বারা এস্তেখারাও নির্ণয় করিয়া থাকে। ভালমন্দ অবস্থায় এবং পার্থিব কার্যাবলীর ব্যাপারে বুজর্গানদের আত্মার নিকট এস্তেখারার সাথে কল্যাণ কামনা করিয়া থাকে। যেমন খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শাবন্দী (রঃ)-এর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণকারীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক উঠাবসার সময় এবং কাজের শেষে 'ইয়া বাহাউদ্দিন মুশকিল কুশা।' অজীফা পাঠ করে। আবার কতিপয় লোক খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা, অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের জন্য 'ইয়া নিজামুদ্দিন আওলিয়া যরী যর বখশ' অজীফা পাঠ করে। আবার কতিপয় লোক এই নিয়ম নিয়াছে যে, প্রত্যেকটি প্রয়োজনের মুহূর্তে 'ইয়া শায়খ আব্দুল কাদের জ্বিলানী শাইয়্যান লিল্লাহ

অজীফা পাঠ করাকেই যথেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এইগুলি যে সম্পূর্ণরূপে ভেজাল, মিথ্যা ও আজেবাজে কথা সে বিষয় আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। এই ধরনের মর্মার্থ সম্বলিত কোন অজীফা তরীকতের মধ্যে বর্তমান আছে বলিয়া যেমন কোন প্রমাণ নাই, তেমনি নির্ভরযোগ্য বুজর্গানদের তরফ হইতে এ ধরনের কোন কথা উল্লেখ নাই। বরং নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে বুজর্গানদের জীবন-চরিত্র আলোচনার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইহারা নিজেদের মুরীদ ও ভক্তবৃন্দকে সর্বদা সৃষ্টির পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হইতে বিরত রাখিয়াছেন। শায়খ শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রঃ) তদীয় কিতাব 'আওয়ারেফুল মাওয়ারেফে' লিখিয়াছেন—

মুরীদের নিষ্ঠা ও ইখলাছ তখন পর্যন্ত প্রমাণিত হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সুন্নাতের বেলায় শরীয়তের হুকুমের আনুগত্য করিবে এবং সৃষ্টিকুল হইতে স্বীয় দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখিবে। মহল্লাবাসীদের উপর যে বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবত পতিত হইয়া থাকে তাহার কারণ হইল সকল বিষয় সৃষ্টিকুলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। আমাদের নিকট রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীস রহিয়াছে। তিনি উক্ত হাদীসে এরশাদ করেন— মানুষের ঈমান তখন পর্যন্ত পূর্ণাংগ হইতে পারে না, যত সময় পর্যন্ত মানুষ তাহার নিকটে দুর্বলদের ন্যায় না হইবে এবং স্বীয় আত্মার পানে মনোনিবেশ করিয়া নিজকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও ছোট দেখিতে পাইবে।

খাজা আলাউদ্দিন আত্তার (রঃ)-এর জীবন চরিত্রের আলোচনায় মাওলানা জামী (রঃ) 'নফাতুল ইন্স' কিতাবে খাজা সাহেব থেকে উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি বলেন 'খাজা বাহাউদ্দিন (রঃ) বলিয়াছেন— আল্লাহ তা'আলার খাদেম ও সেবায়েতগীরির চাকুরী নেওয়া সৃষ্টিকুলের সেবায়েতগীরির চেয়ে উত্তম ও জরুরী। যেমন তরীকত পন্থী আরেফগণের কণ্ঠে প্রায়ই এই কবিতাটি ঝংকারিত হইতে শুনা যায়—

تـوتـاکـے گـور مـردان راپـرسـتـی *

کـار مـردان کـن درسـتـی -

অর্থাৎ, তুমি মানুষের কবর পূজা করিয়া নিজের সংস্কার ও সংশোধন করিতে যাইও না। বরং ঐ সব মহাত্মাগণের কাজের অনুকরণ করিয়া নিজ সত্তার সংস্কার ও সংশোধন কর।

গাওসুল আজম শায়খ আবু মুহম্মদ মহিউদ্দিন জিলানী (রঃ) 'ফতহুল গায়ব কিতাবে বলেন— 'যে ব্যক্তি ইহকালে ও পরকালে শান্তির প্রত্যাশা করে তাহার জন্য ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে আল্লাহর প্রতি রাজী থাকা এবং সৃষ্টির নিকট নিজ অবস্থার শেকায়েত ও অভিযোগ, দুঃখ দর্দশা ও হাজতকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে যবানেহাল ও কাল দ্বারা অর্থাৎ মৌখিক ভাষা ও বাস্তব অবস্থার দ্বারা প্রার্থনা একান্তভাবে অপরিহার্য কর্তব্য। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট শান্তি ও সুখ সমৃদ্ধির আশা পোষণ করাও অপরিহার্য। কারণ আল্লাহ তা'আলা অন্যান্যদের তুলনায় সীমাহীন কল্যাণের আঁধার।'

অভিনব কথা ও উহার জবাব

পীর পোরস্তদের উল্লেখিত কথা ব্যতীত আরও বহু অভিনব কথা রহিয়াছে। তাহারা আল কুরআনের আয়াত রাসূলে করীমের হাদীস এবং উম্মতে আওলিয়ার সারগর্ভপূর্ণ বাণীসমূহের মোকাবিলায় মনগড়া ও জ্ঞানগত ব্যাখ্যা দিয়া বলিয়া থাকে যে, সৃষ্টিকূলের মধ্যে ওলী-আল্লাহগণের দখল রহিয়াছে। আর এই আকীদা-বিশ্বাস পোষণের ফলেই তাহারা দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অনটন ও বিপদ-আপদের সময় তাহাদিগকে ডাকে এবং তাহাদের নিকট হাজত পূর্ণ করার জন্য দরখাস্ত পেশ করাকে কোনরূপ ক্ষতি বা গুনাহর কাজ বলিয়া মনে করে না। তাহারা নিজেদের কথা, দাবী ও আকীদা-বিশ্বাসের সমর্থনে মাওলানা রুমীর নিম্নলিখিত পদ্যাংশটি উল্লেখ করিয়া থাকে। যেমন তিনি বলেন—

اولیاء رهست قدرت ازاله *

تیر جسة باز گر دانند زراه .

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ আল্লাহর তরফ হইতে শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন। তাহারা খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে লক্ষ্য বিন্দুতে নিক্ষিপ্ত তীরটিকেও তার স্বস্থানে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম।

অথচ আল্লাহ তা'আলা কালামে মজীদে এরশাদ করেন—

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهٖ -

অর্থাৎ, তোমার উপর নিপতিত বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবতকে আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই বিদুরীত করিতে পারে না। আর যদি তোমার প্রতি সদয় হইবার ইচ্ছা পোষণ করেন, তাহার ফজল, করম ও রহমতকে কেহই বাঁধিয়া রাখিতে পারে না।

হাদীস শরীফে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন— 'যদি সমগ্র লোকও তোমাকে এমন বস্তুর দ্বারা উপকার করিতে চায়, যাহার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। আর যদি সমগ্র মানুষ একত্র হইয়াও এমন বস্তুর দ্বারা তোমার ক্ষতি সাধন করিতে ইচ্ছা করে, যাহার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোন ফয়সালা ও মঞ্জুরী নাই, তবে এই ক্ষেত্রেও তাহারা সফলতা লাভ করিতে পারিবে না।'

এখানে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীসের কিয়দংশ উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলেন—

আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একত্রে যানবাহনে উপবিষ্ট ছিলাম। এই সময় তিনি আমাকে বলিলেন, হে বৎস! তুমি আল্লাহ তায়ালার হক্ক ও অধিকারকে রক্ষা করিয়া চল। আল্লাহ তায়ালাও তোমার হক ও অধিকারকে রক্ষা করিয়া চলিবেন এবং তুমি তাঁহাকে নিজের সম্মুখেই পাইবে। আর যখন তোমার কোন বস্তু কাহারো নিকট চাইতে হয়, তখন তাহা আল্লাহ তা'আলার নিকটেই চাও। আর সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইলে আল্লাহ তা'আলার নিকটই প্রার্থনা কর ভাবীকালে যাহা কিছু হইবার তাহা কলম লিখিয়া ফেলিয়া তাহার কালী শেষ করিয়া ফেলিয়াছ। পরিশেষে তিনি এরশাদ করিলেন দুঃখের পর সুখ, বিপদের পর আরাম (এই হাদীসটি নিজ ভাষাসমেত সমগ্র হাসীদের কিতাবেই উল্লেখ রহিয়াছে এবং ফতহুল গায়ব কিতাবেও বর্তমান পাওয়া যায়।)

সুফীগণের বাণী

ফতহুল গায়ব কিতাবে গাওসুল আজম শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রঃ) উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন— সুতরাং প্রত্যেক মুমীন ব্যক্তির উপর দুনিয়া আখেরাতে সম্মানজনক জীবন যাপন করার জন্য এবং সকল আপদ-বিপদ ও বালা-মুসিবত হইতে নিরাপদে থাকার উদ্দেশ্যে এই হাদীসটিকে স্বীয় অন্তঃকরণ, জাহের-বাতেন, জীবনের সকল কথায় ও কাজে আয়না ও কষ্টিস্বরূপ বানাইয়া নেওয়া ওয়াজিব। 'ইহার পর তিনি বলেন, 'মানুষের নিকট কখনো সওয়াল করিও না এবং কোন কিছু চাহিও না— যে ব্যক্তি মানুষের নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করে সে এই কারণে করে যে, সে আল্লাহ তা'আলাকে চিনে নাই, জানে নাই এবং বুঝে নাই। তাহার একিনের দুর্বলতা এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার স্বল্পতার কারণেই সে এইরূপ মানুষের কাছে সওয়াল করিয়া থাকে।' এই হাদীসটি এবং ইমামে তরীকত শায়খ মহিউদ্দিন জিলানী (রঃ)-এর কথা দ্বারা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, পীরপোরস্ত ও কবরপোরস্তদের কর্মপদ্ধতির সাথে যেমন শরীয়তের কোন সম্পর্ক নাই, তেমনি নাই কোন সম্পর্ক তরীকতের সাথে। তাহারা যদি মুলহেদ (নাস্তিক)-গণের ন্যায় এই কথা বলিয়া ফেলে যে, আমাদের এই কার্যাবলী হইতেছে হাকিকত, শরীয়ত ও তরীকত সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান নাই। সে বিষয় পয়গম্বরগণ এল্‌ম রাখিয়া থাকেন তবে তাহাদের জবাব শায়খ মহিউদ্দিন জিলানী (রঃ) 'ফতহুল গায়ব' কিতাবে বলিয়াছেন যে, যেই হাকিকতের কোন সাক্ষী থাকে না এবং যাহা শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত হয় না সে হাকিকত— হাকিকত নয় বরং কুফরী। শায়খ আবুদল হক মোহাদ্দেসে দেহলবী (রঃ) ইহার ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন, 'আমাদের ইহা সম্যক অবগত হওয়া উচিত যে কোন কাজের হাকিকত শরীয়তের বিরোধী ও পরিপন্থী হয় না বরং আসলে শরীয়তেরই অপর এক নাম হাকিকত। আর তাহা এই দিক দিয়া যে, যে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান পোষণ করা হইয়াছে তাহা চাক্ষুষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে এবং মূল হাকিকত পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তির কাছে শরীয়তের পরিপন্থী বিষয়বস্তু কাশ্‌ফের মাধ্যমে প্রকাশ

হইয়া পড়ে, তবে উহাকে মিথ্যা ও বাতেল ভাবিতে হইবে। ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে।'

শায়খ আবু সোলায়মান দারানা (রঃ) বলেন 'মাঝে-মধ্যে আমার কাছে ওয়াজদের মূল তত্ত্ব-রহস্য (তাওহীদের নেশায় আত্মহারা অবস্থার মূল তত্ত্ব) প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং রূপ সৌন্দয্যের সাথে স্বীয় মোহনীয় রূপ মাধুর্যটি প্রদর্শন করিতে চায়, কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত এইসব বস্তুকে আমি গ্রহণ করি না, যত সময় ইহার স্বপক্ষে দুইজন সাক্ষী অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাতকে সাক্ষ্যরূপে না পাই। স্মরণ রাখিও যে, তরীকতের বিশেষজ্ঞগণের নিকট শুহুদের মাকাম ও তাওহীদের মাকাম হইল শরীয়তের সীমারেখা সংরক্ষণের শর্তে সিদ্দিকীন ও আরেফীনদের মাকাম অর্থাৎ শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করিয়া শুহুদ ও তাওহীদের মাকামে পৌছা হয়। কতিপয় মানুষ এই মাকামে উপনীত হইলে হয়রানী পেরেশানী ছাড়া তাহারা কিছুই লাভ করিতে পারে না। আবার কতিপয় লোক এই স্থানে উপনীত হইয়া নিজে ইসলামের গণ্ডী সীমা হইতে বাহির হইয়া নিজের দ্বীনকে নিজের হাতেই বরবাদ করিয়া দেয়। মোটকথা দ্বীন একটি মাত্রই শরীয়ত। তরীকত ও হাকিকত হইল উহার বিভাগ, স্তর ও শ্রেণীগত মর্যাদার আসন বিশেষ।' (ইন্তেহা কিতাব দ্রষ্টব্য)

শায়খ আবু সাঈদ খাযার (রঃ) যাহাকে প্রাচীন শীর্ষস্থানীয় মাশায়েখগণের মধ্যে গণ্য করা হইয়া থাকে, তিনি বলেন, যে অধ্যাত্মিকতা বা রূহানিয়াত জাহেরী শরীয়তের পরীপন্থী হয় তাহা বাতেল ও প্রত্যাখ্যাত হইবে। সায়রুললিল মাশায়েখ কিতাবে এই ধরণের একটি ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে যে, একদিন হযরত বাহাউদ্দিন (রঃ) স্বীয় অভ্যাস মাফিক ফজরের নামায জামায়াতে আদায় করার জন্য মসজিদে উপস্থিত হইলেন। এদিকে ইমাম এক রাকায়াত পড়িয়া ফেলিয়াছেন তিনি দ্বিতীয় রাকায়াতে গিয়া অংশগ্রহণ করিলেন। অতঃপর আখেরী বৈঠকের শেষে ইমামের সালাম ফিরাইবার পূর্বে তিনি অনাদায়কৃত রাকায়াতটি পুরা করার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নামাজের কাজ সমাধা করিয়া সালাম ফিরাইলে পর ইমাম সাহেব তাহাকে বলিলেন, হুযূর! ইমামের সালাম ফিরাইবার পূর্বে দাঁড়ান দুরস্ত নাই।

কেননা ইমামের নামাযের মধ্যে ভুল হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান সুতরাং এমতাবস্থায় সোহ সিজদায় ইমামের আনুগত্যকরণ থাকিয়া যায়, তাই ইমামের সালাম ফিরাইবার পূর্বে উঠিয়া দাঁড়ান জায়েয নাই। শায়খ জবাব দিলেন— বাতেনী নূর দ্বারা যদি ইহা অবগত হওয়া যায় যে, এই নামাযে ইমামের ভুলভ্রান্তি হয় নাই, তবে ইহাতে কোন দোষ নাই। তখন ইমাম সাহেব বলিলেন, যেই নূর শরীয়তের পরিপন্থী হয় সেই নূর— নূর নয় বরং অমানিশা ও অন্ধকার।

শায়খ আবু আবদুল্লাহ হারেস-বিন-আসাদ মোহাসেবী (রঃ) যাহাকে প্রাচীন আহলে তরীকত ও উলামায় মাশায়েখগণের মধ্যে গণ্য করা হয়, তিনি বলেন যেই লোকেরা বাতেন মোরাকাবা ও ইখলাস দ্বারা দুরুস্ত হইয়া গিয়াছে আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির জাহেরকে মোজাহেদা ও সুন্নাতের পায়রুবী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া তোলেন।

আহলে তরীকতের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে অন্যতম বুজর্গ শায়খ আবু হাফস কবীর (রঃ) বলেন— যেই ব্যক্তির কথা, কাজ ও চারিত্রিক অবস্থাকে শরীয়তের তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা হয় নাই এবং সে শয়তানী ওয়াসওয়াসা হইতে বিরত রহে নাই, তাহাকে মানুষের দপ্তরে গণ্য করিও না।

শায়খ আবু ইয়াযীদ বুস্তামী (রঃ) যিনি সমসাময়িক কালে সুলতানুল আরেফীন উপাদীতে ভূষিত হইয়াছিলেন, তিনি বলেন— যদি তোমরা কোন লোককে দেখিতে পাও যে, সে বিভিন্ন প্রকার কেরামতী ও অলৌকিক ঘটনা দেখাইতেছে এমন কি যদি কাহাকেও বায়ু মণ্ডলে উড়িতে এবং পানির উপর পদচারণা করিতেও দেখ, তবে তাহাকে শরীয়তের হুকুম আহকাম ও সীমারেখা মানিয়া চলার ব্যাপারে কি ভূমিকা পালন করিয়া থাকে তাহা পরীক্ষা করিয়া না দেখা পর্যন্ত তাহার দ্বারা প্রতারিত হইও না এবং তাহার যাদুমন্ত্র জালে আবদ্ধ হইয়া নিজের দ্বীনে ঈমানকে বিনষ্ট করিও না।

সুফীগণের সর্দার ও তরীকত পন্থীদের ইমাম হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (রঃ) বলেন— আল্লাহ তাআলার দরবারে পৌছার জন্য এবং তাহার মারেফাত লাভ করিবার জন্য খোদার সৃষ্টিকুলের শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা পরিমাণ পথ রহিয়াছে। কিন্তু রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাংক

অনুসরণ করিয়া চলিবার পন্থা ব্যতীত সৃষ্টিকুলের জন্য অন্যান্য সকল পন্থা বন্ধ রহিয়াছে। সেই পথে যতই চেষ্টা করা হউক না কেন আল্লাহ তাআলার দরবারে পৌছা যাইবে না এবং তাহার মারেফাতও অর্জন হইবে না।

উল্লেখিত বুজর্গানে দ্বীনের কালামের সংক্ষিপ্ত সার হইল সুন্নাতে রাসূলের আনুগত্য ও পায়রুবী ওয়াজিব হওয়া আমরু বিল মা'রুফ নাহী আনেল মুনকারের (সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় অসৎকাজের বিরোধিতার) উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকা। আর শরীয়ত বিরোধী লোকদের দ্বারা যেই অস্বাভাবিক ও অসাধারণ ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়া থাকে তাহার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তাআলা এরশাদ ফরমাইয়াছেন—

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ـ

অর্থাৎ, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য জাহেরী ও বাতেনী গুনাহর কাজ পরিত্যাগ কর।

আল কুরআনে এই আয়াত দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, কোন লোকের জন্য শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েয নাই। কেননা শরীয়তের খেলাপ করা জাহেরী গুনাহর কাজ। আর শরীয়তের পরিপন্থী কাজের পায়রুবীকারীও নিঃসন্দেহে জাহেরী গুনাহর কজের অনুসারী। এই একই বিষয়বস্তু হাদীস শরীফ অন্য ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বায়হাকী (রঃ) তদীয় শো'বুল ঈমান কিতাবে ইব্রাহীম বিন মাইসারাহ্ (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ ـ

অর্থাৎ, বিদয়াতীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সত্যদ্বীনকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার নামান্তর।

আসল কথা হইল বিদয়াতীদেরকে কখনোই সম্মান করা উচিত নয়। কেননা বিদয়াতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আসলে ইসলামকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। এ ব্যাপারে শীর্ষস্থানীয় পীর বুজর্গ ও মাশায়েগণ খুবই স্বার্থকতা অবলম্বন করিয়া চলিতেন।

মনসুর হাল্লাজ সম্পর্কে শায়খ নিজামুদ্দিন আওলিয়ার ফত্ওয়া

বর্ণিত আছে যে, প্রখ্যাত আবেদ হোসাইন বিন মনসুর হাল্লাজ অত্যধিক ইবাদত-বন্দেগীতে দিন কাটাইয়া দিতেন। দৈনিক রাত্রে তিনি একহাজার রাকায়াত নফল নামায পড়িতেন। কিন্তু যখন তাহার মুখ হইতে আনাল হক (আমিই চিরন্তন সত্য) শব্দ নির্গত হইতে লাগিল, তখন শায়খ জোনায়েদ বোগদাদী রহমতুল্লাহ আলাইহি সহ অন্যান্য মাশায়েগণ তাহাকে কতল করিয়া ফেলার ফতুয়া দিলেন। সুতরাং পরিশেষে তাহাকে শুলদণ্ডে চড়াইয়া হত্যা করা হইয়াছিল। আখবারুল আখীয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে যে, শায়খ নিজামুদ্দিন আওলিয়ার নিকট মানসুর হাল্লাজ সম্পর্কে ফতুয়া জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি তাহাকে মরদুদ বলিয়া ফতুয়া দিয়াছিলেন। হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (রঃ) ছিলেন সমসাময়িক কালের সকল আহলে তরিকত ও পীর মাশায়েখগণের ইমাম। তাহার দ্বারা মনসুর হাল্লাজ প্রত্যাখাত হওয়ায় সকলের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। সাইয়েদ মহিউদ্দিন জিলানীর আলোচনা আখবারুল আখীয়ার কিতাবে উল্লেখ হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন— মনসুর হাল্লাজের পদস্খলনের সময় তাহাকে সাহায্য করার মত এবং তাহা হইতে মুক্তিকরণের নিমিত্ত কোন লোক বর্তমান ছিল না। আমি যদি সেই যমানায় থাকিতাম তবে আমি তাহাকে সাহায্য করিতাম এবং ঐ পর্যন্ত তাহাকে পৌঁছিতে দিতাম না।'

হযরত আব্দুল কাদির জীলানী (রঃ)-এর বিবৃতি দ্বারা বুঝা যায়, যে সকল বুযুর্গ লোক যে সত্য জ্ঞাত হইবার দাবী করিয়া থাকেন এবং তাহা মারেফাতের মূলতত্ত্ব এবং তাওহীদের আসল নির্যাস ভাবিয়া থাকেন আসলে তাহা এই সকল বুজর্গানে দ্বীনের কাছে পদস্খলন, বাতেল ও প্রত্যাখাত বিষয়। বস্তুতঃ এখন একথা প্রমাণিত হইল যে যাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত এবং সাহাবায় কেরামগণের তরীকার খেলাফ কোন তরীকার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া বুজর্গানে দ্বীন পীর মাশায়েখগণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও মহব্বত পোষণের দাবি করিয়া থাকে, তাহাদের এই দাবী অন্তঃসার শূন্য মৌখিক দাবি বৈ কিছুই নয়।

বিস্ময়কর নির্বুদ্ধিতা

পীরপোরস্তদের দাবীকে আল কুরআনের আয়াত, রাসূলের হাদীস এবং শীর্ষস্থানীয় মাশায়েখগণের জীবনাদর্শ ও কর্ম চরিত্র যখন অসার ও মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া দেয়, তখন তাহারা রাফেজীদের ন্যায় উন্মাদ হইয়া বলিতে থাকে যে, এই সব বুজর্গান মারেফাতের এহেন তত্ত্ব রহস্যকে সাধারণ লোকদের থেকে গোপন রাখিয়াছেন এবং নিজেদের বিশেষ সহচর ও মুরব্বীগণকেই এই ইল্‌ম দান করিয়াছেন। তাহাদের কথা দ্বারা মনে হইতেছে যে, তাহারা বুজর্গানে দ্বীনের প্রতি অন্যায় অপবাদ চাপাইয়া দিয়া তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিতেছে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ব্যাধির চিকিৎসা পত্রের কথা বলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং দ্বীনি বিষয়ক প্রবণতার উপর নির্ভরশীল করা এবং মোতাকাদ্দেমীনদের (পূর্ববর্তীদের) মধ্যে উহা প্রচলিত থাকার উদ্ধৃতি দ্বারা বর্ণনা করা উচিত। যেমন হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন— আখেরী যমানার দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদী লোক বাহির হইয়া তোমাদেরকে এমন সব অভিনব হাদীস বর্ণনা করিয়া শুনাইবে, যাহা তোমরা তো দূরের কথা তোমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ববর্তীগণও কখনো শুনে নাই। সুতরাং তোমরা ইহার ব্যাপারে সতর্ক হইয়া চল, যেন ইহা দ্বারা তোমদিগকে গোমরাহ করিতে না পারে এবং ফেৎনার মধ্যে নিপতিত না করে। এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম তার কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে দাজ্জালুনা শব্দ দ্বারা পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইতেছে ষড়যন্ত্রমূলক হাদীস দ্বারা শরীয়ত বিরোধী বর্ণনাকে প্রমাণিত ফল দাজ্জালী ছাড়া কিছুই নয়। ইহা অলৌকিকত্ব, যাহার পরিণাম ফল দাজ্জালী ছাড়া কিছুই নয়। ইহা আলৌকিক ও অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে এমন রূপে প্রকাশ করিয়া থাকে যেন মানুষের মনে কারামতীর রং-এ রংঙ্গীন হইয়া বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং মানুষ ফেৎনার মধ্যে নিপতিত হইয়া পড়ে।

ঈমান-আক্বীদার ক্ষেত্রে সুন্নাত অনুসরণের তাকীদ

জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া ঈমান আকীদার বেলায় পূর্ণরূপে সুন্নাতের পায়রুবী করার জন্য রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকীদ ফরমাইয়াছেন। তিনি বলেন—

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে ফেৎনা ফাসাদ এখতেলাফ ও মতদ্বৈধতার সময় আমার সুন্নতকে দৃঢ়তার সাথে আকড়াইয়া ধরিবে সে একশত শহীদের সওয়াব পাইবে।

ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল, ইমাম দারেমী এবং ইমাম নাসায়ী (রঃ) নিজ নিজ কিতাবে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটিতে একটি সরলরেখা টানিয়া বলিলেন— এই রাস্তাগুলি হইতেছে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পথ। ইহার পর ঐ সরল রেখাটির ডানদিকে ও বামদিকে আরো কতগুলি রেখা টানিয়া বলিলেন— এই রাস্তাগুলি হইতেছে শয়তানের মনোনীত পথ। মানুষকে এই পথে ডাকার জন্য উহার প্রত্যেকটির উপর শয়তান বসিয়া রহিয়াছে এবং মানুষকে ঐদিকে ডাকিতেছে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল কুরআনের এই আয়াত পাঠ করিলেন—

هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَاتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ذَالِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

অর্থাৎ, এই মধ্যম পন্থাটি হইল সরল সহজ রাস্তা। একমাত্র এই পথটির উপরই চল। অপরাপর পথের অনুসরণ করিয়া চলিও না। যদি তাই কর তবে উহা তোমাদিগকে আল্লাহ তা'আলার পথ হইতে দূরে সরাইয়া নিয়া যাইবে। ইহকালে পরকালে-মুক্তির জন্য এই পথে তোমাদিগকে চলিবার অসীয়ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ শয়তানী পথগুলি পরিত্যাগ করা ব্যতীত সরল সহজ পথে আসা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

শরহে সুন্নাহ কিতাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন— কোন ব্যক্তিরই ঈমান তখন পর্যন্ত দুরুস্ত হইতে পারে না— যতক্ষণ না তাহার অভিমত ও রায় আমার আনিত দ্বীনের অনুবর্তি না হয়। অর্থাৎ ঈমানের বেলায় কোনরূপ নফসের খাহেশ ও প্রবৃত্তির কামনার অনুগত হওয়া

উচিত নয়। কেননা ইহা দ্বারা ঈমান নষ্ট হইয়া যায় এবং শরীয়তের শর্ত সীমারেখা হইতে স্বাধীন হইয়া মানুষ শয়তানের জেল খানায় বন্দী হইয়া পড়ে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন দ্বীন ও জীবনাদর্শ নিয়া আসিয়াছেন যাহা ঈমান ও বিশ্বাস আমল ও কাজ উভয়কে সামিল করিয়া নিয়া থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ন্যায় আমল করা এবং সাহাবায় কেরামগণের তরীকা ও জীবনাদর্শ পূর্ণরূপে গ্রহণ খুবই কঠিন ব্যাপার। সুতরাং প্রয়োজন মাফিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সকলকেই আল্লাহ তায়লার নিকট জাবাবদিহি করিতে হইবে কিন্তু ঈমান আকীদার ব্যাপারে সমগ্র মানুষকেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায় কেরামগণের আকীদা বিশ্বাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্তরে গাঁথিয়া রাখিতে হইবে। কেননা— আকায়েদের ক্ষেত্রে নাফসানী খাহেশ বা মনের অভিমতের কথায় সাড়া দিয়া বিরোধিতাকরণ ইহা আল্লাহ্র রাসূলের দ্বীন ও তরীকা হইতে বাহির করিয়া দিয়া থাকে। এহেন বিরোধিতার কারণেই ইয়াহুদীদিগকে একাত্তর ফের্কা এবং নাসারাগণকে বাহাত্তর ফের্কায় বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আর এই কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়েছেন— ইসরাইলগণের কাছে যেরূপ একটি মতদ্বৈধতার যুগ আসিয়া উপস্থিত ইয়াছিল, আমার উম্মতের মধ্যেও ঠিক অনুরূপ একটি যমানা আসিয়া উপস্থিত হইবে। দুইটি জুতা যমানা একটি অপরটির সমান হয়, আমার উম্মত ও বনী ইস্রাইলগণের কাছেও যেমন দুইটি অনুরূপ সমান হইবে। এমনকি বণী ইস্রাইলদের মধ্য হইতে যদি কেহ নিজ মাতার সাথেও অপর্কম করিয়া থাকে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও এহেন অপকর্মের লোক বর্তমান থাকিবে। বনী ইস্রাইল সম্প্রদায় বাহাত্তর ফের্কায় বিভক্ত হইয়া পরিয়াছিল। কিন্তু আমার উম্মত একগুণ আগাইয়া তেয়াত্তর ফের্কায় বিভক্ত হইয়া পড়িবে— যাহার মধ্যে একটি মাত্র ফের্কাই হইবে জান্নাতী। সাহাবায় কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ— সেই জান্নাতী ফের্কা কোন্টি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন— সেই ফের্কাটি হইল ঐ ফের্কা যাহাদের আকীদা বিশ্বাস ও কর্মপন্থার মধ্যে আমি এবং আমার সাহাবগণের স্থান থাকিবে। আমার এবং সাহাবাগণের আকীদা বিশ্বাস ও মত পথ যেই ফের্কা অনুসরণ করিয়া চলিবে সেই ফের্কাই জান্নাতী হইবে। এই বর্ণনাটির উল্লেখ কর্তা

হইলেন ইমাম তিরযিমী (রঃ)। ইমাম আহম্মাদ বিন হাম্বল, ইমাম আবু দাউদ (রঃ) থেকে যে বর্ণনাটি উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার ভিতর অতিরিক্ত কথা ও ভাষাগত তারতম্যের মধ্যে যেই রূপটি পাওয়া যায় তাহারা হইল এই-'ঐ জান্নাতী ফের্কাটির নাম হইল জামায়াত। অবশ্য আমার উম্মতের মধ্য হইতে এমন কিছু দল বাহির হইবে যেমন একটি কুকুর অপর কুকুরটি দেখিয়া ক্ষেপিয়া ওঠে এমন কোন দেহের শিরা-উপশিরা বা জোড়া স্থান অবশিষ্ট থাকিবেনা যাহার মধ্যে ইহা সংক্রমিত না হইবে। সার কথা হইল যে, নফসের খায়েশে ও প্রবৃত্তির অভিমতের পায়রুবী করা এবং তাহাকে দ্বীনের মুখপাত্র মনে করা, ইহা বে-দ্বীনী ও গোমরাহী ছাড়া কিছুই নয়। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লামের জীবন্ত আদর্শ চরিত্রকে গ্রহণ করিয়া নেওয়াই হইল ইহকাল পরকালে নাজাত লাভের একমাত্র পথ। আমাদের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি সাহাবাগণের সুন্নাৎ ও কর্মাদর্শ গ্রহণের উপরই নির্ভরশীল। আর ধ্বংস ও বরবাদী নির্ভরশীল হইল বিরোধিতার উপর। সুতরাং নিজেদের কথা, কাজ ও জীবন চরিত্রের অবস্থা সর্বদাই আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের মানদণ্ডে পরিমাপ করিয়া নেওয়া অপরিহার্য। উলামায়ে কেরাম ও পীর বুজর্গানে দ্বীনেরও এই একই অভিমত। পারস্যের সুফী কবি শেখ শা'দী (রঃ) দুইটি লাইনের মধ্যে আমাদের এই একই কথারই ছবি তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি বলেন—

خلاف پیمبر کسے رة گذید *

که هر گز بمنزل نخوا هد رسید -

পয়গম্বরের আনিত মতাদর্শ ও সুন্নাতের বিরোধিতা করিয়া কোন ক্রমেই আল্লাহর পথে চলা যায় না এবং অভীষ্ট লক্ষ্য বিন্দুতেও পৌছা আদৌ সম্ভব নয়। অর্থাৎ দ্বীন ও ঈমান আকীদার ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করণই মনযীলে মাকসুদে (জীবনের অভিষ্ট লক্ষ্যে) পৌছার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। আর আমলের বেলায় বিরোধিতা করণ দ্বারাও দ্বীনের ক্ষতি সাধন এবং আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করা হইয়া থাকে। মানুষ যদি নিজেদের অপরাধ ও গুনাহের স্বীকারোক্তি দেয় তবে পরিণামে নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত দ্বারা ক্ষমা লাভের আশা করা যায় শেখসাদী (রঃ) এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই বলিয়াছেন—

نما ند بعصیان سے دوگرو *

که دارد چنین سید پیش رو ـ

এখানে পরিস্কাররূপে আমলের ক্ষেত্রে বিরোধিতার কথা বুঝান হইয়াছে. সুতরাং যাহারা ঈমান আকীদার ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিরোধিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তাহাদের ইমাম তিনি কি রূপে হইতে পারেন? আল্লাহ তা'আলা কালামে মজীদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাম্বোধন করিয়া বলেন—

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَيْءٍ ـ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, যাহারা দ্বীন হইতে বিভক্তি হইয়া আলাদা জামায়াতে পরিণত হইয়াছে, আপনি তাহাদের মধ্যে কোন বস্তুর জন্য দায়িত্বশীল নন। তাহাদের ব্যাপারটি আল্লাহর উপর সোপর্দ করিয়া দিন। তারপর আল্লাহ তা'আলা কৃতকার্য্য সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

সর্তকবাণী

হে আল্লাহর বান্দাগণ! হে তরীকত পন্থী সুফীগণ! নবুয়তীর যুগ বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগ ত্রয়ের প্রশংসা করিয়া জনাব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহার সততা ও সাধুতার সাক্ষী দিয়াছেন, যুগের অবসান হইয়াছে। সুতরাং আওলিয়ায়ে কেরাম ও উলামার দ্বীনের যেই জীবন চরিত্র; বাণী ও অবস্থাসমূহের কথা আমাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, ইহা বিশুদ্ধভাবে পরম্পরা পন্থায় উদ্ধৃত হইয়া আসে নাই। অতএব ইহাকে আহ্‌লে কিতাবগণের কথার ন্যায় বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, যাহা আল্লাহ তায়লার কিতাব মাফিক হইবে তাহা বিনা চিন্তায় গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা সত্য মিথ্যা কিছুই ভাবিতে পারা যাইবে না। কিন্তু যাহা পরিষ্কারভাবে কুরআন

সুন্নাহর বিরোধী হইবে তাহা মিথ্যা জানা ওয়াজিব এবং ইহা নাহী আনিল মুনকারের (অন্যায়ের বিরোধিতার) ফর্মূলার অন্তর্ভুক্ত।

শরী'আতের খেলাফকারীদের সাথে নরম পন্থা অবলম্বন হারাম

ওয়ালামায় কেরাম বলিয়াছেন যে, দ্বীনের কর্মনীতির মধ্যে ফরজ কবীরাহ গুণাহ, এবং ইসলামের প্রধান প্রধান রুকনসমূহের খেলাফকারীদের ব্যাপারে কঠোরভাবে আমুরবিল মা'রুফ নাহী আনিল মুনকার (সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের বিরোধিতার) নীতি পালন করিয়া যাইতে হইবে। সর্বদা ইহার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে হইবে। আর দ্বীনি কাজের বেলার যাহারা গাফলতী ও অন্যমনস্কতা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাদের সাথে চলাফেরা উঠাবসা বর্জন করিয়া চলা উচিত। কেননা এই ধরনের লোকদের সাহচর্য্যে থাকার অর্থ হইল তাহাদের প্রতি সদয় সহানুভুতি প্রকাশ করা এবং তাহাদের সাথে আন্তরিক ভালবাসা থাকা অথচ হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন— 'যেই লোক যেই সম্প্রদায়ের সাথে আন্তরিক মহববত রাখিয়া থাকে সেই লোক সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত।' হযরত দাউদ (আঃ)-এর যমানার ইয়াহুদীদের একটি সম্প্রদায় শনিবার দিন চক্রান্ত করিয়া মৎস্য শিকার করার ফন্দি করিয়াছিল। অথচ ঐ দিন মৎস্য শিকার করা তাহাদের জন্য হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আর একদল লোক তাহাদের এই অপকর্মে বাঁধা প্রদান করিত তৃতীয় আর এক দলের লোকেরা বাঁধা প্রধানকারিগণকে এই কাজ থেকে বিরত রাখিত এবং দ্বীমুখী কর্ম চরিত্র গ্রহণ করিয়া চলিত। আল্লাহ তা'আলা এই তৃতীয় দলের আলোচনায় কুরআন পাকে এরশাদ করিয়াছেন—

اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ـ

অর্থাৎ, যাহারা অন্যায় কাজে বাঁধা প্রদান করিত তাহাদিগকে আমি নাজাত দিয়াছি। আর যাহারা অন্যায় কাজ করিয়া নিজের উপর জুলুম করিয়াছে আমি তাহদিগকে খুব নির্মম শাস্তির সাথে গ্রেপতার করিয়াছি। কেননা তাহরা ফাসেকী কাজে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।' (সূরা আল আরাফ)

অধিকাংশ তাফসীরকারকগণের অভিমত এই যে, শুধু কেবল বাঁধা প্রদানকারীগণই পরিত্রাণ পাইয়াছিল। আর যে সকল লোক বাঁধা প্রদানও করিত এবং এই কথা বলিত যে, কওমকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করিবেন বা কঠোর শাস্তি দিবেন তাহাদিগকে কেন নসীহত করিতেছ? তাহাদিগকে নসীহত করায় কোনই ফল নাই, তাহারাও চক্রান্তকারীদের মধ্যে সামিল হইয়া গিয়াছে। ইহারা অন্যায়ের বিরোধিতাকে পরিত্যাগের দলে জালেমদের দলে অন্তর্ভুক্ত হইয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

মুসলিম শরীফের উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, শরীয়ত বিরোধী ও অন্যায়কারীদিগকে বাঁধা প্রদান করার ক্ষমতা যখন না থাকিবে, তখন তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গের মধ্যে সামিল। ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন— 'আমার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নাই, যাহার উম্মতগণের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক হাওয়ারী ও সহচর না থাকিত; যাহারা নিজ নিজ নবীগণের সুন্নাৎ অনুসরণ করিয়া চলিত এবং তাহাদের হুকুম মানিয়া চলিত। (অর্থাৎ আমার পূর্ববর্তী সকল নবীগণের সহচরগণই নিজ নিজ নবীর সুন্নাতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিত) অতঃপর এই লোকদের পরে এমন কিছু সংখ্যক অপদার্থ লোক তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া থাকে, যাহারা মুখে যাহা বলে কাজে তাহা করে না এবং এমন কাজ করে যাহারা মুখে যাহার নির্দেশ তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি এই লোকদের সাথে নিজ হস্ত দ্বারা জেহাদ করিয়া থকেন তাহারা মুমিন। যাহারা তাহাদের সাথে বাকযুদ্ধ করে তাহারাও মুমিন। আর যাহারা তাহাদের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করিয়া জেহাদ করে তাহারা হইল সর্বনিম্ন শ্রেণীর মুমিন। ইহার পর আর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমানের কোন শ্রেণী বর্তমান থাকে না।

এই হাদীস দ্বারা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতেছে যে, সুন্নাতে রাসুলের খেলাফকারী এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম অমান্যকারীদের সাথে ভালবাসা মহব্বত রাখার অর্থ হইল ঈমানের পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়া

এবং কুফরী পথের নিকটবর্তী হওয়া। আর এখান থেকে ইহাও বুঝা যায় যে, ওলি আল্লাহগণের আত্মা কবরের নিকট এই সব শরীয়ত বিরোধী সুন্নাতের পরিপন্থী এবং শিরকী বিদয়াতী কাজ অবলোকন করিয়া উহার কর্তাদের প্রতি নিঃসন্দেহে আন্তরিক বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকেন। কেননা তাহাদের হাত মুখতো ঐ জগত হইতে এই জগতে ব্যবহার করিতে পারে না। তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা থাকিলে অন্য কথা।

রহস্যের ঘটনা

আমরা যৌবনকালে কোন এক সময় আমি এজন শরীয়তের খেলাফকারী ফকীরের সাথে রহস্য করিয়াছিলাম। সে আমাকে বলিল যে, শরীয়াত পন্থী লোকেরা ওলি আল্লাহগণের মরতবা অনুধাবন করিতে পারে না এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাহাদের কি মর্যাদা রহিয়াছে তাহাও চিনিতে বুঝিতে পারে না। তাহারা এ সকল ওলি আল্লাহগণকে পাথর সাদৃশ্য মনে করিয়া তাহাদের মাজার হইতে ফায়েজ হাসেল করা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। যেমন কবি বলিয়াছেন—

مرد ان خدا خدا نبا شد *

لکن زخد جدا نبا شد .

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র বান্দাগণ কখনো আল্লাহ হয় না বটে, কিন্তু আল্লাহ থেকে তাহারা পৃথকও নয়।

আমি এই লোকটির কথার প্রতিবাদে বলিলাম যে, তুমি ইহা কোথা হইতে জানিতে পারিলে যে, শরীয়তপন্থিগণ মৃত মুমিনগণের আত্মাকে পাথর সাদৃশ বা নিশ্চল মনে করে। অথচ আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন— 'যে লোক আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়, তাহারা তাহাদের পরওয়ারদিগারের নিকট রেজেক পাইয়া থাকেন।' তিনি তো শুধু কেবল শহীদগণকে ও ওলি আল্লাহগণকে পুঁজা করিতে বাঁধা দিয়া থাকেন। তিনি তো এই সব লোকদের কবর জিয়ারত করিতে এবং তাহাদের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করিয়া সওয়াব হাসিল করিতে নিষেধ করেন না। বরং ইহার জন্য তিনি পরিষ্কার ভাবে অনুমতি দিয়া গিয়াছেন।

কবর হইতে ফায়েয গ্রহণ করা বিদ্‌'আত

কতিপয় পীর ফকীর কবরবাসীদের থেকে বাতেনী ফায়দা লাভ করিবার এমন নূতন মনগড়া তরীকা বানাইয়া নিয়াছে যাহার কোন নজীর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনগণের যমানায় আদৌ পাওয়া যায় না। বরং সুলতানুল মাশায়েখ (রঃ) হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন (রঃ)-এর মাজার যিয়ারত করিতে যাইয়া তাহার অন্তরে এই কথার উদয় হইল যে, আমি তাহার নিকট আসিয়াছি তাহার খবর কি খাজা সাহেব জানিতে পরিয়াছেন? না পারেন নাই। তখন তিনি এই আওয়াজ শুনিতে পাইলেন—

مـن ائـم بـخـان گرتـوا ئـى بـه تـن -

আমার এ বক্তব্য শুনিয়া আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বহাসকারী বলিল, এই ঘটনা দ্বারা কিরূপে বুঝা যায় যে, সুলতানুল মাশায়েখের যমানায়ও কবর হইতে বাতেনী ফায়দা লাভ করার তরীকা প্রচলিত ছিল না?

জবাবে আমি বলিলাম যে ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত সুলতানুল মাশায়েখের অন্তরে এই ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হইল যে আমি এখানে আসিয়াছি সেই খবর তিনি জানিতে পারিয়াছেন কি পারেন নাই সে বিষয় আমি চিন্তা, গবেষণা ও মোরাকাবা মোশাহেদা করিয়া দেখিব। যদি কবর হইতে ফায়েজ হাসেল করার তাহার সাধারণ অভ্যাস থাকিত, তবে তিনি এই ধারণা কেন করিলেন যে আমার এখানে উপস্থিত হইবার সংবাদ কি তিনি পাইয়াছেন না পান নাই। তখন বহাসকারী লোকটি বলিল— অন্যান্য বুজর্গানে দ্বীন এই কবর হইতে বাতেনী ফায়দা লাভ ও ফায়েজ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তাহাদের এই তরীকাকে অদ্যাবধি কোন লোকই অস্বীকার করে নাই। আমি বলিলম, খাজা বাহাউদ্দিন (রঃ) বলিয়াছেন—

تـوتـاكـسـے گـور مـردن راپـرسـتـى *

بـگـردكـا رمـردا كـن در سـتـى -

ইহা শুনিয়া বাহসকারী বলিল— কোন বস্তু হইতে ফায়দা লাভ করা এক কথা, আর উহার পূঁজা করা অন্য কথা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— ফায়দা

হাসিল করার তরীকা কি? জবাবে সে বলিল, জেন্দা পীরের সম্মুখে যেরূপ খুব মনযোগ সহকারে নিবিষ্টচিত্তে বাতেনী তাওয়াজ্জুহর সাথে আবদ ইহতেরামের মন নিয়া তাহার থেকে ফায়দা বা ফায়েজ লাভ করা হয়, অনুরূপ কবরের সম্মুখে খুব আদব ইহতেরামের সাথে মনযোগ সহকারে বাতেনী তাওয়াজ্জুহ নিয়া বাসিয়া ফায়েজ গ্রহণ করিতে পারা যায়। কেননা আল্লাহ্‌র ওলিগণ কখনো মরে না, তাহারা সর্বদাই জীবিত। আমি বলিলাম, এই কথা তোমার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের জন্য দলিল হইতে পারে না। কেননা কোন দ্বীনি কাজ আল্লাহ্‌র কিতাব· রাসূলের সুন্নাৎ এবং ইজ্‌মায়ে উম্মত ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে না। ইহাই হইল প্রাচীন শীর্ষ স্থানীয় মাশায়েখ ও বুযুর্গানে দ্বীনের অভিমত। আখবারুল আখীয়ার কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, একদিন শায়খ নিজামুদ্দিন আওলিয়া (রঃ)-এর মুরিদগণ একতালের বাদ্যবিশিষ্ট যন্ত্র দফ্ বাজানোর মজলিশ করিলে সেখান হইতে শায়খ নাসীরুদ্দিন বাহির হইয়া আসিতে লাগিলেন। এই সময় তাহার সাথীগণ তাহাকে বসাইবার চেষ্টা করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন— ইহা আল্লাহ্‌র রাসূলের সুন্নাতের সম্পূর্ণ খেলাফ। সাথীরা বলিল, আপনি কি তাহা হইলে সেমাকে (বাদ্যযন্ত্র নিয়া নায়াত ও মুর্শিধী গাহিয়া আল্লাহর প্রেমে মোহিত হওয়াকে সুফীগণের পরিভাষায় সেমা বলা হয়) অস্বীকার করিতেছেন এবং পীরের অভ্যাস ও তরীকা হইতে ফিরিয়া যাইতেছেন? তখন তিনি বলিলেন— পীর মাশায়েখগণের কার্যাবলী শরীয়তের দলিল নয়। ইহার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল হইতে দলিল গ্রহণ করা উচিত। কতিপয় লোক শায়খ নাসীরুদ্দিনের নামে এইসব কথা উল্লেখ করিয়া শায়খ নিজামুদ্দিন আওলিয়ার নিকট নালিশ করিলে তিনি বলিলেন— সে ঠিকই বলিয়াছে, সে যাহা বলিতেছে তাহাই হক কথা। বহাসকারী বলিল— শায়খ নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শায়খ নিজামুদ্দিন আওলিয়ার ইন্তেকালের পর নিজেই সেমা শুনিয়াছেন। তখন আমি জবাব দিলাম যে, খাজা নাসিরুদ্দিনের একজন বন্ধু তাহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, এই সব বাদ্যযন্ত্র এবং সুফীগণের বাদ্যযন্ত্রের ইজ্‌মায়ে উম্মৎ দ্বারা পরিষ্কাররূপে নাজায়েজ প্রামণিত হইয়াছে। এই কারণেই যদি তাসাউফের মধ্যে নূতন কোন মত পথ ও তরীকার সৃষ্টি হয়, তবে উহার প্রমাণ উৎস বা অনুমতির অবকাশ শরীয়তের মধ্যে থাকা

একান্ত বাঞ্ছনীয়। শরীয়তকেই যদি তাকের উপর রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে কোথায় যাইতে হইবে, জাহান্নামে যাইবে? মোট কথা প্রথমতঃ সেমা সম্পর্কেই ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। কতিপয় মাশায়েখ কিছু শর্তাধীনে বিশেষ নিয়মে ইহার বৈধতার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের সাথে সেমা করা সকলেরই সম্মিলিত মতে হারাম। তখন বহাসকারী বলিল— শায়খ নাসীরুদ্দিন বাদ্যযন্ত্রের রাগেনী তানসুর শ্রবণ করেন নাই। বরং তিনি সেমা শুনিয়াছেন। আমি বলিলাম, হয়ত তিনি শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি যখন বলিয়াছেন যে, পীর মাশায়েখগণের কার্যবালী শরীয়তের দলিল নয়। ইহার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নাতে রাসূলে হইতে দলিল গ্রহণ করা উচিত। আমি আরও বলিলাম যে, দফ্ বাজানোর সাথে সেমা শ্রবণ করা হাদীস অনুসারে বৈধ বলিয়া জানা যায়। হয়ত এই কারণে শায়খ নাসীরুদ্দিন শুনিয়াছেন। খাজা বাহাউদ্দিন (রঃ) সেমা ও বাদ্যযন্ত সম্পর্কে যে কথা বলিয়াছেন তাহা যথার্থই বলিয়াছেন। তিনি বলেন—

نه این کار میکنم ونه انکار میکنم ـ

অর্থাৎ, আমি ইহা নিজে করি না এবং ইহা করাকে অস্বীকারও করি না।

অতঃপর আমি তাহাকে বলিলাম যে, আমরা আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমাদের আলোচনা ছিল কবর থেকে বাতেনী ফায়দা না করার বিষয়। তখন সে বলিল এই সব বুযুর্গানদের অগণিত কিতাব রহিয়াছে। সকল কিতাব সম্পর্কে কোথা হইতে জানিবে। আমি জাবাবে বলিলাম, হাঁ তুমি ঠিকই বলিয়াছ। নিঃসন্দেহে তাহাদের এমন সব অগণিত কিতাব রহিয়াছে, যাহার ভিতর তাহারা মিথ্যা ও আজে-বাজে কথা লিখিয়া ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে। শায়খ নাসীরুদ্দিনের কথা যেমন ইহার প্রমাণ। আখবারুল আখীয়ার কিতাবেও খায়রুল মাজালেশ কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া যে ঘটনা উল্লেখ করিয়াছে, তাহাও ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। সেই ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, একজন মুরীদ শায়খ নাসীরুদ্দীনের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল খাজা ওসমান হারুনী (রঃ)-এর মলফুজাতে লিখা আছে যে, তিনি বলিয়াছেন 'যে ব্যক্তি দশটি বকরী জবেহ করিবে তাহার একটি খুন করা হইবে। খাজা সাহেব প্রথম এই জওয়াব দিয়াছেন

যে, এই কথা হারুনী সাহেবের নয়। বরং ইহা তাহার স্বগ্রাম হারওয়ানীর অধিবাসীদের মগগড়া কথা। তারপর তিনি বলিলেন, এই কথাগুলি তাহার নয় ইহা আমার কানেও আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহার ভিতর এমন এমন কথাও উল্লেখ রহিয়াছে যাহা হারুনী (রঃ)-এর শান ও মার্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইহার পর শায়খ নিজামুদ্দিন (রঃ)-এর নিকট খাজা সাহেব এই কথা বলিলেন যে, আমি কোন কিতাব এই কারণে লিখি নাই। খাজা ফরীদউদ্দিন এবং খাজা কুতুবদ্দিন সহ চিস্তিয়া তরীকার সমগ্র পীর মাশায়েখগণের কেহই কোন কিতাব লিখিয়া যান নাই। অভিযোগকারী সেই লোকটি বলিল হাজার হাজার ওলামায়ে কেরাম ও সুফিগণ যখন কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন, তখনই এই সব বুজর্গান কিতাব লিখিয়া না যাইবার কারণ কি? এই মহাত্মাগণের কাছে কিতাব লিখিতে কোন বস্তুটি প্রতিবন্ধক ছিল? আর সুলতানুল মাশায়েখরা কেমন করিয়া কিতাব না লিখিয়া যাওয়াকে পছন্দ করিলেন? উহার কথার জবাবে আমি বলিলাম যে, হয়ত বুজর্গানে দ্বীন এ ব্যাপারেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করিয়াছেন। কেননা তিনি ছিলেন উম্মি। এই দুনিয়ায় কোন কিতাবই তিনি লিখিয়া যান নাই। আর তাহাদের কিতাব না লিখিবার কারণ এও থাকিতে পারে যে, পূর্ববর্তী লোকদের লিখিত কিতাবসমূহই হেদায়েতের জন্য তাহারা যথেষ্ট ভাবিয়াছেন বলিয়া কোন কিতাব লেখা প্রয়োজন মনে করেন নাই। এই কথা শুনিয়া সে পাল্টা জবাব দিল যে, এই কারণ কিছুতেই হইতে পারে না। সুফিগণের জন্য পূর্ববর্তী লোকদের মাযহাব অনুসরণ করিয়া চলা তাহাদের জন্য জরুরী নয়। কেননা প্রবাদ আছে যে, اَلصُّوفِىُّ لَامَذْهَبَ لَهٗ অর্থাৎ সুফিগণের কোন মাযহাব নাই আর মাওলানা রুমীর কণ্ঠেও এই একই কথার প্রতিধ্বনি শুনা যায়। তিনি বলেন—

ملت عشق ازهمه ملت جدا ست ٭

عاشقان راملت ومذهب خدا ست ـ

অর্থাৎ, প্রেমের মাযহাব দুনিয়ার সমগ্র মাযহাব হইতে স্বতন্ত্র। আরেফ ও খোদা প্রেমিকগণের মাযহাব হইল আল্লাহ।

অতঃপর তাহার নিকট আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তুমি কোন তরীকাকে আল্লাহ্‌র মারেফাত লাভের জন্য অছিলাস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছ? সে জবাব দিল যে

আমি তিন তরীকার অনুমতি লাভ করিয়াছি। তবে সুলতানুল মাশায়েখের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা রাখিয়া থাকি। অতঃপর আমি তাহাকে বলিলাম যে ফাওয়ায়েদুল ফাওয়ায়েদ কিতাবখানি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুলতানুল মাশাখের জীবন চরিতের আলোচনায় সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে; সেই কিতাবখানা অধ্যয়ন কর। তখন সে বলিল উহা আমাদের ন্যায় ফকীরদের নিকট আল্লাহ্র কিতাবের পর দুনিয়ার সমগ্র কিতাবের চেয়ে অধিক মরতাবা পূর্ণ প্রিয় কিতাব। তখন আমি আবার বললাম যে, ঐ সব বুজর্গানদের জীবন চরিত্র দ্বারা পরিষ্কার জানা যায় যে তাহারা সকলেই পূর্ববর্তী বুজুর্গানদের মাযহাব অনুসরণ করিয়া চলিতেন। আর আমল আকীদার ব্যাপারে তাহাদের পায়রুবী করিতেন। আর নিজ নিজ মুরীদ ও সহচরগণকেও ঐ মাযহাব অনুযায়ী আমলী জিন্দেগী গঠন করিবার জন্য তাকীদ করিতেন এবং আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুর নিষেধাজ্ঞাকে কঠোরভাবে বর্ণনা করিতেন। সুতরাং হাসান সঞ্জরী (রঃ) ফাওয়ায়েদুল ফাওয়ায়েদ কিতাবে লিখিয়াছেন যে, একটি লোক সুলতানুল মাশায়েখ (রঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া নালিশ করিল যে, আমার দোস্ত বন্ধুগণ অমুক স্থানে জমায়েত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে বাদ্যযন্ত্রও রহিয়াছে। তখন খাজা (রঃ) বলিলেন যে, আমি তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছি যেন নিজেদের কাছে বাদ্যযন্ত্র না রাখে। যদি কিছু করিয়া থাকে, তবে ভাল কাজ করে নাই। এ ব্যাপারে খাজা সাহেব খুবই তাম্বীহ তাকীদ ও বাড়াবড়ি করিতেন। এমনকি তিনি বলিয়াছেন যে, ইমামের পিছনে যদি জামায়েতে নারী পুরুষ সামিল থাকে, আর ইমামকে ভুল ধরাইয়া দেওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়ে এবং পুরুষ মোকতাদিগণ যদি উহা অবহিত না হয়। তবে এমতাবস্থায় নারী মোকতাদিগণ সোবাহানাল্লাহ বলিবেন। অথবা কণ্ঠস্বর না শুনা যাওয়া অবস্থায় হাতে তালি বাজাইয়াও ইমামকে স্মরণ করাইয়া দিবে না। কেননা ইহা দ্বারা আমোদ-স্ফুর্তির শব্দ সৃষ্টি হয় তবে এক হাতের পীঠকে অন্য হাতের তালুর উপর মারার শব্দ দ্বারা ইমামকে তাহার ভুল ধরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কেননা ইহা দ্বারা আমোদস্ফুতি শব্দ বুঝা যায় না। মোটকথা তিনি আমোদস্ফূর্তি ও খেল-তামাশার ব্যাপারে এতখানি সতর্ক হইয়া চলিতেন। সুতরাং হাতের উপর হাত মারার ব্যাপারে যখন তিনি এতখানি সতর্কতা অবলম্বন করিতেন, তখন বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে তাহার নিষেধাজ্ঞার কথা

নির্বিবাদেই প্রমাণিত হইয়া যায়। যদি কাহারও কোন পদস্খলন হইয়া যায়, তবে দ্বিতীয়বার শরীয়তের নিকট ফিরিয়া আসা উচিত। কারণ শরীয়তের গণ্ডী হইতেই যদি বাহির হইয়া পড়ে, তবে জাহান্নাম ছাড়া যাওয়ার স্থান আর থাকিতে পারে কোথায়? এই কিতাবে আরও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, সুলতানুল মাশায়েখ সাহেব একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা কাল কিয়ামতে তাঁহার বান্দার নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি কি সেমা শুনিয়াছ? তখন সে উত্তর করিবে হ্যাঁ, আমি সেমা শুনিয়াছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন এই বস্তুগুলির বৈশিষ্ট্য হইল নশ্বরকে অবিনশ্বরের উপর কিরূপে রাখিলে? তখন বান্দা বলিবে— হে রাব্বুল আলামীন। মহব্বতের আতিশয্যে উঠিয়া এইরূপ করিয়াছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন— তুমি যখন ভালবাসার ব্যবহার দেখাইয়াছ তখন আমিও তোমার সাথে সদয় ও দয়ার্দ্রতার ব্যবহার প্রদর্শন করিতেছি। এই ঘটনা বর্ণনা করিবার পর খাজা সাহেব অকাতরে অশ্রুধারা বাহাইয়া বলিলেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহর মহব্বতে বিভোর হইয়া গিয়াছে। তাহার বেলায় যদি এমনি কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ হয় তবে অন্যান্যদের বেলায় কিরূপ হইবে চিন্তা করুন।

অতঃপর বাহাসকারীকে আমি বলিলাম— আমরা যে বিষয়বস্তু নিয়া বিতর্কে বসিয়াছিলাম তাহা হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছি। তুমি বলিয়াছিলে যে, তোমরা জেন্দা পীরের থেকে বাতেনী ফায়দাও ফায়েজ হাসেল করার পক্ষপাতি। এমনিভাবে তোমরা খুব আদব ও বিনয়াবনতার সাথে কবর হইতে ও ফায়েজ হাসেল করার মতবাদে বিশ্বাসী। আর আমি বলিয়াছিলাম যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহবায়ে কেরাম ও বুজর্গানদের কথা ও কাজ দ্বারা ইহা কোনরূপেই প্রমাণ হয়না। সুতরাং এই বিদয়াতী মতাদর্শটি তোমাদের মনে কিরূপে উদ্ভব হইল? তখন এই লোকটি জবাব দিল যে, যাহারা কবরবাসীদের স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে পূর্ণাংগ ক্ষমতাশালী মনে করিয়া কলবে যিকির জাগাইয়া তোলার জন্য এবং বাতেনী ফায়দা ও ফয়েজ লাভ করার উদ্দেশ্যে কবরের পানে মনোনিবেশ করে এবং তাহাদিগকেই শুধু আল্লাহ্র পানে মনোনিবেশ করার জন্য কিবলা বা লক্ষ্যবস্তু ভাবিয়া থাকে, তাহারা বাতেল মতাদর্শের উপর রহিয়াছে। আমি তাহাদের সাথে একমত নই। আর ইহাদের মধ্যে যাহারা বুজর্গানে দ্বীনের রূহকে আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য

একমাত্র মাধ্যম বা কিবলা অথবা লক্ষ্যবস্তু ভাবিয়া আল্লাহ্র যিকিরে লিপ্ত হয়; আসলে তাহারাই আল্লাহ তা'আলার অধিক রহমত ও বরকত পাইবার অধিকারী। অতঃপর আমি বলিলাম সাহাবায়ে কেরাম কখনো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর পানে মনোনিবেশ করার উদ্দেশ্য, লক্ষ্যবস্তু বা কিবলারূপে পরিণত করেন নাই। আর তাঁহার ইন্তিকালের পর তাঁহার আত্মাকেও এই আসনে সমাসীন করেন নাই। আল্লাহ্র পরে মনোনিবেশ করার জন্য লক্ষ্যণীয় বস্তু বা কিবলারূপে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ সমগ্র সাহাবায়ে কেরাম ও দুনিয়ার সমগ্র মুসলমানের জন্য একমাত্র আল্লাহর ঘরই হওয়া উপযুক্ত বস্তু। ইহা ছাড়া কোন লোকের জন্যই কোন নেককার লোকের রূহকে আল্লাহ্র পানে মনোনিবেশ করার লক্ষ্যণীয় বস্তু বা কিবলা মনোনীত করিতে নির্দেশ দেয়া হয় নাই। আল্লাহ্র বিনা হুকুমে কোন বস্তুকে কেবলা মনোনীত করিয়া নেওয়া নূতন একটি দ্বীনের জন্ম দেওয়ার নামান্তর। দ্বীনী কথা প্রকাশ করা যখন আল্লাহ্র হুকুমের উপর নির্ভরশীল, তখন আল্লাহর বিনা হুকুমে কিরূপে মানুষকে বা মানুষের আত্মাকে ইবাদত-বন্দেগীর জন্য কিবলা বা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করিয়া নিতে পারে? কোন ক্রমেই ইহা হইতে পারেনা। একথা শুনিয়া বাহসকারী বলিল, মোতায়াখ্খেরীন বুজুর্গান অর্থাৎ পরবর্তিকালের বুজর্গান এ ব্যাপারে যাহা কিছু করিতেছেন তাহা সবই ভুল করিতেছেন। তখন আবার বলিলাম, যদি ইহারাই ভুলের ভিতর নিপতিত না হইয়া থাকে, তবে সমুদয় প্রাচীন ও সেকালের ওলী আওলিয়াগণ নেক্কার বুজুর্গান তাবেঈন ও সাহাবায় কেরাম সকলেই ভুলের মধ্যে নিপতিত ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিয়া নিতে হয়: তাহারা এই ধরণের স্বাধীন কেবলাকে পরিত্যাগ করিয়া অনাহুত সংকীর্ণতার মধ্যে নিপতিত রহিয়াছেন বলিয়া ভাবিতে হয়। (নাউজুবিল্লাহ) বহাসকারী লোকটি এই কথা শুনিয়া বলিল আমার কাছে উভয় দলের কেহই ভুলের মধ্যে নিপতিত নয়। তাহারা সকলেই সঠিক পথে আছেন। পরবর্তিকালের বুজর্গান বাতেনী ফায়েজ ও ফায়দা হাসেল করার যেই তরীকা আবিষ্কার করিয়াছে তাহা এই যমানায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সব চাইতে নিকটতম পথ। আর মোতাকাদ্দেমীন অর্থাৎ পূর্ববর্তী বুজর্গানে দ্বীন মৃত বুজুর্গানের আত্মাকে আল্লাহ তা'আলার যিকির ও দোয়া করার সময় ফায়েজ

লাভের অসিলা ও মাধ্যম রূপে তাহার পানে মনোনিবেশ না করার তরীকাটি তৎকালীন যুগে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের সবচাইতে উত্তম ও নিকটতম পথ ছিল। আমি বলিলাম তোমার কথা দ্বারা তো ইহাই বুঝা যায় যে, নবুয়তীর ধারা অবসান হইবার পরও দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিধিমালার ক্ষেত্রে বিবর্তনতার অবকাশ রহিয়াছে। অথচ এই নীতি শরীয়তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও ভ্রান্ত নীতি। কেননা দ্বীন শরীয়ত একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান ইহার মধ্যে বিবর্তনতার কোন অবকাশ নাই। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۔

অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে অর্থাৎ জীবন বিধানকে পূর্ণ করিয়া দিলাম। আর শেষ করিলাম তোমাদের জন্য আমার নেয়ামতকে। অর্থাৎ দ্বীন যে আমার তরফ হইতে তোমাদের জন্য নেয়ামত বিশেষ সেই নেয়ামতও পূর্ণ করিলাম। ইহার পর আর তোমাদের জন্য আমার কাছে কোন জীবন বিধান রহিল না। মোট কথা দ্বীন ইসলামকেই জীবন বিধানরূপে তোমাদের জন্য আমি মনোনীত করিয়া দিলাম। (সূরা আল মায়েদা)

আমার এই কথা শুনিয়া বাহাসকারী বলিল, ইহার পরের এই আয়াতটি পাঠ করুন এবং দেখুন সেখানে কি বলা হইয়াছে; যেমন এরশাদ হইতেছে—

فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

অর্থাৎ, গুনাহর পানে মনের আগ্রহের সাথে নয় বরং ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া যাহারা হারাম খাদ্য ভক্ষণ করে; তাহাদের জন্য কোন গুনাহ নাই। কেননা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' (সূরা আল মায়েদা)

এই আয়াত দ্বারা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হালাল বস্তু হারাম হওয়া এবং হারাম বস্তু হালাল হইয়া যাওয়ার বৈধতার অবকাশ রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। সুতরাং তোমার কথা তো আর থাকিতেছে না। দ্বীন শরীয়ত এই অর্থে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত যে সে যাহা কিছু হারাম হালাল করিয়া দিয়াছে, তাহা সর্বক্ষণের জন্যই হালাল

হারাম রূপে থাকিবে। অবশ্য অস্থিরতা ও অপরাগতার সময় সেই হারাম বস্তুও হালাল হইয়া যাইবার অবকাশ রহিয়াছে যাহা অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা না পাওয়া যাওয়া অবস্থায় কোনরূপ বৈধতার অবকাশ রাখা হয় নাই।

ইহার কারণ হইল যে, ইসলামের প্রাথমিক যমানাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোবারক যমানার নিকটবর্তী থাকার কারণে আল্লাহ্র ফজল করম ও নূর বরকতে ভরপুর ছিল। আর বর্তমান যুগের কালরাত্রির অন্ধকারের ন্যায় ফেৎনা ফাসাদের উদ্ভব হইয়া মানুষের অন্তরকে অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে। এই কারণেই আল্লাহ্র পথে অগ্রগতি লাভের জন্য বুজর্গানে দ্বীনের রূহ হইতে নূর গ্রহণ করা অপরিহার্য। এই সময়টির কথাই উল্লেখ করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

وَاِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِى الْاُمُوْرِ فَاسْتَعِيْنُوْا بِاَهْلِ الْقُبُوْرِ -

অর্থাৎ, যখন তোমরা কোন ব্যাপারে অস্থির হইয়া পড়, তখন কবরবাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর।

মিথ্যা হাদীস

তাহার জবাবে আমি বলিলাম— ভাই আর কথা বাড়াইয়া লাভ নাই। তুমি যে হাদীসকে দলিলরূপে পেশ করিতেছে, তাহা আসলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস নয়। ইহা কবর পূঁজারী ও তাহার সেবায়েতগণের কথা। তাহার কবরের নামের নজর নিয়াজ, দান সদ্কা ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া নিজেদের উদয় পূর্তি করার উদ্দেশ্য নিয়াই এই মনগড়া মিথ্যা হাদীস বানাইয়া নিয়া তাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে বাজারে চালু করিয়া দিযাছে। ইহা তাহার প্রতি সম্পূর্ণ মিথ্যা দোষারোপ। হাদীসের কোন সহী কিতাবেই তাহা বর্তমান পাওয়া যাইবে না। এলমে জাহের ও বাতেনের বিমূর্ত প্রতীক হক্কানী উলামায়ে কেরাম মোহাদ্দেসীন ও সুফিগণ এই হাদীসকে—

اِذَا اَعْيَتْكُمُ الْاُمُوْرِ فَعَلَيْكُمْ بِاَصْحَابِ الْقُبُوْرِ -

অর্থাৎ, অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা যখন তোমাদিগকে দুর্বল ও পরাভুত করিয়া দেয়, তখন কবরবাসীদেরকে আকড়াইয়া ধর। আর—

لَوْ حَسَّنَ اَحَدُكُمْ ظَنَّهٗ بِحَجَرٍ لَّنَفَعَهٗ -

অর্থাৎ, যদি কোন ব্যক্তি পাথরের প্রতিও ভাল ধারণা রাখে, তবে পাথরও তাহাকে উপকার করিতে পারে।

এই হাদীসটি কবর পূঁজারীদের মনগড়া মিথ্যা ও বানোওয়াটি হাদীস। নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে এমনি মিথ্যা কথা চাপাইয়া দিয়াছে।

সিরিয়ার সাবেক-গ্রাণ্ডমুফতী আল্লামা আবুল আব্বাস আহম্মদ বিন আব্দুল হালিম বিন আব্দুল সালাম ওরফে ইবনে তাইমিয়ার বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব 'সীরাতুল মুস্তাকীমে" এবং মাজলেসুল আবরার কিতাবসহ বিভিন্ন কিতাবে মনগড়া ও মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের অশ্লীল ও আজে-বাজে মিথ্যা কথার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সলফে সালেহীন বা পূর্ববর্তী বুজর্গানদের দু-চারজন থেকে এই ধরনের আজে-বাজে মিথ্যা কথার উদ্ধৃতি যতই পাওয়া যাউক না কেন, এহেন ফেৎনা ফাসাদের অবস্থায় বুজর্গগানদের রূহ হইতে নূর ও ফায়েজ লাভ করার কথা অপরিহার্য্য হওয়া সম্পূর্ণরূপে যুক্তি ও বিবেক বুদ্ধির পরিপন্থী।

সুন্নাতের পায়রবীই ফিৎনা-ফাসাদের প্রতিবিধান

বরং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম এই ফেৎনা ফাসাদ রোগের প্রতিবিধানে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতের আনুগত্য ও পায়রুবীকে স্থায়ীরূপে সর্বক্ষণের জন্য অপরিহার্য রূপে আকড়াইয়া ধরার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি একথা কখনোই বলেন নাই যে, অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার সময় ফেরেস্তাকুল ও আম্বীয়াগণের রূহের কাছে কাকুতি-মিনতি করিয়া আবেদন নিবেদন ও দরখাস্ত পেশ করিতে এবং তাহাদের আত্মা হইতে নূর ও ফায়েজ গ্রহণ করিতে হইবে। হযরত আয়মা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন— ইয়া রাসূলুল্লাহ! কদরের রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলার দারবারে আমি কি প্রার্থনা করিব? তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে এই দোয়া পাঠ করিতে এরশাদ ফরমাইলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ -

অর্থাৎ, হে খোদা! নিশ্চয় আপনি মার্জনাকারী। ক্ষমা ও মার্জনা করাকে আপনি পছন্দ করিয়া থাকেন। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন।

কিন্তু তিনি ফেরেস্তা ও নবীদের আত্মার নিকট কোন কিছু চাহিতে নির্দেশ দেন নাই। অথচ কদরের রাত্রিতে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সাল্লাম সঙ্গী সাথী ফেরেস্তাসহ যে এই দুনিয়ায় রহমত ও বরকতের ডালি সাজাইয়া আগমন করিয়া থাকেন, সে বিষয় আল কুরআনের বর্ণনাই উজ্জ্বল প্রমাণ। যেমন এরশাদ হইতেছে—

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ـ

অর্থাৎ, কদরের রাত্রিটি হাজার মাসের চাইতে অধিক ফজিলতপূর্ণ ও কল্যাণময়! ঐ রাত্রিতে হযরত জিব্রাইল (আঃ) সহ অন্যান্য ফেরেস্তাগণ আল্লাহ্‌র নির্দেশমত সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা নিয়া এই দুনিয়ায় অবতীর্ণ হন। (সূরা আল কদর)

বুযুর্গানদের আত্মাকে মনোনিবেশের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার ফিৎনা

পীর পূঁজারী ও কবর পূজারিগণ বলিয়া থাকে যে অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে পৌঁছার জন্য বুজর্গানদের আত্মাকে মনোনিবেশের লক্ষ্যবস্তুতে (কিবলায় তাওয়াজ্জুহ) পরিণত করা বৈধ,— ইহা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত ও শরীয়ত বিরোধী কথা। কেননা ইহা শির্‌কী ও শির্‌ক সদৃশ কাজ। আর সর্বকালে ও সর্বস্থানেই শির্‌ক সদৃশ কাজ হারাম। যদিও শরীয়ত প্রাণ বিনাশের মত অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা অবস্থা দেখা দেওয়ার সময় আন্তরিকতার সাথে নয় মৌখিকভাবে শির্‌কী বাক্য মুখে উচ্চারণ বৈধতার অবকাশ রাখিয়াছে। এই বৈধতার অবকাশ শুধু কেবল দৃঢ়তাহীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই রাখা হইয়াছে। এ পথে ঈমান লওয়া দুরস্ত বলা হয় নাই। মোট কথা অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার অবস্থা ঠিক ঐ সময়টাকেই বলা হয়; যখন কোন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী জালেম লোক দ্বারা প্রাণ বিনাশ হইবার আশঙ্কা থাকে অথবা ঐ

কাজ না করা হলে আর জীবন ধারণ কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। কেবল এমতাবস্থায়ই উলামায় কেরাম হারাম কাজের মধ্যে লিপ্ত হওয়াকে বৈধকরণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কুফরী ও শিরিককে অন্তরে গোপন রাখিয়া আল্লাহ্‌র গজবে নিপতিত হইবার অবকাশ দেওয়া হয় নাই। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করাব পর আল্লাহ তা'আলার সাথে কুফরী করিবে, (তাহার উপর আল্লাহ তা'আলার গজব নাযিল হইবে।) কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির উপর কাফেরদের তরফ হইতে জুলুম করা হয়। অর্থাৎ তাহাকে কুফরী ও শির্‌কী করিতে বাধ্য করা হয়: আর তখন যদি তাহার অন্তঃকরণ ঈমানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং কুফরীকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে; (তবে এই কুফরী শির্‌কীকরণে কোন গুণাহ নাই)। তবে যাহারা প্রকাশ্যে মন খুলিয়া কুফরী করিবে তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র গজব নাযিল হইবে এবং তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।' (সূরা নাহল)

আল্ কুরআনের এই আয়াত দ্বারা কি বুঝা যায় তাহা চিন্তা করুন। বিষয়বস্তুটি পূর্ণরূপে খুলিয়া বলার জন্যই এতখানি বিশদ আলোচনা করিলাম। নতুবা আমি যেই আয়াতকে দুর্বলরূপে পেশ করিয়াছি, তাহার একটি বাক্যই বিষয়বস্তু বুঝাইবার জন্য এবং তোমাদেরকে সন্তুষ্টজনক জবাব দিবার জন্য যথেষ্ট। পবিত্র কালামে মজীদে যে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন—

فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

এখানে আল্লাহ তা'আলা গুনাহের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ পোষণকারী এবং শরীয়তের হুকুমের খেলাফকারীদের জন্য ক্ষমা মার্জনার ওয়াদা করেন নাই। এখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার কর যে, কোন বুজর্গের ইন্তেকালের পর তাহার

আত্মার নিকট জীবিতদের তালীম তরবীয়তের জন্য দরখাস্ত করার পর এই জড়জগতের পানে তাহার মনোনিবেশ করা এবং বাতেনী শক্তির প্রয়োগ দ্বারা তালীম দেওয়ার এহেন আকীদা বিশ্বাস নিছক ধারণা বৈ কিছুই নয়। পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ـ

অর্থাৎ, ইহারা কেবল ধারণা ও গুমানেরই পায়রুবী করিতেছে। আর তাহারা যা কিছু বলিতেছে তাহা আন্দাজ ও আনুমানিক কথা ছাড়া কিছুই নয়।'

আল্ কুরআনের এই আয়াত অলিক ও ভিত্তিহীন ধারণা পোষণের পরিপ্রেক্ষিতেই বর্ণিত হইয়াছে। আমরা সেই ধারণা ও গুমানকে পোষণ করিয়া থাকি, যে বিষয় হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন—

اَنَا عِنْدَ ـ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ ـ

(আমি আমার বান্দার সম্পর্কে পোষিত ধারণা ও গুমানের নিকটবর্তী) আল্লাহ তা'আলা এখানে عَبْدِىْ بِىْ (আমার বান্দা আমার সম্পর্কে) বলিয়াছেন) এখানে তিনি একথা বলেন নাই যে, আমি আমার বান্দার কবর সম্পর্কে পোষিত ধারণা অনুযায়ী হইয়া থাকি। তখন বহসকারী লোকটি অনন্যোপায় হইয়া বলিল— আমাদের ফকীরদের মতানুসারে বহাস ও তর্কবিতর্ক জায়েজ নয়। আমি জাবাব দিলাম— এতক্ষণ তোমাদের ফকিরী ছিল কোথায়?

একটি হাদীসের আলোচনা

অতঃপর বহাসকারী ফকীর লোকটি বলিল, আমাদের সমর্থনে এই সহীহ হাদীসও বর্তমান রহিয়াছে যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

يَاعِبَادَ اللّٰهِ فَاَعِيْنُوْنِىْ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা আমাকে সাহায্য কর।

এই হাদীসটির মর্ম দ্বারা আল্লাহ্র বান্দাগণের নিকট পরিষ্কাররূপে সাহায্য প্রার্থনার কথাই বুঝাইতেছে। আর তাহাদের নিকট উপকার চাওয়ার অর্থই হইল সাহায্য প্রার্থনা করা। সুতরাং এই হাদীস বর্তমান থাকিতে আমরা কোথায় যাইতে পারিব? ফকীরের জাবাবে আমি বলিলাম যে, এই হাদীসটি যে সহীহ

হাদীস তাহা তোমরা কিরূপে বিশ্বাস করিয়া নিতে পারিলে? **ইমাম মুহাম্মদ বিন** ঈসমাইল বুখারী (রঃ) ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং সীয়াহ সিত্তা কিতাবের অন্যান্য প্রণেতাগণের কেহই এই হাদীসকে নিজ কিতাবে স্থান দেন নাই। ইহা ছাড়া ইমাম মালেক (রঃ)-এর মোয়াত্তা কিতাবে এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ)-এর মসনদেও এই হাদীস কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এমনকি হাদীসের অন্যান্য সহী কিতাবসমূহেও ইহার কোন পাত্তা নাই। তবে হেস্‌নে হাসীন কিতাবের লিখক তীবরাণীর উদ্ধৃতি দিয়া এই হাদীসটিকে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায়। সুতরাং প্রথমতঃ আমাদের ইহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইমাম তীবরাণী হইতে সাহাবীগণ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময় এই হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য কিনা। আর এই হাদীস কি মোতাওয়াতের, না মশহুর না মুনকাতেয়া না মুরসাল, না জয়ীফ, না সহীহ তাহাও গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখার পর হাদীসের মূল মর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। প্রকাশ্যরূপে দেখা যায় যে, এই হাদীসটির হেসনে হাসীন কিতাবে উল্লেখকৃত ভাষা হইল এই— اَعِيْنُوْنِىْ يَاعِبَادَ اللّٰهِ

অর্থাৎ, আমাকে সাহায্য কর হে আল্লাহর বান্দাগণ!

আর তুমি বলিতেছ— يَاعِبَادَ اللّٰهِ فَاَعِيْنُوْنِىْ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য কর।

যাহা হউক তোমার কথাটা এমন হইয়া গেল যেমন বে-দ্বীন ভণ্ড ফকীরগণ আল-কুরআনের আয়াতের অগ্রপশ্চাতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া মানুষের কাছে প্রচার করিয়া তাহাদিগকে ধোকা দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন— لَاتَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ

অর্থাৎ, তোমরা নামাযের নিকটে যাইও না।

অথচ— وَاَنْتُمْ سُكَرٰى

অর্থাৎ, তোমাদের নিশার অবস্থায়।

যে ইহার পরে উল্লেখ রহিয়াছে সে কথা জনগণের কাছে প্রকাশ করে না। তোমার উল্লেখিত হাদীসটি জমিউল জাওয়ামে কিতাবে ইমাম আবু ইয়ালা ও তীবরাণী (রঃ) উদ্ধৃতি দিয়া যেরূপে উল্লেখ রহিয়াছে তাহা এই—

إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ يَا عِبَادَ اللّٰهِ أَحْبِسُوْا عَلَيَّ يَا عِبَادَ اللّٰهِ أَحْبِسُوْا عَلَيَّ فَإِنَّ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا يَحْبِسُهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ -

অর্থাৎ, যখন কঙ্করময় ময়দানে তোমাদের মধ্যে কাহাকেও তাহার সওয়ারী পিঠ হইতে ফেলিয়া দেয়, তখন উচ্চৈঃস্বরে বল— হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! এই সওয়ারীকে থামাও! হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ। এই সওয়ারীকে থামাও। কেননা আল্লাহ্‌র যমীনে এমন কিছু বান্দা তাঁহার রহিয়াছে, যাহাদের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে তোমাদের জন্য থামাইয়া রাখেন।

ইহাছাড়া তিবরানী শরীফে এই হাদীসটি ওৎবা বিন গোযওয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হইয়া যেরূপে উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই—

إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا أَوْأَرَادَ غَوْثًا وَّهُوَ - بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيْسٌ فَلْيَقُلْ يَاعِبَادَ اللّٰهِ أَغِيْثُوْنِيْ يَاعِبَادَ اللّٰهِ أَغِيْثُوْنِيْ فَإِنَّ اللّٰهِ عِبَادًا لَّايَرَاهُمْ -

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তি কোন বস্তু হারাইয়া ফেলে বা কাহারো সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আর স্থান যদি এমন হয় যেখানে কোন সঙ্গী-সাথী বা সাহায্যকারী না থাকে, তবে এই কথা বলিয়া সাহায্যের প্রার্থনা কর— হে আল্লাহর বান্দাগণ, আমাকে সাহায্য কর। হে আল্লাহর বান্দাগণ আমাকে সাহায্য কর। কেননা আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু সংখ্যক বান্দা রহিয়াছেন যাহাদিগকে ইহারা দেখিতে পায় না।

প্রথমতঃ এই হাদীস দ্বারা সেই সকল উপস্থিত লোকদেরকে ডাকিবার বৈধতা বুঝা যায়। যাহারা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে শুধু কেবল এই কাজের জন্যই নিয়োজিত রহিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ইহা দ্বারা এহেন বন-জঙ্গলে ও মাঠে ময়দানে কোন সঙ্গী-সাথী ও সাহায্যকারী বর্তমান না থাকা অবস্থাকে শর্তাধীন করিয়া এতটুকু পরিমাণ সাহায্য প্রার্থনা বিশেষভাবে কেবল সেই কাজের বেলায়ই প্রযোজ্য হইবে, যেই কাজে মানুষ মানুষকে সাহায্য করিতে পারে না। চতুর্থতঃ

এই হাদীস যদি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত হইয়া থাকে তবে এই সাহায্য প্রার্থনার হুকুম শুধু কেবল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যই খাছ। আর যদি এই বিষয়বস্তু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত না হয়, তখন অন্য হাদীসের কারণে এই হাদীস অনুযায়ী আমল করা জায়েজ হইবে না। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে তাকীদের সাথে বলিয়াছেন— 'যখন তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়, তখন আল্লাহ তা'আলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা কর।'

ইহাছাড়া আল-কুরআনেও সচরাচর আমরা সূরাহ ফাতিহার মধ্যে যেই আয়াত তেলাওয়াত করিয়া থাকি তাহার হুকুমও রদ হইয়া যায় নাই। যেমন—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

অর্থাৎ, কেবলমাত্র আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমার নিকটই সাহায্য চাহি।

অত্র আয়াত দুইটি উভয়ের মধ্যেই সর্বপ্রথম إِيَّاكَ (কেবলমাত্র তোমরাই) শব্দদ্বয় উল্লেখ দ্বারা সীমিতকরণ অর্থ বুঝান হইয়াছে। যাহা হউক মানুষ যে "হে খোদার বান্দাগণ আমাকে সাহায্য কর" এই বাক্য দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করার মর্ম উপলব্ধি করিয়া কবরের নিকট হইতে ফায়দা লাভ করিয়া থাকে। ইহা অনুপস্থিতের উপর উপস্থিতকে কিয়াস করার নামান্তর এবং অর্থহীন কিয়াস। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সকল বান্দাগণের জীবিত থাকার কথা, তাহাদের নির্দিষ্টকৃত খেদমত এবং তাহাদের উপস্থিত থাকার কথা হাদীসে পরিষ্কাররূপে বর্ণনা দিয়াছেন। সুতরাং কবরবাসিগণ যে এই দুনিয়া হইতে অন্য জগতে চলিয়া যান তাহা সুস্পষ্ট কথা এবং উলামায় কেরামগণের সুযুক্তির দ্বারাও প্রমানিত। আর সুফিগণের দ্বীন-ধর্ম যদি তোমাদের নিকট সুফিগণের বর্ণনাকৃত হাদীসের উপরই নির্ভরশীল হয়, তবে সুফিগণের বর্ণনাকৃত এই হাদীসটি শোন। তাহারা বলিয়াছেন—

مَنْ زَارَ أَحْيَاً وَّلَمْ يُرْزَقْ شَيْئًا فَكَأَنَّمَا زَارَ مَيِّتًا -

অর্থাৎ, যদি কোন ব্যক্তি জীবিত লোকদের সাথে সাক্ষাত করিয়া তাহা হইতে কোন কিছু ফায়দা না পায়, তবে উহা মৃতদের সাথে সাক্ষাত করারই সামিল।

'ছমরাতুল হায়াত' কিতাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীসের মর্ম বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে, প্রকাশ্য দৃষ্টিতে ইহাই তার আসল মর্মার্থ। কিন্তু বাতেনী দৃষ্টিতে এই হাদীসের মর্মার্থ গিয়া এই হয় যে, যদি কোন লোক জীবিত অবস্থায় ওলী লোকদেরকে পাইয়া তাহার থেকে বাতেনী ফায়দা লাভ করিতে পারিল না। তবে ইহা মৃত ওলীগণকে না পাওয়ার সামিল। ইমাম বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী (রঃ) বলিয়াছেন এই হাদীসে রিযিক শব্দটি দ্বারা সাধারণ মর্মার্থের কথা বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ তাহা দ্বারা পার্থিব সাজ-সরঞ্জামের কথা বলা হইয়াছে। যেমন বর্ণিত আছে যে, কোন কোন দরবেশ লোক এই অর্থ অনুসারে তাহার নিকট গিয়া অভিযোগ সুরে বলিল— অমুক বুজর্গের কাছে যখন কোন লোক সাক্ষাত করিতে যায়, তখন সে অনাহুত লোকদেরকে খাদ্যদ্রব্য দিয়া দেয়। আর যদি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে তখন সে এই হাদীসটি তাহাদিগকে শুনাইয়া দেয়। হযরত বাহাউদ্দিন মুলতানী (রঃ) এই কথার জবাবে অতিরিক্ত এই কথা বলিয়াছেন যে, এখানে জাহেরী ও বাতেনী ফায়দাই রিযিক। কেননা এখানে তো— 'যদি কোন বস্তু না দেয় (لَمْ يُرْزَقْ شَيْئًا) এই কথা বলা হইয়াছে— যদি কোন খাদ্য দ্রব্য না দেয়— (لَمْ يُرْزَقْ طَعَمًا) এই কথাতো বলে নাই। আর দোয়াও প্রার্থনা করা হয়। যেমন—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ عِلْمًا نَافِعًا وَفَهْمًا كَامِلًا ـ

—'হে খোদা! উপকারী ইল্‌ম এবং পূর্ণ বোধজ্ঞান আমাকে দান করুন।'

ইহার পর বহাসকারী আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিল— নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কবর যিয়ারত করিতে হুকুম দিয়াছেন তাহার ভিতর কি ফায়দা নিহিত রহিয়াছে? আমি জবাবে বলিলাম ফায়দার কথাতো তিনি হাদীসের শেষে নিজেই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ ইহা দ্বারা মৃত্যুর ও পরকালের কথা স্মরণ হয়। ইহা হইল কবর যিয়ারতের ফায়দা।

কবর হইতে ফায়েজ গ্রহণের ক্রিয়াকলাপ বিদয়াতী ফকীরদের আবিষ্কৃত মনগড়া কাজ

এখানে কবর যিয়ারত দ্বারা তোমরা যে ফায়দা লাভ করিতে চাও এবং যাহা বলিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছ তাহা ফকীরদের আবিষ্কৃত মনগড়া কথা। এই ফকীরীর অবস্থা হইল যে তাহা অতি শীঘ্রই কুফরী পর্যন্ত নিয়া পৌঁছায়। সম্ভবতঃ এই পথটি বিদয়াতী ফকীরগণ নজর-নিয়াজ গ্রহণের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই আবিষ্কার করিয়া নিয়াছে। এই ফকীরী সেই ফকীরী নয়, যাহার প্রশংসায় 'ফকীরীই আমার গৌরব' বলিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং বিদয়াদকে বর্জন করিয়া চলা অপরিহার্য অঙ্গ বিশেষের মধ্যে সামিল।

আসল ফকীরীর হাকীকত

গাওসুল আজম সাইয়্যেদ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জীলানী (র) স্বীয় মুরীদগণকে অসিয়ত করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

حَقِيْقَةُ الْفَقْرِ اَنْ لَّا تَفْتَقِرَ اِلٰى مَنْ هُوَ مِثْلُكَ ـ

অর্থাৎ, আসল ফকীরী হইল তাহাই যাহার ভিতর নিজের ন্যায় অন্যান্য মানুষের কাছে কোনরূপ হাজত ও প্রয়োজন বর্তমান না থাকে।

পবিত্র কালাম পাকে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছে—

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاۤءُ اِلَى اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ, হে মানুষেরা! তোমরা সকলেই আল্লাহ তা'আলার নিকট ফকীর। (সুরা আল ফাতের)

আমার এই কথা শুনিয়া বহাসকারী লোকটি বলিল— 'আপনার এই কথার অর্থানুসারে হেদায়েত ও পীর মুরীদীর সমুদয় ক্রিয়াকলাপ ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। বহু বুজর্গানে দ্বীনকে অপরিহার্য্য রূপে ভ্রান্ত ও বাতেল বলিতে বাধ্য হইতে হয়। আর বুজর্গানদের ভুল ধরার অর্থ নিজকে ভুলের মধ্যে নিপতিত করার কথাটি আমাদের জন্য অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

অতঃপর আমি বলিলাম মোটামুটি ভাবে কথা হইল যে, কোন বুজর্গের দ্বারা গুনাহর কাজ হইলে ঐ কাজ গুনাহের তালিকা হইতে বাহির হইয়া পড়ে না। অর্থাৎ সেই গুনাহর কাজ গুনাহর কাজই থাকিয়া যায়। তাহার করার কারণে উহা সু-কাজে পরিণত হয় না। বরং ইহার দ্বারা ঐ বুজর্গের মুরীদ মোতাকেদ ও অনুসারিগণও গুনাহগার হয় এবং দুর্বল লোকদের মনে এই ধারণা জাগিয়া যায় যে, বুজর্গানদের ভুল খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং বার বার তাহা উল্লেখ করাও একটি মস্তবড় ভুল। কেননা দ্বীন শরীয়তে বুজুর্গানদের ইজতেহাদী (অনিচ্ছাকৃত) ভুলের জন্য ক্ষমা প্রাপ্তির দৃঢ় আশার কথা রহিয়াছে। আর তুমি বলিয়াছ যে ইহা দ্বারা পীরী-মুরীদীর কাণ্ডকারখানা ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়, তাহাও নয়। কেননা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার কবর মোবারককে ঈদগাহে পরিণত করিতে এবং মূর্তি পূজার ন্যায় ব্যবহার প্রদর্শন করিতেও মানুষকে কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়াছেন। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়রুবী ও পয়গম্বরী যেরূপ ছিল সেই ভাবেই প্রচলিত রহিয়াছে এবং প্রচলিত থাকিবে। সুতরাং এই সকল কাজ বর্জন করিয়া চলিলে ইহা দ্বারা পীরী মুরীদী যেমন বিনষ্ট হয় না, তেমনি ইহার পরম্পরা তরীকা ধারাটিরও কোনরূপ ক্ষতি সাধন হয় না।

একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

বহাসকারী আবার আমার কাছে বলিল যে, আমি একদিন একজন পীর পূজারীকে ফানা ফীশ শায়খদের (পীরের জন্য সব কিছু বিলাইয়া দেওয়া) দাবীকে আল কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটির ভুল ব্যাখ্যা করিয়া প্রমাণিত করিতে শুনিয়াছি। যেন আল্লাহ বলেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَوَلَّوْ قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
قَدْيَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارِ مِنْ اَصْحَابِ الْقُبُوْرِ -

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! যাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলার গজব নাযিল হইয়াছে তাহাদের সাথে বন্ধুত্ব করিও না। কবরে সমাহিত কাফেরগণ যেরূপ পরকালের কল্যাণ লাভ থেকে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে তাহারাও তেমনি পরকালের কল্যাণ ও সওয়াব থেকে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। (সূরা মুমতাহেনা)

ফকিরগণের মন মগজে এই আয়াতের এমন সুক্ষ্ম অপব্যাখ্যা চাপিয়া বসিয়াছে যাহা পূর্ববর্তী পরবর্তী কোন তাফসীর থেকে উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাহারা উল্লেখিত আয়াতটির তরজমা এইরূপে করিয়া থাকে।

সেই কওমের সাথে দোস্তী করিও না যাহাদের উপর আল্লাহ্র গজব নাযিল হইয়াছে, কেননা ইহারা পরকালীন কল্যাণ লাভ থেকে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। যেমন নিরাশ হইয়া গিয়াছে এই কওমের কাফেরগণ কবরবাসীদের হইতে ফায়দা লাভ থেকে অর্থাৎ বুজর্গানদের কবর হইতে বাতেনী ফায়দা বা ফায়েজ লাভকে তাহারা স্বীকার করে না। তাহার এই কথার জবাবে আমি বলিলাম— 'এই ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে নূতন ও অভিনব ব্যাখ্যা! এই ধরনের মর্ম ও ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী বুজর্গানদের কাহারো থেকেই উল্লেখ পাওয়া যায় না। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন— 'যে ব্যক্তি কুরআনের করীমের অর্থ ও ব্যাখ্যা নিজ মন মত করিবে, তাহার উচিত নিজের বাসস্থান দোযখ বানাইয়া নেওয়া।' বহাসকারী লোকটি বলিল— 'আল কুরআনের সবগুলি আয়াতের তরজমাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম হইতে বর্ণিত পওয়া যায় না। কতিপয় আয়াতের অর্থ মোফাস্‌সেরিনগণ নিজেদের পক্ষ হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং আপনি কি বলিতেছেন তাহা আমাদের অপরিহার্য যে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের বর্ণনাকৃত অর্থের যেন পরিপন্থী না হয়। তাহাদের বর্ণনাকৃত অর্থ অনুযায়ী যে অর্থ তাহারা করিবে, সেই অর্থও গ্রহণ করা বৈধ হইবে না এমন কথা নয়। এখানে তোমার পীর উল্লেখিত আয়াতের অর্থের বেলায় সাহাবায়ে কেরামদের বর্ণনাকৃত অর্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী অর্থ বর্ণনা করিয়াছে। এই কারণেই তাহার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার যোগ্য। বহাসকারী ইহার পর আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিল— আচ্ছা! এই আয়াতের ব্যাখ্যা সাহাবায়ে কেরাম কিরূপে করিয়াছেন তাহা বলুন! আমি উত্তর করিলাম কবরবাসীদের থেকে (مِنْ اَصْحَابِ الْقُبُوْرِ) কথাটির ব্যাখ্যায় সাহাবায়ে কেরামগণের থেকে বর্ণিত আছে যে, ইহা দ্বারা মৃত কাফেরদের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মৃত কাফেররাও নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাফসীরে দুররে মনসুরে ফরইয়াবী, ইবনে জরীর, তবিরানী এবং ইবনে আবু হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়া উল্লেখ হইয়াছে যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রঃ) বলিয়াছেন— কবরবাসীদের

মধ্য হইতে কাফেরগণ যেরূপ পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হইয়াছে তদ্রুপ এই লোকেরাও পরকালের বেলায় নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি আরো বলিতেছেন, সুতরাং যেমন তাহারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না তেমনি আশাও রাখেনা— যেমন কাফেরগণ তাহাদের মৃত্যুর পর নিজদের প্রতিদান অবলোকন করিয়া এবং পূর্ণ ওয়াকীফহাল হইয়া পরকাল হইতে নিরাশ হইয়া পড়ে, ইহারাও তেমনি নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে।

আর আবদু হামীদ ও ইবনে মানযার (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে নকল করিয়াছেন যে, তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন— 'কবরবাসী দ্বারা এখানে এ সকল কাফেরদের কথা বুঝান হইয়াছে, যাহারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ্ ইবনে মানযার হযরত সায়াদ বিন জোবাইর (রাঃ)-এর নিকট হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি বলেন— 'এই আয়াতে কবরবাসীদের দ্বারা ঐ সকল মৃত কাফেরদেরকেই বুঝান হইয়াছে, যাহারা পরকালকে দর্শন করিয়া নিরাশ হইয়াই গিয়াছে।' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মোজাহিদ ও আকরামা (রাঃ) হইতে নকল করিয়া সাঈদ বিন মনসুর বলেন যে, কাফেরগণকে যখন কবরে প্রবেশ করানো হয় তখন তাহারা আল্লাহর রহম হইতে নিরাশ হইয়া পড়ে। এই কথাই আল কুরআনের কথা। কবরবাসীদের দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে। আল্লামা ইবনে জরীর (রাঃ) এই বর্ণনাটির ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে নকল করেন যে,–'কাফেরদের মধ্যে যাহাদের মৃত্যু হয় তাহারা এই দুনিয়ায় ফিরিয়া আসা এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক দ্বিতীয়বার প্রেরণ করা সম্পর্কে জীবিতগণ নিরাশ হইয়া পড়ে।' সায়াদ বিন মনসুর ও এবনে মানযার (রাঃ) হযরত ইমাম হোসাইনের উদ্ধৃত দিয়া বলেন যে, তিনি বলিয়াছিলেন— এখানে জীবিত কাফেরদের মৃত কাফেরদের থেকে নিরাশ হওয়ায় কথা বলা হইয়াছে। আব্দুল রাজ্জাক ও ইবনে মানয়ার হযরত কাতাদাহ (রাঃ) হইতে (সেই কওমের সাথে বন্ধুত্ব করিওনা) (لَاتَتَوَلَّوْ قَوْمًا) কথার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন যে উহারা হইল সেই ইহুদী সম্প্রদায় যাহারা পরকালের এই কথা ভাবিয়া নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাদিগকে আবার দ্বিতীয়বার উত্থিত করা হইবে। যেমন নিরাশ হইয়া গিয়াছে কাফেরগণ তাহাদের মধ্যের মৃত কাফেরগণের দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তনের কথা ভাবিয়া।

আবদ ইবনে হামীদ মোজাহিদ (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, এই কাফেরগণ নিজেদের কুফরীর দরুন পরকাল সম্পর্কে এমনভাবে নিরাশ হইয়া গিয়াছে, যেমন নিরাশ হইয়া থাকে কাফের কবরবাসীগণ নিজেদের আমলনামা প্রকাশ হইবার সময় পরকালের সওয়াব সম্পর্কে। আবদ এমনে হামীদ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদাহ (রাঃ) হইতে নকল করিয়াছেন যে, তিনি বলেন— কাফেরদের মধ্য হইতে যখন কোন কাফের ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন তাহারা উহার সাথে সাক্ষাত লাভ ও সওয়াবের ব্যাপারে কোনরূপ আশা রাখে না।

তাফসীরে মাদারেকে এই একই কথার পুনরাবৃত্তি হইয়া উল্লেখ হইয়াছে যে, এই জীবিত লোকেরা এমনভাবে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। যেমন— তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে কবরবাসিগণ পরকালের সওয়াব লাভের বেলায় নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাফসীরে মুয়ালেমুত তান্যীল উল্লেখ আছে যে, এখানে قوما غضب الله (যেই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ তা'আলা তাহার গজব নাযিল করিয়াছেন) কথা দ্বারা ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের কথা বুঝান হইয়াছে। ইহার কারণ হইল যে, মুসলমানদের মধ্যে কিছু দরিদ্র লোক ইয়াহুদীগণকে মুসলমানের কথা শুনাইলে পর তাহারা তাহাদের বাগানের ফল ফলাদি উহাদিগকে দান করিত। তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদিগকে এইরূপ করিত নিষেধ করিলেন। তখন উহারা পরকালের কোনরূপ কল্যাণ ও সওয়াব পাইবেন না বলিয়া নিরাশ হইয়া পড়িল। যেমন মৃত কাফেরগণ পরকালের কল্যাণ ও সওয়াব না পাইবার কথা ভাবিয়া নিরাশ হইয়া যায়। অর্থাৎ যে সকল কুফ্ফার মৃত হইয়া কবরে সামহিত হইয়াছে তাহারা যেরূপ পরকালের কল্যাণ ও সওয়াবের কোন অংশ না পাইবার কথা ভাবিয়া নিরাশ হইয়া গিয়াছে, ইহাদের অবস্থাও তদ্রূপ। হযরত মোজাহিদ (রঃ) বলেন— কুফ্ফার যখন কবরে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে নিরাশ হইয়া যায়। মোট কথা— এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনগণ থেকে যেই মর্মার্থ উল্লেখ রহিয়াছে উহার সার কথা তোমার পীরের বর্ণনাকৃত মর্মার্থের সম্পূর্ণ পরীপন্থী।

অতঃপর বহাসকারী লোকটি আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিল যে আপনি এতগুলি হাদীস ও কথা কিরূপে স্মরণ রাখিয়াছেন? জবাব দিলাম যে আমি

তোমার প্রশ্নগুলি তিনদিন ধরিয়া শুনিবার পর আমার অন্তরে এই খটকা উদয় হইল যে, হয়ত প্রকাশ্য ভাষা অবলোকন করিয়া— আরবীর ব্যবহারিক প্রয়োগ বিন্যাসের দরুন তাহা দ্বারা আরো অধিক খটকা সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং এই কথা ভাবিয়া আমি নির্ভরশীল তাফসীর হইতে ইহা মুখস্ত করিয়া লইয়াছি। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দাতা এবং তিনিই সরল পথ প্রদর্শক।

অসীলার আয়াতের ব্যাখ্যা

বহাসকারী বলিল আচ্ছা বলুনতো আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য বুজর্গানদিগকে অসীলা বানান জায়েজ কিনা? জবাব দিলাম— হ্যাঁ ইহা জায়েজ আছে। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো এবং তাহার নিকটে পৌছিবার জন্য অসীলা অনুসন্ধান কর। আর তাহার পথে আপ্রাণ চেষ্টা চরিত্রও চালাইয়া যাও। তাহা হইলেই হয়ত তোমরা মুক্তি পাইয়া যাইবে। (সুরা আল মায়েদা)

কিন্তু আপনি যে কবর থেকে বাতেনী ফায়দা বা ফায়েজ লাভের কথা দাবী করিতেছেন ইহার সাথে এই আয়াতের আদৌ কোন সম্পর্কই নাই। বুজর্গানে দ্বীনকে অসীলা বানাইবার পথ হইল এই যে, তাহাদিগকে আল্লাহর পথে নিজের ইমাম ও নেতা-মনোনীত করিয়া তাহাদের নেক আমল যাহা কিছু কুরআন সুন্নাহ মাফিক হয়, তাহার পায়রুবী করিয়া যাওয়া। ইহাছাড়া উলামায় কেরাম এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, আসলে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মানুষের অসীলা হইল তাহাদের নেক আমলসমূহ। কেননা, নেক আমলই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের অসীলা হইতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ হইল তাহাদের বদ আমল। এই কারণেই উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা অসীলা অনুসন্ধান করার কথা উল্লেখ করার পূর্বে ঈমান ও তাকওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাই আয়াতের সার কথা হইল যে, হে মুসলমানগণ!

আল্লাহ্‌র হুকুম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের বিরোধিতাকে পরিহার করিয়া চল। আর আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য নেক আমলের অসীলা অনুসন্ধা কর; আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের অন্যস্থানে এরশাদ করিয়াছেন—

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ -

অর্থাৎ, পবিত্রতম কথা আল্লাহ তা'আলার দরবারে পৌছিয়া থাকে এবং নেক আমল তাহার নিকট মরতবাকে বুলন্দ করিয়া দেয়। (সূরায় আল-ফাতির)

আল কুরআনের এই আয়াতটিও আমাদের উদ্দেশ্যকে প্রমাণিত করার জ্বলন্ত দলিল বিশেষ। কতিপয় বুজর্গানে দ্বীন আল্ কুরআনের তেলাওয়াতকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের অসীলা ও মাধ্যম নিরূপণ করিয়া। ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল (রাঃ)-এর হাজার বার স্বপ্নে আল্লাহ তা'আলার সাথে দীদার হইয়াছিল। প্রত্যেক বারেই তিনি স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, হে খোদা! আপনার নৈকট্য কি বস্তুর দ্বারা এবং কি কাজের মাধ্যমে অর্জন করা যায়? জাবাবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বারেই তাহার কালাম আল্ কুরআনের তেলাওয়াতের কথা বলিয়াছেন। তিনি স্বপ্নে ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, হে ইলাহুল আলামীন। কুরআনের মর্মার্থ বুঝিয়া তেলাওয়াত করণ বা, না বুঝিয়া তেলাওয়াত করণ আপনার নৈকট্যের মাধ্যম হইতে পারে। পরবর্তিকালের মোতায়াখখেরীন ইমাম ও উলামায় কেরামগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবায়ে কেরাম ও আওলিয়ায়ে উম্মতের প্রতি আন্তরিক মহব্বত পোষণকেই পরকালীন নাজাতের অসীলা ভাবিয়া থাকেন। কেননা আন্তরিক আমলের মধ্যে ইহাও একটি আন্তরিক আমল আর যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সাথেই থাকে।'

(اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ) এই হাদীসটিও ইহার প্রমাণিক দলিল বিশেষ। এই হাদীসটিতে এই কথার প্রতিই ইঙ্গিত বহন করিতেছে যে, পরকালে যেই ব্যক্তি যেই লোকের সাথে থাকিতে ইচ্ছা করে, দুনিয়ায়ও তাহার সাথে মহব্বত রাখিয়া থাকে। অতঃপর বহাসকারী বলিল এখন বুঝিলাম যে, আমলই হইতেছে আসল অসীলা। আচ্ছা বলুনতো জেহাদ ফি সাবীলিল্লাহ কি? জবাব দিলাম যে,

জেহাদ ফি সাবীলিল্লাহর (আল্লাহ্র পথে জেহাদের) অর্থ হইল কাফেরদের সাথে এবং নফসে আম্মারার (কুবৃত্তি নিচয়ের) সাথে জেহাদ করা। কেননা এই কুবৃত্তি নিশ্চয়ই পার্থিব লোভ লালসা ও আরাম আয়েশের মধ্যে মানুষকে লিপ্ত করিয়া আল্লাহ্র পথ হইতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া রাখে। এই নফসে আম্মারার সব চাইতে বড় ভূমিকা হইল যে, নেক আমলের পরিবর্তে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য অসীলা বানাইয়া দিয়া থাকে এবং তাহার বাহককে বলে এই সৃষ্টি যদিও আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের অন্তর্ভূক্ত তাথাপি উহা তোমাদের জন্য স্রষ্টার মর্যাদা রাখিয়া থাকে। তোমরা নিজেদের অসীলার জন্য তাহাদিগের প্রতি সীমাহীন ইজ্জত সম্মান ও ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর।

তাজীমী সিজদার বিবরণ

এই কারণেই এই লোকেরা পীর মোর্শেদ ও শায়খদের সীমাহীন জ্ঞানের আঁধার এবং পূর্ণাংগ খবর রাখনেওয়ালার আকীদা বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকে। আর তাহাদের মধ্যে কতিপয় অতিরঞ্জিত ও বাড়াবাড়িকারী এবং কাট্টা গোমরাহ লোকেরা পীর মোর্শেদ ও শায়খদের জন্য তাজীমী সিজদার (সম্মান প্রদর্শনের জন্য সিজদা করা) রোসম্ বানাইয়া নিয়াছে। তাহারা বলিয়া থাকে যে, আমাদের এই সিজদা পীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ইবাদতের সিজ্দা ইহা নয়। আল্লাহ তা'আলাকেও যে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ইবাদতের রূপে সিজদা করা হয় এই পাপিষ্ঠরা সেই মোটা কথাটিও বুঝিয়াও বুঝে না। এই সময় বহাসকারী লোকটি জিজ্ঞাসা করিল— পীরের প্রতি সীমাহীন জ্ঞানের আঁধারের আকীদা পোষণ করা কি জায়েজ নয়? জাবাবে বলিলাম কস্মিনকালেও নয়। কেননা সমুদয় বস্তুর জ্ঞান থাকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। কোন সমুদয় মোশরেকগণও বুজর্গানদের অদৃশ্য আত্মাকে সীমাহীন জ্ঞানের আঁধার ভাবিয়া থাকে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এই ধরনের মুশ্রিকদের কথা ও আকীদাকে যে রদ করিয়া দিয়াছেন আল কুরআনের ভাষায় উহা নিম্নরূপ—

وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْـئًا وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ -

অর্থাৎ, আমি ঐ সকল প্রতিমাকে ভয় করিনা যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক করিতেছ। তবে আমার পরওয়ারদিগারেরই যাহা কিছু ইচ্ছা হয়। আমার প্রতিপালক প্রত্যেকটি বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান রাখিয়া থাকেন। ইহার পরও তোমরা নসীহত গ্রহণ করিবা না। (৬-৮)

হযরত মূসা (আঃ)-এর কওম এবং সামেরী লোকটি গো-বাচ্চার পূজা করিত এবং উহার সামনে মোরাকাবা মোশাহাদা ও ইবাদতের জন্য মনোযোগ সহকারে বসিয়া থাকিত। ইহাদিগকে বাতেল ঘোষণা করিয়া যে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে তাহার বিবরণ আল কুরআনের যবানে নিম্নরূপ—

اُنْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا -

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা সেই প্রভূর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যাহার ইবাদত পূজাপার্বনের জন্য তোমরা উহার সম্মুখে মনোযোগ সহকারে বসিয়া থাক। আমি উহাকে আগুনে পুড়িয়া ভষ্ম করিতেছি এবং ঐ ভষ্ম নদীতে নিক্ষেপ করিতেছি। তোমাদের আসল মাবুদ হইল সেই আল্লাহ তা'আলা, যিনি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কোন মাবুদ নাই। তিনি প্রত্যেকটি বস্তু সম্পর্কেই জ্ঞান রাখিয়া থাকেন।

আর ফেরেস্তাগণ আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে যে আকীদা বিশ্বাস রাখিয়া থাকেন। আল কুরআনের যাবানে তাহা এই—

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ -

অর্থাৎ, আমাদের পরওয়ারদিগার স্বীয় রহমত ও ইল্ম দ্বারা প্রত্যেকটি বস্তু আবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তাওবাকারীগণকে এবং আপনার পথে পায়রুবীকারিগণকে ক্ষমা করিয়া দিন। (হা-মিম)

মোটকথা হইল যে নফসের সাথে জেহাদের নিয়ম হইল এই অভিশপ্তকে শরীয়তের খেলাফ বলিতে এবং করিতে এবং মনে কু-ধারণা ও ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি

করা হইতে বিরত রাখা যেন উহার খপ্পর হইতে মানুষ নিজদিগকে মুক্ত করিয়া নিতে পারে।

শরী'আতের বিরোধিতা করা কুফরীর নামান্তর

অতঃপর আমি তাহাকে বলিলাম শেখজী! এতক্ষণ আপনি আমাকে সওয়াল করিতেই রহিলেন আর আমি জবাব দিতে ছিলাম। এখন আমি আপনার নিকট প্রশ্ন করিতেছি যে, আল কুরআন দ্বারা শুধু এতটুকুই অবগত হওয়ার যায় যে, সামেরী এবং তাহার সম্প্রদায় গো-বাচ্চাটির সম্মুখে ইতেকাফ করিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের কথা বর্ণনা করিয়া বলিতেছে— 'যতক্ষণ পর্যন্ত মূসা (আঃ) আমাদের কাছে ফিরিয়া না আসিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই গো বাচ্চাটির কাছে বসিয়া থাকিব।' প্রকাশ্য কথায় হযরত মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের অস্বীকার করণ তাহাদের থেকে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাহারা এই কথা বলিত যে, এই গো-বাচ্চাই তোমাদের মূসা (আঃ)-এর মাবুদ। মুসা পথ ভুলিয়া কোহেতুরে চলিয়া গিয়াছে। শুধু এতটুক কথা বলার কারণেই তাহারা সকলে কাফের হইয়া গিয়াছিল। হযরত মুসা (আঃ) তুর পাহাড় হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গো-বাচ্চাদের উপাসকদিগকে তাওবা করণে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিল। কেননা তাহার শরীয়ত মতে তাওবা কবুল হইবার জন্য হত্যা করণ শর্তরূপে পরিগণিত ছিল। এখন আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, কোন বস্তুর মধ্যে আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ অবলোকন করিয়া উহাকে ফায়েজ দানকারী মনে করা ফায়দা হাসিল করার জন্য উহার সম্মুখে বসিয়া ইতেকাফ উপাসনা করা, উহার খাদেম ও সেবায়েতগীরিতে পরিণত হওয়া উহার সেবা ও খেদমতকে ইবাদত বন্দেগী করা কি বৈধ না হারাম? তখন সে জবাব দিল শরীয়তের দিক দিয়া জায়েজ আর তরীকত অনুযায়ী ওয়াজিব। যেমন কবি বলিয়ছেন—

ابلهائے تعظیم مسجد میکنند *

در جفائے اهل دل جد میکنند ۔

অর্থাৎ, নির্বোধ লোকেরা মসজিদের খুব সম্মান দেয় এবং আহলে কলবগণকে (খোদার নূরে ভরপুর অন্তরবিশিষ্ট লোকদেরকে) অপমানিত করিতে থাকে।

নির্বোধের দলেরা ঐ রূপক মসজিদকেই আসল মসজিদ ভাবিয়া থাকে। কিন্তু আসল মসজিদ হইল নেক্কার লোকদের কলব। ওলী আল্লাহ লোকদের কলবে যে মসজিদ রহিয়াছে উহাই হইল সমগ্র মানুষের জন্য মসজিদ গাহ। সেখানেই আল্লাহ তা'আলা অবস্থান করিয়া থাকেন। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— আচ্ছা এই সব বস্তুগুলির অপরিহার্যতা অর্থাৎ ওয়াজিব হওয়া কি ঐ সকল তরীকত পন্থীগণ এহেন কবিতার দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন। প্রাচীন শীর্ষস্থানীয় বুজর্গানদের থেকে এইসব বস্তুগুলির ইবাদত উপাসনা সম্পর্কে কোন কথা রহিয়াছে? তখন সে বলিল 'শীর্ষস্থানীয় তরীকত পন্থীগণ এ সকল কথা সাধারণ লোকদের থেকে গোপন করিয়া রখিতেন। ইহা তাহাদের খাছ খাছ মুরীদ মোতাকেদ ছাড়া আর কেহই জানিতে পারিত না। আমি বলিলাম শরিয়ত ও তরীকতের সুমদয় কাজ ও বিধানাবলী পূর্ণরূপে জাহের ও প্রকাশ্য। উহার কোন কাজ ও বিধানই গোপন নাই। তাহাদের এহেন ধারণা মিথ্যা ও অলীক ধারণা বৈ কিছু নয়। ইহা দ্বারা বুজর্গানদের উপর মিথ্যা অপবাদ চাপাইয়া থাকে। যাহারা এই ধরনের বস্তুগুলির প্রতি সীমাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করে যদিও নিয়ত তাহাদের ভাল কিন্তু তাহারা ভুল ও গুনাহের থেকে পবিত্র নয়। এই কারণেই এই ভ্রান্ত পথের পায়রুবী করা শরীয়ত ও তরীকত উভয়ের নিকটই নাজায়েজ। কেননা বুজর্গানে দ্বীন বলিয়াছেন সেই হাকিকত ও মারেফাতের কোন সাক্ষী শরীয়তের মধ্যে বর্তমান পাওয়া যায় না, সেই হাকিকত মারফত কুফরী ও নাস্তিকতা ছাড়া কিছুই নয়। সে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিল। এই কথা কোন বুজর্গ বলিয়াছেন? জবাব দিলাম। ইহা হযরত মহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জীলানী (রঃ) লিখিত ফতহুল গায়ব কিতাবে লিখিত রহিয়াছে। সে বলিল তরীকতের কোন কামেল পীর মাশায়েকের কথাও হইতে পারে না। কোন কবি বলিয়াছেন—

ازحق جز حق مخواه توحید این است *

ازسایه خود گریز تفرید این است ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার নিকট সত্যের অনুসন্ধান হইল তাওহীদ আর নিজ ছায়া হইতে ভাগিয়া পলায়ন করাই হইল তাফ্‌রীদ।

অতঃপর আমি বলিলাম শেখজী-দ্বীন শরীয়তের মধ্যে এই সব রোসম রেওয়াজ-গত কথার কোনই মূল্য নাই। অতঃপর আমাদের শেষ দাবী হইল যে সমস্ত প্রশংসা একমাত্র রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য এই কথা বলিয়া আমাদের আলোচনা শেষ করিলাম

পরিশিষ্ট

আমার এই কিতাবে যে সব বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে তাহা পীর পূজা ও কবর পূজা রোগের পূর্ণাংগ আরোগ্যদানের জন্য যথেষ্ট হওয়ার পরও এখানে এই দীর্ঘ বহাসটির অবতারণার কারণ হইল যে, কবর পূজারিগণ ও পীর পূজারিগণ এই ধরনের সূক্ষ্ম প্রশ্নাবলী উত্থাপন করিয়া থাকে তাই আমি উহা লিপিবদ্ধ করিয়া মুসলামনদের ভ্রম ও সন্দেহ বিদূরীত করার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। ইহা ছাড়া বিষয়বস্তুর বিশদ ব্যাখার উদ্দেশ্যে অসীলা সম্পর্কীয় হাদীসটির তরজমা লিখিয়া এই জন্য কিতাব খাতেমা বিল খায়ের করিয়াছি যেন মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভের অসীলা এবং উহার প্রতিবন্ধকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়।

অন্ধ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসের আলোচনা

উম্মে মাকতুম নামে এক অন্ধ লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত মোবারকে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল। ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করুন, যেন তিনি আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরাইয়া দেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে অজু করিয়া আসিয়া দুই রাকায়াত নামায আদায় করার পর নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করিতে হুকুম ফরমাইলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِىِّ الرَّحْمَةِ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اِنِّى اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ قَضَاءِ حَاجَتِىْ لِيَقْضِيْهَا اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ -

অর্থাৎ, হে খোদা! আপনার রহমতের নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীলাসহ প্রর্থানা করিতেছি, আপনার দিকে মনোনিবেশ

করিতেছি। হে আল্লাহ্র নবী! আমি আপনার মাধ্যমে আমার হাজত পূরণের জন্য আমার প্রভুর দিকে মনোনিবেশ করিতেছি, যেন তিনি আমার হাজত পূরণ করিয়া দেন। হে খোদা! আমার সম্পর্কে তাহার সুপারিশ কবুল করুন।

এই দোয়া করার পর আল্লাহ তা'আলা উম্মে মাকতুমের দৃষ্টি শক্তি ফিরাইয়া দিলেন।

এই হাদীসের ভিতর শিরক থেকে মুক্তি লাভের দুইটি পথ রহিয়াছে। একটি অধিক নিরাপদ মূলক রাস্তা (আসলাম)। আর দ্বিতীয়টি সাধারণ নিরাপদ মূলক রাস্তা (সালেম)। অধিক নিরাপদ রাস্তা হইল যে, ইহা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সাথে একান্তরূপে সংশ্লিষ্ট ও খাছ। সম্ভবতঃ অন্ধ লোকটি মসজিদে নববীতে আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দুই রাকায়াত নামাজ আদায় করিয়া স্বীয় প্রার্থনার মধ্যে তাঁহার নাম মোবারক 'ইয়া নবী আল্লাহ' বলিয়া দোয়া করিয়াছিল। তাই এই করুণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে দয়ার উদ্রেক হইলে তিনি তাহার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোয়া করিলেন। যেমন— اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ বাক্য দ্বারা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায়। এই জন্যই কতিপয় লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাসের পরিপন্থী এই কাজটিকে তাহার মাজেযার মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন। আমাদের বর্ণিত এই সারমর্মের অনুকূলে দলিলরূপে এই কথাই উত্থাপন করিতে চাই যে শীর্ষস্থানীয় সাহাবাগণের মধ্যে কোন সাহাবাই নিজেদের অভাব-অনটন, দুঃখ-দুর্দশা ও প্রয়োজন মুহূর্তে এই দোয়াকে কখনো পাঠ করেন নাই। এমনিভাবে আরও অনেক হাদীস রহিয়াছে যাহার উপর আমল করেন নাই। ফলে উহার হুকুমও প্রয়োজ্য হইবে না। ইহা ছাড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই দোয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে পাঠ করার জন্য যেমন নির্দেশও দেন নাই তেমনি মসিবতের মধ্যে কেহ নিপতিত হইলেও তখনও তাহাকে এই দোয়া পাঠ করার জন্য হুকুম করেন নাই। এই হাদীসের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যদি গভীরভাবে উহার বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়, তবে আর কোন প্রশ্নের উদ্রেক হয় না। বিষয়-বস্তুর দ্বারা মনে হইতেছে যেন ঐ লোকটি শুধু সুপারিশ করার আবেদন নিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাই হুযুরের জীবদ্দশায় তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া

তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল— হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি আপনাকে আমার খাছ প্রয়োজন ও হাজত পূরণ করার জন্য আমার প্রভুর দিকে মনোনিবেশ করিতেছি। যেন তিনি আমার হাজত পূরণ করিয়া দেন। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহার সুপারিশের জন্য মনোনিবেশ করিলেন। তখন এই প্রার্থনাকারী আল্লাহ্‌র দরবারে আরজ করিল— হে রাব্বুল আলামিন। আপনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমার সম্পর্কীয় সুপারিশকে কবুল করুন। এই ঘটনাটির উদাহরণ হইল যে, যদি কোন গরিব লোক বাদশাহর তরফ হইতে কষ্ট পায় তখন সে ওজীরের নিকট ফরিয়াদ নিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, হুজুর। আপনি আমাকে এমন কোন কর্মপন্থা বলিয়া দিন যাহাতে আমার এই দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হয়। ওজীর বলিল— আমি বাদশাহর স্বভাব প্রকৃতি সর্ম্পকে খুবই ওয়াকিফহাল তিনি বিনয়তা খুব পছন্দ করিয়া থাকেন। সুতরাং তুমি নিজে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার দরবারে বিনয়তা ও কাকুতি মিনতি করিয়া দরখাস্ত না করিবে, ততক্ষণে আমার সুপারিশ তোমার জন্য কোনই উপকারে আসিবে না। অতএব তুমি যখন বাদশাহর দরবারে আসিবে, তখন পূর্ণ একাগ্রতার সাথে তাহার পানে লক্ষ্য করিবে এবং আমার সাথে তোমার যে আন্তরিক মহব্বত রহিয়াছে সেই মহব্বতের কথা প্রকাশ করিয়া বলিবে— হে বাদশাহ নামদার! আপনি ওজীরের প্রতি খুবই দয়াশীল আর আমি আপনার ওজীরের বন্ধু। এই অসীলা নিয়াই আপনার দরবারে উপস্থিত হইয়াছি। আর এই উপস্থিত ওজীর সাহেব আমার ব্যাপারে আপনার দরবারে সুপারিশ করিতেছ। অতঃপর তুমি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিবে— হে আমার বাদশাহর ওজীর। আমি খুব বিনয়তার সাথে আমার মাকসুদ পূরনের জন্য বাদশাহর কাছে আপনাকে অসীলা ও মাধ্যম পরিণত করিয়া এই আশা নিয়া আসিয়াছি যে, বাদশাহ আমার হাজত পূরণ করিয়া দিবেন। এই সময় আমি তোমার জন্য সুপারিশ করিব। কিন্তু তুমি তখন গাফেল থাকিবে না— বরং সাথে সাথে বলিবে হে বাদশাহ নামদার! আমার জন্য আপনার ওজীর যে সুপারিশ করিতেছে— আপনি উহা কুবল করুন। কেননা আপনার মঞ্জুরী ব্যতীত আমার সাফল্য লাভ হইতে পারে না। ঠিক এই ঘটনাটির ন্যায়ই হইল হযরত উমর (রাঃ) বৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করার ঘটনা। তিনি নিজ সঙ্গী সাথীসহ মদীনার বাহিরে উপস্থিত হইয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে সামনে উপস্থিত রাখিয়া তাহার অসীলা দিয়া বৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন— হে ইলাহুল আলামীন! ইতিপূর্বে আমরা বৃষ্টি না হওয়া অবস্থায় আপনার নবীকে অসীলা মনোনীত করিয়া প্রার্থনা করিতাম। এখন যেহেতু আপনার নবী আমাদের মধ্যে নাই। সুতরাং আপনার নবীর প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে অসীলা মনোনীত করিয়া আপনার দরবারে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাদের জন্য আপনার রহমতের বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করুন এবং আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন। আমরা সকলেই আপনার পরিবারবর্গের প্রিয়জন এখানে থেকে পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয় যে, উল্লেখিত নিয়ম মাফিক জীবিত বুজর্গানদেরেকে নিজেদের দোয়া কবুলের ব্যাপারে কোন মুসলমানদের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে অসীলা মনোনীত করা শুধু বৈধই নয় বরং সাহাবাগণের সুন্নাত। আর আমি যদি বলি যে ইহা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও সুন্নাত, তবে তাহাও দুরুস্ত হইবে। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অন্ধ লোকটিকে অসীলা ধরার এই পদ্ধতিটিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আর প্রকাশ্যরূপে শির্কের মধ্যে নিপতিত না হওয়া নিরাপদ পথ হইল যে এই বাক্য দ্বারা ইংগীতমূলক পদ্ধতিতে (ইসরাতুন্নস) শুধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্তাকেই বুঝিতে হইবে। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুপস্থিতির বেলায় ইহা রূপক অর্থে যে ব্যবহৃত হয় তাহা সুস্পষ্ট কথা। সুতরাং রূপকের প্রয়োগের জন্য রূপক কারণ থাকা একান্ত অপরিহার্য্য আর সেই কারণ ও উপকরণ হইল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্রতম সত্তা ঈমানী বৈশিষ্টের সাথে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিহিত আছে। অর্থাৎ উহা প্রত্যেকটি মুসলামানের কলবের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে সুতরাং প্রার্থনাকারী আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই প্রকাশ্য আওয়াজে প্রার্থনা করিয়াছে। কেননা ইহাই হইল শক্তিশালী অসীলা যে আমার দোয়া আপনার নবীর প্রতি ঈমান আনা। আর এই স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইয়া মুহাম্মদ' বাক্যের পর 'ইয়ানবী আল্লাহ' বাক্য বলিতে শিক্ষা দিয়াছেন। এই রূপ অর্থের

সূক্ষ্ম তত্ত্ব কবিগণ এবং কবিতার প্রতি অনুরাগী মনই সুন্দররূপে অনুবাধন করিতে পারে। যেমন হাফিজ বলিয়াছেন ای نسیم سحرا رام گاه یار کجا است (হে ভোরের বায়ু বন্ধুর শান্তি নিকেতন কোথায়)।

মোট কথা হইল যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা কারিগণ অধিকাংশ সময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসীলের জন্য এক ধরনের কাল্পনিক ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা প্রকাশ করিয়া থাকে। আর যখন পর্যন্ত এই কাল্পনিক ব্যাকুলতা অস্থিরতা শির্কের অন্ধকারময় কুয়ার মধ্যে নিপতিত করিয়া ফেলে। এই জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই রোগের প্রতিবিধান অনেক স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখিত হাদিসটির اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ বাক্যটিও ইহার জন্য প্রকাশ্য দলিল যে, এই অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা কাল্পনিক, আসল ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা নয়। যদি তাহাই না হইত, তবে এই দোয়া করার প্রয়োজন হইত না যে, হে খোদা! আপনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার ব্যাপারে সুপারিশকারী মনোনীত করুন। বরং ইহা বলাই যুক্তি যুক্ত ছিল যে হে নবী! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি আমার জন্য সুপারিশ করুন। কতিপয় বুর্জগান এখানে যেই কথা বলিয়াছেন তাহা খুবই যথার্থ কথা। তাহারা বলিয়াছেন যে فَشَفِّعْهُ শব্দের মধ্যে যে সর্বনামটি নিহিত রহিয়াছে উহা দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিই ইংগীত দান করা হইয়াছে। যদি ইয়া মুহাম্মদ ই-আসল সম্বোধন হইত তবে فَشَفِّعْ هٰذَا النَّبِىَّ (এই নবী সুপারিশকারী মনোনীত করুন) বাক্য বলা হইত। যদিও ইহার মধ্যে রূপকথা বর্তমান রহিয়াছে তথাপি অনুপস্থিত সর্বনাম ব্যবহার দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তাকে সামিল করা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং প্রথম নিয়মটিই শিরিক হইতে মুক্তি লাভের নিরাপদ পন্থা।

এই হাদীসের মধ্যে আরো দুইটি ভ্রান্ত পথের অবকাশ রহিয়াছে। ইহার একটি হইল অত্যাধিক দুষ্ট পথ (আক্বাহ) আর দ্বিতীয়টি সাধারণ দুষ্ট পথ (কবীহ)। সব চাইতে দুষ্ট পথ হইল উহাই যাহা কবর পূজারিগণ বুঝিয়া নিয়াছে। ইহারা বলিয়া থাকে যে, পবিত্র আত্মাসমূহকে ডাকা এবং তাহাদের নিকট হাজত পূরণের জন্য দরখাস্ত করা সুন্নাত ও মোস্তাহাব। এই পথটি খারাপ

হইবার কারণ হইল যে, যাহা সম্পূর্ণরূপে কুফরী ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ তা'য়ালা ইহা থেকে সকলকে নাজাত দেন। আর অপেক্ষাকৃত কম দুষ্ট পথ হইল যে, কতিপয় লোক বলিয়া থাকে যে, নিজ উদ্দেশ্য ও মনোবাঞ্ছার জন্য পবিত্র আত্মাসমূহকে ডাকা নিজেদের হাজত পূরণের জন্য তাহাদিগকে সুপারিশকারী মনোনীত করা এবং উহাদিগের সুপারিশ নিজের জন্য কবুল হইবার আকীদা বিশ্বাস পোষণকারীর বৈধতাও এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। এই পথটি খারাপ হইবার কারণ হইল যে শরীয়ত প্রবর্তকের বিনা অনুমতিতে দ্বীনের কোন কাজকে নিজের রায়ের দ্বারা বৈধ করিয়া নেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার চেয়ে আর খারাপ কাজ কিছুই থাকিতে পারে না। পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الَّذِيْنَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, তাহাদের কি আল্লাহ তা'য়ালার সাথে এমন কেহকে অংশীদার করিয়া নিয়াছে যাহারা তাহাদের জন্য এমন জীবন বিধান (শরীয়ত) নিরূপণ করিয়া দিয়াছে, যাহার অনুমতি আল্লাহ তা'য়ালা দান করেন নাই।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ـ

তাহারা কি আল্লাহ তা'য়ালাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যলোককে নিজেদের সুপারিশকারী মনোনীত করিয়া নিয়াছে? হে নবী আপনি বলিয়া দিন যে ইহারা যখন কোন বস্তুর মালিক নয় এবং কিছু বুঝেনা (তাথাপি তোমরা উপাসনা করিতেছ কেন।) (সূরা আয যুমুর)

আল কুরআনের এই আয়াতদ্বয় সমস্ত প্রকার অলিক বাতেল ধারণাসমূহ দূর করার জন্যই যথেষ্ট।

আমাদের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই স্থানটি পদস্খলনের স্থান। বহু লোকই সুপারিশকারী এবং যাহার নিকট সুপারিশ করা হয় এই দুই এর পার্থক্য নির্ণয় করিতে না পারার কারণে গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত হইয়াছে। ভণ্ড পীর মুরীদেরা এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকে— 'ইয়া শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী

সাইয়্যান লিল্লাহ।' অর্থাৎ হে আব্দুল কাদের জ্বিলানী। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে কিছু দাও।' এই কথা দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালাকে সুপারিশকারী এবং হযরত আব্দুল কাদের জ্বিলানীকে (রঃ) দাতায় পরিণত করা হইয়াছে। অথচ বাস্তবে বিষয়টি ইহার সম্পূর্ণ উল্টা। এক বেদুঈন লোক রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল— ইয়া রাসুলাল্লাহ। আমি আপনার সম্মুখে আল্লাহ তা'য়ালাকে সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত করিতেছি। বেদুঈনের কণ্ঠে এই কথা শুনামাত্র— গোস্বায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মোবারক রক্তের ন্যায় লাল টক্ টকে হইয়া গেল। অতঃপর তিনি বলিলেন কাহারো সম্মুখে আল্লাহ তা'য়ালাকে সুপারিশকারী রূপে উপস্থিত করার চাইতে তাহার শান মরতবা মহত্ব অনেক উর্ধ্বে।'

এই হাদীস দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, আল্লাহ তা'য়াকে মাধ্যম বানাইয়া বা তাহার অসীলা দিয়া কোন সৃষ্টি বস্তুর নিকট স্বীয় হাজত পূরণ করিয়া দিতে বলা বা চাওয়া বিশেষ করিয়া কোন অনুপস্থিত ও মৃত মানুষের নিকট চাওয়ার অর্থ হইল আল্লাহ তা'য়ালাকে অপারগ মুজবুর ও দুর্বল মনে করা। আর তাহার সৃষ্টিকে শক্তিশালী ও স্বাধীন মনে করা। (আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ইহা হইতে পানাহ চাহিতেছি) আমাদের ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য লাভের একমাত্র অসীলা হইল নেক আমলসমূহ এবং উত্তম গুণাবলী। চাই এই আমল ও গুণাবলী খোদা প্রদত্ত হউক বা নিজ প্রচেষ্টা দ্বারা উপার্জন করিয়া নেওয়া হউক। যে কোন ধরনের হউক না কেন ইহা দ্বারাই আল্লাহর নবীর মাকামে মাহমুদা লাভের অসিলার জন্য যে প্রার্থনা করা হয় তাহাই ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ। যেমন পাঠ করা হইয়া থাকে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ
الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا
مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهَ ـ

অর্থাৎ, হে পরওয়ারদিগারে আলম! হে পূর্ণ দোয়া কায়েমকৃত নামজের প্রভু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন অসীলা ফজল বুজর্গী ও উন্নত মর্যাদা দান করুন। আর ইহার বদৌলতে তাহাকে 'মাকামে মাহমুদায়

পৌছাইয়া দিন। যেই মাকামে মাহমুদার সম্মান দান করার জন্য আপনি ওয়াদা করিয়াছেন।' এখানে অসীলা— শব্দটি স্বীয় গুণ বৈশিষ্ট্যের সাথে যেই বস্তুর অসীলা দেওয়া হইয়াছে। আর উভয় অবস্থায়ই তাহার দ্বারা গুণ বৈশিষ্ট্যে কথা বুঝান হইয়াছে। সত্তার কথা নয়। সুতরাং আনে মুহাম্মাদানেল অসীলাতার অর্থ এই দাঁড়ায় যে— হে আল্লাহ তা'য়ালা! আপনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেই বিশেষ গুণাবলী দান করুন যাহা মাকামে মাহমুদায় সম্মান লাভের উপকরণ হইয়া দাঁড়ায়। অথবা সেই অসীলা দান করুন। যাহা মাকামে মাহমুদা লাভের মাধ্যম হয়। আর ধাতুগত (মাহমুদার) দিক দিয়া ইহার অর্থ এই হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাকামে মাহমুদা লাভ করার কারণ উপকরণগুলি দান করুন। আর এই দোয়ার ভিতর যে অসিলার সাথে ফজীলতের প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, উভয় স্থানেই গুণাবলীর কথা বুঝান হইয়াছে সত্তার কথা নয়। মুদ্দা কথা হইল যে অসীলা হইল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই গুণাবলী, যাহার দ্বারা তিনি মাকামে মাহমুদায় উপনীত হইয়া অর্থাৎ উহার সম্মান লাভ করিয়া নিজ উম্মতগণকে কিয়ামতের দিন শাফায়াত করিবেন।

যাহাত্বা পীর বুজর্গানদের সত্তাকে অসিলা ভাবিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজ মাফিক আমল করে না তাহারা অসীলারও পায়রুবী করে না। অথচ মূল অসীলা হইল সুন্নাতের পায়রুবী করা। কেননা নেক আমল ও সৎ গুণাবলীর নামই হইল অসীলা যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে একটি ঘটনা উল্লেখ আছে যে, তিনজন লোক একত্রে মরুময় শীলা ভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিল হঠাৎ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল। বৃষ্টি হইতে নিরাপদে থাকার জন্য তাহারা একটি পাহাড়ের গুহার ভিতর গিয়া আশ্রয় লইল। এদিকে হঠাৎ পাহাড়ের উপর হইতে প্রকাণ্ড এক শিলা খণ্ড গুহার মুখ বরাবর আসিয়া পড়িল এবং গুহার মুখ বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িল। অবশেষে একে অপরের নিকট এই বলাবলী করিতে লাগিল যে, আস আমরা আমাদের নিজ নিজ নেক আমলের অসীলা দিয়া আল্লাহর তা'য়ালার দরবারে গুহার মুখ খোলার জন্য প্রার্থনা জানাই। সুতরাং উহার মধ্যে এক ব্যক্তি নিজের যৌন অপকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকার কাজটিকে অসীলা মনোনীত করিয়া আল্লাহ

তা'য়ালার দরবারে এই বলিয়া প্রার্থনা করিল— ইলাহুল আলামীন! আমি যদি এই কাজ আপনার সন্তুষ্টির জন্য করিয়া থাকি তবে এই পাথরের টুকরাকে গুহার মুখ হইতে সরাইয়া দিন। এই দোয়া করার সাথে সাথে পাথর এতটুক পর্যন্ত সারিয়া গেল যে উহার ফাকা হইতে আসমান দেখা যায়। দ্বিতীয় লোকটি স্বীয় পিতামাতার খেদমতের অসীলা দিয়া অনুরূপ ভাবে দোয়া করিলে এবার পাথর খণ্ড দুই তৃতীয়াংশ গুহার মুখ হইতে সরিয়া পড়িল। তৃতীয় লোকটি স্বীয় সততা ও আমানতদারীকে অসীলা নিরূপণ করিয়া এমনিভাবে দোয়া করিল যে খোদা! আমি কোন মজদুরের মজুরী দ্বারা দ্বিগুণ চৌগুণ রোজগার করার পর মূল মজুরীসহ উহা আসল প্রাপককে দিয়া দিয়াছি। সুতরাং ইহা যদি আপনার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করিয়া থাকি তবে এই পাথর এখনি সরাইয়া দিন। এইভাবে সে দোয়া করিলে পাথর গুহার মুখ হইতে সম্পূর্ণ রূপে সরিয়া গেল এবং গুহা হইতে বাহির হইবার পথ পরিষ্কার হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা সকলেই বাহিরে চলিয়া আসিল। যাহারা আল্লাহ তা'য়ালার মহব্বতকেই আসল উদ্দেশ্য মনে করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বতকে অসীলা মনে করে এবং তাহার পায়রুবী নিজের জন্য অপরিহার্য করিয়া নেয় এবং বুজর্গানের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হিসেবে দোস্তী রাখিয়া থাকে, তবে তাহাদের এই আন্তরিক আমল যে নাজাতের অসীলা হইতে পারে তাহার প্রমাণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীসটি। তিনি এরশাদ করেন— আল্লাহ তা'য়ালাকে এই জন্য মহব্বত কর যে তিনি তোমাদিগকে সর্বপ্রকার নেয়ামত দান করিয়া থাকেন। আর আমাকে মহব্বত কর এই কারণে যে আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে মহব্বত করিয়া থাকেন। আর আমার মহব্বতের জন্য আমার পরিবারবর্গের লোকজনকেও মহব্বত করিতে থাকে। পীরগণকে মহব্বত করণের বেলায় এই হাদীসটিও হইল মূলসূত্র। কিন্তু নিজের পীরের কথা ও কাজকে উহার পীরের কথা ও কাজের মোয়াফিক ভারিয়া এই শর্তে মহব্বত করা যে, এই পীর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম পীর পর্যন্ত সকলের কথা ও কাজ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজ মোতাবিক হওয়া একান্ত অপরিহার্য। পীর পূজারী ও কবর পূজারিগণকে বুঝিয়া ফেলিয়াছে যে পীরের লাঠি পীরের স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি পীরের কবর

পীরেরই ন্যায়। এই বুঝ ও আকীদা বিশ্বাস যেমন শরীয়ত ও তরীকতের সীমারেখার বহির্ভূত, তেমনি ইহা অসীলার অর্থের জন্তু সদৃশ অবুঝ জনসাধারণকে ধোকা দিয়া পথভ্রষ্ট করিয়া নিজেরা পরিচালিত ও ইমাম সাজিয়া গোমরাহীর ময়দানে বিচরণ করিতেছে।

রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অসীলায় পরিণত করা কেবল তখনই নাজাত লাভের উপকরণ হইতে পারে, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়রুবী করা হয়। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন—

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ۔

অর্থাৎ, হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি বলিয়া দিন যে, যদি তোমরা বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত করিতে চাও তবে আমার পায়রুবী করিয়া চল। তাহা হইলেই আল্লাহ তা'য়ালাও তোমাদিগকে মহব্বত করিবেন এবং তোমাদের গুনাহরাশি ক্ষমা করিয়া দিবেন। (সূরা আল এমরান)

আল্লাহ তা'য়ালার এই কালাম দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয় যে, যেই ব্যক্তিকে অসীলা দেওয়া হয়, সেই ব্যক্তির আমলের পায়রুবীই হইল আসল অসীলা। যদি তোমরা বল যে নবীর শাফায়াত নাজাতের অসীলা এবং আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ব্যতীরেকে কোন লোকই শাফায়াত করিতে পারিবে না। আর আল্লাহর অনুমতি মু'মিন ছাড়া আর কাহারো জন্য হইবে না। তবে এখানে নাজাতের অসীলা ও মধ্যম ঈমান, যাহা নিঃসন্দেহে মু'মিনের নেক আমল। কবি বলিয়াছেন—

کار خود کن کار بیگانہ مکن *

در زمین دیگران خانہ مکن۔

অর্থাৎ, নিজের কাজ নিজে করিয়া যাও, অপরের কাজ তুমি করিও না। আর পরের জায়গায় তুমি নিজের ঘর বানাইও না।

ইহা দ্বারাও পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য লাভের অসীলা একমাত্র উহাই হইতে পারে, যাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের কথা ও কাজ মাফিক হইবে। আর তাহার পায়রুবীও করা যাইতে পারে। আর যাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজ মাফিক হইবে না তাহা অসীলা মনে করিয়া নিয়াছে। আর কাফের ও মূর্তি পূজারীরা নিজদের ইমাম ও নেতাগণের প্রতিমূর্তি সম্পর্কে অসিলার আকীদা পোষণ করিয়া নিয়াছে। ইহাদের ভ্রান্ত বুঝ হইল যে, যেই লোক আসলে পথ প্রদর্শক নয় সেই লোকের পায়রুবী উহারা করিতেছে। এমন ভণ্ড পথ প্রদর্শকের আলোচনা করিতে গিয়া আল কুরআন যে বিবৃতি দিয়াছে তাহা এই—

فَمَنْ يَّهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمْ مَّنْ لَّايَهِدِّىْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى فَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ وَمَايَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّاظَنًّا اِنَّ ظَنَّ لَايُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে চলিয়া থাকে সেই ব্যক্তি কি আনুগত্য পাইবার অধিক যোগ্য লোক, না যেই ব্যক্তি অপরের পথ প্রদর্শন ব্যতীত পথ পাইতে পারে না সেই ব্যক্তি? তোমাদের হইল কি? তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত নিতেছ? অধিকাংশ মানুষই নিজেদের ধারণা ও অনুমানের পায়রুবী করিয়া থাকে। অথচ সত্যের সম্মুখে অনুমান ও ধারণার কোনই মূল্য নই। (সূরা ইউনুস)

এই আয়াতের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করিলেও বুঝা যায় যে, অনুমান ও ধারণার পায়রুবীকারী শাস্তির কারণ তাহাদের আমল ছাড়া আর কোন বস্তুই নয়। সুতরাং যাহারা নেক আমল করিয়া থাকে, তাহাদের নাজাতের অসীলা হইল তাহাদের আমল আর যে বস্তুর অসীলা দেওয়া হয়, তাহা যখন নেক আমলের মধ্যে নয়, তখন তাহা কিভাবে নাজাতের অসীলা হইতে পারে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত মাফিক কাজ করাই হইল নেক আমল। তাফসীরে হোসাইনীর প্রণেতা—

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ـ

অর্থাৎ, যাহারা আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সাক্ষাত করিবার আশা পোষণ করে, তাহাদের উচিত নেক আমল করিয়া যাওয়া এবং তাহার ইবাদতের মধ্যে কাহাকেও অংশীদার না করা।'

আয়াতের ব্যাখ্যায় কতিপয় সাহাবায়ে কেরামের অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন যে, নেক কাজ তাহাকেই বলা হয়, যাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত মাফিক হইবে। ইহাও আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, ইবাদতগত শির্ক এবং অভ্যাসগত শির্কের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। কোন সত্তাকে আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদতের ন্যায় নিজের কল্যাণময়ী উপকারী ও ফলবতী ধারণা করাকেই শির্ক ফীল ইবাদত বা ইবাদতের মধ্যে শির্ক করা বলা হইয়া থাকে। এই দিক দিয়া জাহেল লোকেরা নেক আমলকে ছাড়িয়া দিয়া হসব নসব ও বংশীয় কৌলিণ্যতাকে সম্মান দিয়া থাকে এবং বুজর্গানদের নামকে অসীলা ও দেওয়া বৈধ ভাবিয়া দ্বীন-দুনিয়ার কাজে উন্নতি করার জন্য অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। আর কতিপয় লোকের মতে রিয়াকারী বা মানুষকে দেখানোর জন্য বা নাম কাম করার জন্য কোন কাজ করাই হইল শিরিক ফীল আদাত বা অভ্যাসগত শির্ক। উহাদের অবস্থাদর্শে মনে হইতেছে যে, মানুষকে দেখানো এবং নাম-কামের প্রত্যাশী লোকেরা আল্লাহ তা'য়লার নিরঙ্কুশ ইবাদত না করার দরুন গোপন পথে শির্কের মধ্যে নিপতিত হইয়া পড়িয়াছে এবং নিজেদের ইবাদতকে শির্কের অসীলা নিরূপণ করিতেছে। মোটকথা আল্লাহ তায়া'লার নিরঙ্কুশ ইবাদত তাঁহার নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং নাজাতের অসীলা বিশেষ। আল্লাহ তা'য়লার নিরঙ্কুশহীন ইবাদত যখন তাঁহার নৈকট্য লাভের অসীলায় পরিণত হইতে পারে না, তখন গায়রুল্লাহর ইবাদত আল্লাহর নৈকট্য লাভের অসীলা কিরূপে হইতে পারে? আল্লাহ তা'য়ালা কালামে মজীদে এরশাদ করিয়াছেন—

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ فَاعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ـ

অর্থাৎ, শুনিয়া রাখ! আল্লাহর দ্বীন নিরঙ্কুশ ও নির্ভেজাল। সুতরাং ইবাদতও নিরঙ্কুশ ও নির্ভেজাল রূপে কর। নিরঙ্কুশ ও নির্ভেজাল ইবাদতই আল্লাহর ইবাদত। (সূরা আয্ যুমুর)

হে খোদা! আমি আমার এই কিতাবকে আপনার দরবারে পৌছার অসীলা বা মাধ্যমে নিরূপণ করিতেছি। আপনার সীমাহীন মাগফেরাতের মধ্যে ইহাই আমার নাজাতের মাধ্যম। আপনিই আমার মাবুদ, আপনি পবিত্র আপনার ইবাদতের

জন্য সর্বদা আমি উপস্থিত। হে ইলাহুল আলামীন! আপনি উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে ক্ষমা করিয়া দিন, তাহাদের প্রতি আপনার প্রশস্ত রহমত বর্ষণ করুন। আমরা কেবলমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আর নির্ভরও করিতেছি একমাত্র আপনার উপর। হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমরা আপনার উপর ভরসা করিতেছি এবং আপনার পানে মনোনিবেশ করিতেছি। আমাদের প্রত্যাবর্তনের স্থান হইল আপনারই কাছে। আমাদের দায়িত্ব হইল শরীয়তের বিধান পরিষ্কাররূপে মানুষের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া। এই ফাসেক লোক ছাড়া আর কেহ ধ্বংস হইবে না।

হা-মিম হা-মিম হা-মিম হা-মিম।

হে খোদা! আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার সমগ্র পরিবার-পরিজন ও সাহাবাগণের প্রতি আপনার দরূদ ও রহমত নাযিল করুন! আমীন বেরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহেমীন।

সমাপ্ত

